Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির সিরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 216020642

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 216020642

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নবীজির সিরাহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 216020642 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজির সিরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জান্নাতুল ফেরদৌস

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 216020642

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক

সকল প্রশংসা আল্লাহর রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও স্থিতিদানকারী উত্তম প্রতিফল কেবল আল্লাহ ভিরু নেক বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সর্দার জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার সকল অনুসারী সাহাবী স্ত্রী ও সন্তান বংশধরের প্রতি।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।

আল্লাহ প্রসত্ত বার্তা বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির বাস্তবায়ন ও রূপায়ন, যা রাসুল ﷺ মানব জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। তাদের নিকট পৌছিয়েছেন, নিজের কথায় ও কাজে - যা আজ আমাদের নিকট নবীজির সিরাহ বা নবীর জীবনচরিত হিসেবে পরিচিত।

রাসূলﷺ জীবনচরিতের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোয় এবং মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব করার জন্য তৈরি করছেন শক্তিশালী ও সঠিক পথনির্দেশনা।

একজন মুসলমান ও মুমিনের নিজেকে চেনা ও জানা যতটা জরুরী তার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ করা তার চেয়ে অধিক জরুরী।যে ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে চিনবে না, জানবে না,তার সম্পর্কে সম্যখ পরিচিতি অর্জন করবে না,সে ঈমান ও ইসলামকে কিভাবে পুরোপুরি জানতে সক্ষম হবে? কেননা প্রতিটি মুমিন তো তার ঈমানের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে নবীর অস্তিত্বের পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। তাই নবীর অস্তিত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা হলে মুমিনের অন্তরে এক মুহূর্তের জন্য আর ঈমানের অস্তিত্ব থাকবে না থাকতে পারে না এজন্য পবিত্র কালামে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর।(সূরা আহযাবঃ৬)

সিরাহ কি

সীরাত বা সিরাত শব্দটি (আরবি: سيرة) সারা (বর্তমান কাল : ইয়াসিরু) ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে , যার অর্থ ভ্রমণ করা বা ভ্রমণ করে আসা। একজন ব্যক্তির সীরাত হল সেই ব্যক্তির জীবন, বা জীবনী, তার জন্ম, তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য এবং তার মৃত্যু। আধুনিক ব্যবহারে এটি বলতে কোনও ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্তকেও বোঝায়। এটি কখনও "সীরা", "সিরাহ" বা "সীরাত" হিসাবে লেখা হয়, যার অর্থ "জীবন" বা "যাত্রা"। ইসলামী সাহিত্যে বহুবচন রূপ, সিয়ার বলতে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ-বিধিকে বুঝানো হয়।

সীরাত রাসূলাল্লাহ বা আল-সিরা আল-নবুবিযইয়া শব্দটি মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী চর্চাকেই বুঝায়।

নবীজির সিরাহ জানার গুরুত্ব

(১)সীরাত অধ্যয়ন একটি উত্তম আমল

ইসলামি শরিয়তে কোন আমল উত্তীর্ণ— তা যাচাইয়ের নিখুঁত মানদণ্ড হলো নবীজির সীরাত। আর যেই আমল সীরাত ও সুন্নাতের মানদণ্ডে ঠিক না, সেটি ইসলামে অশুদ্ধ ও বর্জনীয় বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, যা খতীবে বোগদাদী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-জামে লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস সামে' এর মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন,

"নিঃসন্দেহে এটা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে— রাসূল (সা.) এর সীরাত হলো ইসলামের সকল বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মানদণ্ড। সুতরাং, সকল আমলকে তার জীবনাচার, স্বভাব-চরিত্রের নিক্তিতে মেপে দেখতে হবে। যা কিছু এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবে, তাই সত্য। আর যা কিছু সামঞ্জস্য রাখবে না তা অসত্য।"

কাজেই সঠিক ও শুদ্ধ উপায়ে আমল করতে চাইলে সীরাত পাঠের বিকল্প নেই। সীরাত পাঠে কোরআন অনুধাবনও সহজ হয়। কারণ, তাঁর জীবনই ছিল কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ তরজমা ও তাফসির।

(২)সীরাত অধ্যয়ন মুমিনের ঈমান ও আনুগত্যের দাবী

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে মুসলমানদেরকে রাসূল ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে তার পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الَّذِیۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ

(তরজমা)সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আন, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।সূরা আরাফ (৭) : ১৫৮

وَ اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ احۡذَرُوۡا ۚ فَاِنۡ تَوَلَّیۡتُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا عَلٰی رَسُوۡلِنَا الۡبَلٰغُ الۡمُبِیۡنُ

(তরজমা) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।-সূরা মায়িদা (৫) : ৯২

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَ یَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

(তরজমা)বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।-সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩১

وَ مَنۡ یُّشَاقِقِ الرَّسُوۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الۡهُدٰی وَ یَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیۡلِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰی وَ نُصۡلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتۡ مَصِیۡرًا

(তরজমা) কারো কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস।-সূরা নিসা (8) : ১১৫

এই সব বিষয়ের উপলব্ধি কোনো মুসলমানের অন্তরে তখনই আসতে পারে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা ও ওঠা-বসা সম্পর্কে কেউ নিজ উৎসাহে জানতে শুরু করবে এবং চোখের সামনে সীরাতের আদর্শ ফুটে থাকবে। আর যথাযথভাবে এর উপলব্ধি সীরাত অধ্যয়ন ছাড়া সম্ভব নয়।

(৩)সীরাত অধ্যয়ন কুরআন বোঝার সহায়ক

আমরা জানি যে, কুরআন ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ও প্রথম উৎস। এবং মানুষের সুখ-শান্তি ও চিরন্তন সফলতার চাবিকাঠি। পৃথিবীর বহু মানুষ বিশেষত মুসলিমগণ কুরআনকে সহীহ অর্থে বোঝা, তার বিধানাবলী জানা এবং এই সৌভাগ্যগ্রন্থের রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটা সহজ হবে সীরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে।

উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরআন বোঝার জন্য 'আসবাবে নুযূল' এবং 'নাসিখ-মানসূখ'-এর ইলম অত্যন্ত জরুরি। আর 'আসবাবে নুযূল' এবং 'নাসিখ-মানসূখ'-এর ইলম সীরাতে নববীর সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া কুরআনের ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনাশৈলী ও শ্রেষ্ঠতম অলংকৃত ভাষার কারণে তা সুসংক্ষিপ্ত একটি কিতাব, যার তাফসীর বা ব্যাখ্যা হলো সীরাতে নবী। সুতরাং কুরআনে কারীমকে না সীরাত থেকে আলাদা করে বোঝা যায় আর না তার বিধানাবলী, আদেশ-নিষেধ এবং তত্ত্ব ও নির্দেশনা সম্পর্কে সঠিক সমাধানে পৌঁছা যায়।

৪. **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব কোনো সাধারণ ব্যক্তিত্ব নয়, বরং তা এক আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। যে সুন্দরতম ও আস্থাপূর্ণ আদর্শ ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক জীবন সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। কুরআনে মুসলমানদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'উসওয়ায়ে হাসানা'কে আদর্শ বানিয়ে চলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কারণ এটাই।

আর উসওয়ায়ে হাসানা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সীরাতে নববী অধ্যয়ন করার চেয়ে উত্তম তরীকা আর কী হতে পারে।

আমরা যখন সীরাত অধ্যয়ন করব তখন জানতে পারব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন ছিলেন একজন সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষ, তেমনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠতম দায়ী ও অভিভাবক। তিনি যেমন ছিলেন একজন ধৈর্যশীল ও শোকরগুজার বান্দা, তেমনি ছিলেন বিরাট শান ও মর্যাদার অধিকারী এক মহাপুরুষ। যেমন ছিলেন একজন উত্তম ও অকৃত্রিম বন্ধু, তেমনি ছিলেন একজন আদর্শ পিতা ও স্বামী। যেমন ছিলেন ইবাদতগুজার ও রাত জাগরণকারী, তেমনি ছিলেন মুজাহিদ ও সফল সেনাপতি। তিনি

ছিলেন এক তুলনাহীন ন্যায়পরায়ণ বাদশা ও নেতা এবং ছিলেন রাজনৈতিক ময়দানের সুঅভিজ্ঞ 'শাহসোয়ার' এবং একজন সমাজসেবক ও জননেতা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন গভীর চিন্তাশীল এক মানুষ।

তার পবিত্র দিল ও যবানে সর্বদা ছিলো আল্লাহর যিকির। সুতরাং বোঝা যায় ইলম, আমল ও ফিকির হতে হবে যিকরে ইলাহীর সাথে। সেই জ্ঞান কোন জ্ঞান নয় যাতে আল্লাহর স্মরণ নেই।

৫. মানুষের উত্থান-পতন সীরাতের অনুসরণের সাথেই জড়িত

সীরাত অধ্যয়নে জানা যায় দুনিয়াতে মানুষের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অমোঘ নীতি কী। কুরআনে কারীমে এসেছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴾

(তরজমা) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহবান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।-সূরা আনফাল (৮) : ২৪

অতএব বলা যায়, মানুষের জন্য সীরাত অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সুন্দর ও নিরাপদ জীবন। অপর দিকে রাসূলের নাফরমানির পরিণাম হল ধ্বংস। তাই আমরা দেখতে পাই, যারা রাসূলের ডাকে লাববাইক বলে সাড়া দিয়েছেন, তাঁর আদর্শকে চোখের সুরমা বানিয়েছেন তারাই পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। আর যারা তাঁর পয়গামকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। এমনকি পৃথিবী থেকে তাদের নামনিশানাও মুছে গেছে। আজও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই প্রিয় সাহাবাদের নাম যখনই আসে অজান্তেই মুখে এসে যায় 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'। আর যখন আবু জাহল, আবু লাহাবের নাম আসে অন্তরে ঘৃণা এসে যায়। মন তাদের লা'নত করে।

সীরাতে নববীর পাঠকের সামনে যখন এইসব বাস্তবতা ফুটে উঠে তখন মানুষের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এই অমোঘনীতির উপর অবশ্যই ঈমান বেড়ে যায়।

বর্তমান বিশ্বের ও নবীজির আগমনের সময় আরবের অবস্থা

এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান পৃথিবী অনেক এগিয়েছে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সামনে আসছে। আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম সারা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। বস্তুবাদের সয়লাব। চারিদিকে ভোগ-সামগ্রীর ছড়াছড়ি। শহর তো শহর, গ্রামগঞ্জও আজ আধুনিকতার সাজে সজ্জিত। শুধু উন্নতি হয়নি মানবতার। চরিত্র ও নৈতিকতা বলতে কিছু নেই। সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নেই। শান্তি ও নিরাপত্তাও নেই। সর্বত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে মানুষের অধিকার। চারিদিকে ভয় ও শংকা। কখন কোথায় কী হয়ে যায় কারোরই জানা নেই। নিরাপত্তাহীনতা একটি সমাধানহীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নীতি-নৈতিকতা তো এভাবে নষ্ট হয়েছে যে, যে কোনো সময় শক্তিশালী দুর্বলের উপর চড়াও হয়ে বসে। শিল্প-কলার নামে অশ্লীলতা বৈধ করা হচ্ছে। নারীর মান-সম্মান বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সর্বোপরি অশান্তি ও অনিরাপত্তার এমন প্রাদুর্ভাব হয়েছে যে, শান্তির হাজার উপকরণ উদ্ভাবন করেও শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে আরব ও বিশ্বের অবস্থা ইতিহাস সাক্ষী, এমনই অবর্ণনীয় অবস্থা চৌদ্দশত বছর আগেও পৃথিবীতে বিরাজ করছিলো। যখন দুনিয়া থেকে মানবিকতা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। শুধু আরব ভূখন্ডে কেন সারা বিশ্বে অনিরাপত্তা আর অনিশ্চয়তা ছেয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র ভয় ও আতংক বিরাজ করছিল। ন্যায়নীতি ও নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিল না। মানুষের কোনো মূল্য মানুষের কাছে ছিল না। কন্যা সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেওয়া হতো। দাস-দাসীদের সাথে জানোয়ারের মত আচরণ করা হতো। মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি এবং সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতা ছিল সাধারণ বিষয়। পৃথিবীর সেই কঠিনতম সময়েই মানবতার দিশারী, রহমাতুললিল আলামীন মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মাটিতে আগমন করেন।

মহানবী সা. ছিলেন মানবজাতির অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় উত্তম চরিত্র ও মহানুভবতার একমাত্র আধার। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, ন্যায় বিচারক, বীরযোদ্ধা, যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক, দক্ষ শাসক এবং সফল ধর্মপ্রচারক। সকল ক্ষেত্রে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

নবীজির জন্ম থেকে নবুয়্যাত প্রাপ্তি

সৌভাগ্যময় জন্ম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় বিখ্যাত বনী হাশিম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল(ফিলের বছর) সোমবার দিবস রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদেকের সময় জন্মলাভ করেন।ইংরেজি পঞ্জিকা মতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ২০শে অথবা ২২ শে এপ্রিল।এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ৪০ তম বছর।

বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ সুলায়মান মুনসুরপুরী রহিমাহুল্লাহ এর অনুসন্ধানলব্ধ সঠিক অভিমত হচ্ছে এটাই।

ইবনে সাদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মা বলেছেন যখন তার জন্ম হয়েছিল তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিল যাতে শামদেশের অট্টালিকাসমূহ আলোকিত হয়েছিলো।ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ইরবায বিন সারিয়া কর্তৃক অনুরুপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবুওয়াতের পূর্বাভাস স্বরূপ প্রকাশিত হয়।কিসরাপ্রাসাদের চৌদ্দটি সৌধচূড়া ভেঙ্গে পড়ে, প্রাচীন পারসীক যাজকমন্ডলীর উপাসনাগার -গুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসা অগ্নিকুণ্ডগুলো নির্বাপিত হয়ে যায়, বুহায়রা পাদ্রিগণের সরগম গির্জাগুলো নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এ বর্ণনা হচ্ছে ইমাম বায়হাকি রহিমাহুল্লাহ,ইবনে জারির তবারি রহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্যদের। তবে এগুলোর কোনো সঠিক ভিত্তি নেই এবং তৎকালীন কোন ইতিহাস ও এর সাক্ষ্য দেয় না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই আমেনা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্মগ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এই শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি আনন্দ উদ্বেল চিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে নবজাতকের কোলে তুলে নিয়ে কাবা গৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অপূর্ব সুষমামন্ডিত এ শিশুর মুখমণ্ডলে আনন্দ অশ্রু সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। একান্ত আনন্দ মধুর এ মুহূর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে এই নবজাতকের নাম রাখা হবে মুহাম্মদ। আরববাসীদের নামের তালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম। মুহাম্মদ -একটি প্রতীকী

নাম।অর্থঃচিরপ্রশংসিত।তারপর আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সপ্তম দিনে তার খতনা করা হয়। তার মায়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা। ওই সময় তার কোলে যে সন্তান ছিল তার নাম ছিল মাসরুহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামের পূর্বে সুওয়ায়বা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবকে এবং পরে আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমিকেও দুধ পান করিয়েছিলেন।

বনু সাদ গোত্রে লালন-পালন

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন পালনের ব্যাপারে তৎকালীন নগরবাসী আরব গনের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল । সেই প্রথাটি ছিল শহর -নগরের জনাকীর্ণ পরিবেশ জনিত আধি-ব্যাধির কুপ্রভাব থেকে দূরে উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করার মাধ্যমে তারা যাতে বলিষ্ঠ দেহ এবং মজবুত মাংস পেশীর অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখতে সক্ষম হয় তদুদ্দেশ্যে দুগ্ধ পানের জন্য বেদুঈন পরিবারের ধাত্রীগণের হাতে শিশুদের সমর্পণ করা। এ প্রথানুযায়ী অব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দুগ্ধ পান করানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রী অনুসন্ধান করেন এবং শেষ পর্যন্ত হালীমাহ বিনতে আবূ যুয়ায়বের নিকট তাকে সমর্পণ করেন। এ মহিলা বনু সা'দ বিন বাকর গোত্রের একজন খাতুন ছিলেন। তার স্বামীর নাম ছিল হারিস বিন আব্দুল উযযা এবং উপনাম ছিল আবূ কাবশাহ। তিনিও বনু সা'দ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

হালীমাহ ও হারিস দম্পতির কয়েকটি সন্তান ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুগ্ধ সম্পর্কিত ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্মান লাভ করে। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ আব্দুল্লাহ, আনীসাহ, হুযাফা অথবা জুযামাহ। হুযাফা শায়মা নামে অধিকতর পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ শায়মাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা হালীমাহ সাহায্য করতেন বলে কথিত আছে। অধিকন্তু, তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সাফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবও হালীমাহর সূত্র ধরে দুগ্ধ সম্পর্কিত ভাই ছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ) এর চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবকেও বনু সা'দ গোত্রের এক মহিলা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। হালীমাহ গৃহে থাকা অবস্থায় এ মহিলাও একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ) এবং হামযাহ (রাঃ) দুধভাই

সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যান। প্রথম সূত্রে সুওয়াইবার সম্পর্কের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় সূত্রে বনু সা'দ গোত্রে সেই মহিলার মাধ্যমে।

দুগ্ধ পান কালে হালীমাহ নাবী কারীম (ﷺ)-এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যান্বিত ও হতবাক হয়ে যান। হালীমাহর বর্ণনা সূত্রে ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক্ব বলেন যে, হালীমাহ এবং তার স্বামী তাদের একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তানসহ বনু সা'দ গোত্রের এক দল মহিলার সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধপান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কা যান। সেই সময় আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষজনিত দারুন খাদ্য ও অর্থ সংকট বিরাজমান ছিল।

হালীমাহ বলেন, 'আমি আমার একটি সাদা মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছিলাম। আমার সঙ্গে উটও ছিল। কিন্তু কি আল্লাহর মহিমা যে, উটের ওলান থেকে এক বিন্দুও দুধ বাহির হচ্ছিলনা। আমার বুকেও শিশুটির জন্য এক বিন্দু দুধ ছিলনা। এ দিকে ক্ষুধার তাড়নায় শিশুটি এতই ছটফট করছিল যে, সারাটি রাত আমরা ঘুমাতে পারি নি। এমতাবস্থায় আমরা বৃষ্টি ও সচ্ছলতার আশা-ভরসা নিয়ে প্রহর গুণছিলাম। কিন্তু অবস্থার তেমন কোন উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় আমরা পথ চলা শুরু করলাম।'

'আমি আমার মাদী গাধাটির উপর সওয়ার হয়ে পথ চলতে থাকলাম। গাধাটি ছিল খুবই দুর্বল, তার দুর্বলতা এবং শক্তি হীনতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে চলতে থাকল যে, এতে কাফেলার অন্যেরা অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করতে থাকল। যা হোক, এমনভাবে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যদিয়ে আমরা মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর আমাদের দলে এমন কোন মহিলা ছিল না যার নিকট শিশু নাবী (ﷺ)-কে দুগ্ধ পান করানোর প্রস্তাব দেয়া হয় নি। কিন্তু যখনই তারা জানতে পারল যে, শিশুটি পিতৃহীন ইয়াতীম তখনই তারা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। কারণ, দুগ্ধদানের জন্য দুগ্ধপোষ্যের পিতার নিকট থেকে উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশা সকলেরই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। মা বিধবা, দাদা বৃদ্ধ, এ শিশুকে লালন-পালন করে তার বিনিময়ে কীইবা এমন পাওয়ার আশা করা যেতে পারে? ইতস্তত করে এ সব কিছু ভেবে চিন্তে দলের কেউই তা নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল না।'

এদিকে দলের অন্যান্য মহিলা যারা আমার সঙ্গে এসেছিল তারা সকলেই একটি করে শিশু সংগ্রহ করে নিল। অবশিষ্ট রইলাম শুধু আমি। আমার পক্ষে কোন শিশু সংগ্রহ

করা সম্ভব হল না। ফিরে যাওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল আমার মনটা ক্রমান্বয়ে ততই যেন কষ্টকর ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকল। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বললাম, 'আমার সঙ্গিনীরা সকলেই দুধপানের জন্য সন্তান নিয়ে ফিরছে আর আমাকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে এ যেন আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তার চাইতে বরং আমি সেই ইয়াতিম ছেলেটিকেই নিয়ে যাই (যা করেন আল্লাহ)।'

স্বামী বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই, তুমি গিয়ে তাকেই নিয়ে এসো। এমনটিও হতে পারে যে, আল্লাহ এর মধ্যেই আমাদের জন্য কোন বরকত নিহিত রেখেছেন। এমন এক অবস্থা এবং মন-মানসিকতার প্রেক্ষাপটে শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দুধ পান করানোর জন্য আমি গ্রহণ করলাম।'

তারপর হালীমাহ বললেন, 'যখন আমি শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নিয়ে নিজ আস্তানায় ফিরে এলাম এবং তাঁকে আমার কোলে রাখলাম তখন তিনি তাঁর দু'সীনা আমার বক্ষের সঙ্গে মিলিত করে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করলেন। তাঁর দুধভাই অর্থাৎ আমার গর্ভজাত সন্তানটিও পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করল। এরপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। এর পূর্বে তার এভাবে ঘুম আমরা কক্ষনোই দেখিনি।

অন্য দিকে আমার স্বামী উট দোহন করতে গিয়ে দেখেন যে, তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি এত বেশী পরিমাণে দুধ দোহন করলেন যে, আমরা উভয়েই তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে তা পান করলাম এবং বড় আরামের সঙ্গে রাত্রি যাপন করলাম। পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাত্রি যাপন শেষে যখন সকাল হল তখন আমার স্বামী বললেন, 'হালীমাহ! আল্লাহর শপথ, তুমি একজন মহা ভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছ।' উত্তরে বললাম, 'অবস্থা দেখে আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে।'

হালীমাহ আরও বলেন যে, 'এরপর আমাদের দল মক্কা থেকে নিজ নিজ গৃহে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুকে নিয়ে আমার সেই দুর্বল এবং নিস্তেজ মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে আমিও তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ আমার সেই দুর্বল গাধাই সকলকে পিছনে ফেলে দ্রুত বেগে সকলের অগ্রভাগে এগিয়ে যেতে থাকল। অন্য কোন গাধাই তার সাথে চলতে পারল না। এমনকি অন্যান্য সঙ্গিনীরা বলতে থাকল, 'ওগো আবূ যুওয়াইবের কন্যা! ব্যাপারটি হল কী বল দেখি। আমাদের প্রতি

একটু অনুগ্রহ করো! এটা কি সেই গাধাটি নয় যার উপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, এটা সেই গাধাই যার উপর সওয়ার হয়ে আমি এসেছিলাম।'

তারা বলল, 'নিশ্চয়ই, এর সঙ্গে বিশেষ রহস্যজনক কোন ব্যাপার ঘটেছে।'

এমন এক রহস্যময় অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা বনু সা'দ গোত্র নিজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। ইতোপূর্বে আমার জানা ছিল না যে, আমাদের অঞ্চলের মানুষের চাইতে অন্য কোন অঞ্চলের মানুষ অধিকতর অভাবগ্রস্ত ছিল কিনা, কিন্তু মক্কা থেকে আমাদের ফিরে আসার পরবর্তী সময়ে আমাদের বকরীগুলো চারণভূমি থেকে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধ পরিপূর্ণ ওলান সহকারে বাড়িতে ফিরে আসত। দুগ্ধবতী বকরীগুলো দোহন করে আমরা তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করতাম। অথচ অন্য লোকেরা দুধ পেত না এক ফোঁটাও। তাদের পশুগুলোর ওলানে কোন দুধই থাকত না। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশুপালের মালিকেরা তাদের রাখালদের বলতেন, 'হতভাগারা যেখানে বনু যুওয়াইবের কন্যার রাখাল পশুপাল নিয়ে যায় তোমরা কি তোমাদের পশুপাল নিয়ে সেই চারণভূমিতে যেতে পার না?এ প্রেক্ষিতে আমাদের রাখাল যে চারণভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত অন্যান্য লোকের রাখালরাও সেই ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত অবস্থায় ফিরে আসত। সে সকল পশুর ওলানে দুধও থাকত না। অথচ আমাদের বকরীগুলো পরিতৃপ্তি এবং ওলানে পূর্ণমাত্রায় দুধসহকারে বাড়িতে ফিরত। প্রত্যেকটি কাজে কর্মে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সব কিছুর মধ্যেই আমরা বরকত লাভ করতে থাকলাম।এভাবে সেই ছেলের পুরো দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং আমি তাঁকে স্তন্য পান করানো বন্ধ করে দিলাম। অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এ শিশুটি এত সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে থাকলেন যে, দু'বছর পুরো হতে না হতেই তাঁর দেহ বেশ শক্ত ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠল। লালন-পালনের মেয়াদ দু'বছর পূর্ণ হওয়ায় আমরা তাঁকে তাঁর মাতার নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাদের সংসার জীবনে সচ্ছলতা ও বরকতের যে সুফল আমরা ভোগ করে আসছিলাম তাতে আমরা মনের কোণে একটি গোপন ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, তিনি যেন আরও কিছুকাল আমাদের নিকট থাকেন। তাঁর মাতার নিকট আমাদের গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললাম যে, তাঁকে আরও কিছু সময় আমদের সঙ্গে থাকতে দিন যাতে তিনি সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে ওঠেন। অধিকন্তু, মক্কায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কেও আমরা কিছুটা ভয় করছি। আমাদের বারংবার

অনুরোধ ও আন্তরিকতায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)- কে পুনরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।

বক্ষ বিদারণ

এভাবে দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক নাবী (ﷺ) বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান করতে থাকলেন। দ্বিতীয় দফায় বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান কালে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম[1] বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। আনাস (রাঃ) হতে সহীহুল মুসলিমে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন বালক নাবী (ﷺ) যখন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল।' তারপর হৃৎপিন্ডটিকে একটি সোনার তস্তরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গী-সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে দুধমা হালীমাহকে বলল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) নিহত হয়েছেন। হালীমাহ এবং তাঁর স্বামী এ কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নাবী (ﷺ)-এর মুখমণ্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁরা সেবাযত্নে লিপ্ত হলেন।[2] আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর বক্ষে ঐ সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

স্নেহময়ী মাতৃক্রোড়ে

বালক নাবী (ﷺ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনায় দুধমা হালীমাহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর মার নিকট ফেরত দেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মা হালীমাহর ঘরে বড় হন। দুধমা'র ঘর থেকে প্রাণের টুকরো নয়নমণি সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর আমিনাহ ইয়াসরিব গিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করার মনস্থ করেন। তারপর শশুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশুপুত্র মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং পরিচারিকা উম্মু আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম

করে মদীনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদীনা তুলনামূলক কম দূরত্বে অবস্থিত। পথ চলার এমন এক পর্যায়ে আমিনাহ হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল তাঁর অসুখ। তারপর তিনি ইয়াতিম শিশু নাবী (ﷺ) এবং আত্মীয়-স্বজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

পিতামহের স্নেহ-ছায়ার আশ্রয়ে

পিতার মৃত্যুর পর রইলেন স্নেহময়ী মা, মাতার মৃত্যুর পর বেঁচে রইল বৃদ্ধ দাদা। মায়ের মৃত্যুর পর শোকাভিভূত দাদা নিয়ে এলেন পিতা-মাতাহীন পুত্রকে নবুয়ত ও রিসালাতের নিকেতন মক্কায়। প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহ'র মৃত্যুতে আব্দুল মুত্তালিব যতটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশী ব্যথা অনুভব করলেন পুত্রবধূ আমিনাহর মৃত্যুতে। কারণ, আব্দুল্লাহ'র মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অবলম্বন ছিলেন তাঁর মা আমিনাহ। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর যে আর কোন অবলম্বনই রইল না। এ দুঃখ তাঁর শতগুণে বেড়ে গেল। অন্য দিকে তেমনি আবার ইয়াতিম শিশুটির জন্য তাঁর স্নেহসুধাও শত ধারায় বর্ষিত হতে থাকল। মনে হতো যেন ঔরসজাত সন্তানের চাইতেও বেশী মাত্রায় তিনি তাঁকে স্নেহ করতে লাগলেন।

ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে যে, কা'বাহ ঘরের ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বিশেষ একটি আসন বিছানো থাকত। আব্দুল মুত্তালিব এ আসনে বসতেন এবং সন্তানগণ বসতেন সেই আসনের পার্শ্ববর্তী স্থানে। পিতার সম্মানার্থে তাঁর কোন সন্তান এ আসনে বসতেন না। কিন্তু শিশু নাবী (ﷺ) সেখানে আগমন করে সেই আসনেই বসতেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর চাচাগণ তাঁর হাত ধরে তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের উপস্থিতিতে শিশু নাবী (ﷺ)-কে সেই আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করা হলে তিনি বলতেন, 'ওকে তোমরা এ আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করো না, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ, আল্লাহর শপথ! এ শিশুকে সাধারণ শিশু বলে মনে হয় না। ও হচ্ছে ভিন্ন রকমের এক শিশু, অনন্য এক ব্যক্তিত্ব'। তারপর তাঁকে নিজের কাছেই বসিয়ে নিতেন সে আসনে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোহাগ করতেন এবং তাঁর চাল-চলন ও কাজকর্ম দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।[1]

নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বয়স যখন আট বছর দু’মাস দশ দিন তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলেন। নাবী (ﷺ) এ দুঃখ-শোকের মুহূর্তে দুঃখ-বেদনার বোঝা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন চাচা আবূ ত্বালিব। হৃষ্টচিত্তে তিনি আপন কাঁধে তুলে নিলেন বালক মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর লালন-পালনের সকল দায়িত্ব। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর আগে আবূ তালেবকে সেই অসিয়তই করে গিয়েছিলেন।

স্নেহশীল পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে

পিতার অন্তিম অসিয়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আবূ ত্বালিব অত্যন্ত যত্নসহকারে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভবিষ্যতের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে লালন-পালন করতে থাকেন। আবূ ত্বালিব তাঁকে যে আপন সন্তানাদির অন্যতম হিসেবে লালন-পালন করতে থাকেন তা-ই নয়, বরং নিজ সন্তানের চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতা দিয়েই তাঁকে প্রতিপালন করতে থাকেন। অধিকন্তু, পিতা আব্দুল মুত্তালিবের মতই তিনিও তাঁকে নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত এভাবে তিনি বিচক্ষণ চাচার অধীনে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তাঁর চাচার সঙ্গে সংশ্লি-ষ্ট অন্যান্য ঘটনাবলী প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

ফিজার যুদ্ধ

নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাঁদের মিত্র বনু কিনানাহ। বিপক্ষে ছিলেন ক্বায়স আয়লান। এ যুদ্ধ ‘ফিজার যুদ্ধ’ হিসেবে খ্যাত। কেননা বনু কিনানাহর বার্রায নামে এক ব্যক্তি ক্বায়স আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে। এ খবর ওকাযে পৌছলে উভয় দলের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশ-কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ, প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম দিকে কিনানাহদের উপর ক্বায়সদের সমর্থন ছিল বেশী, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিনানাহদেরই সমর্থন হয়ে যায় বেশী। অতঃপর কুরাইশের কতক ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং বলেন যে, কোন পক্ষে বেশি নিহত থাকলে অতিরিক্ত

নিহতের দিয়াত গৃহীত হবে। এতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে সন্ধি করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষ ভুলে যায়। একে ফিজার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিশোর বালক অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা :

ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীগণকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু ইয়াতীম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়ত্তা করা যায় না। ভবিষ্যতে আরববাসীগণকে যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সে জন্য আরবের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ান তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধণাঢ্য ব্যক্তি। অধিকন্তু, সততা, দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আবরবাসীগণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর বাড়িতেই অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সকল গোত্র আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল উযযা, বনু যুহরা বিন কিলাব এবং বনু তামীম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তখনকার সময়ে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লি-ষ্ট সকলকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে তা সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই, এ ধরণের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন:

(ক) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(খ) বিদেশী লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(গ) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

(ঘ) অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুযূল' বা 'হলফ-উল ফুযূল'।

একদা এ প্রসঙ্গের উল্লেখ কালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে, 'হে, ফুযুল অঙ্গীকারনামার ব্যক্তিবৃন্দ! আমি নিশ্চয়ই তার সে আহবানে সাড়া দিব।

অধিকন্তু, এ ব্যাপারে অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের বাসভবনে আমি এমন এক অঙ্গীকারনামায় শরীক ছিলাম যার বিনিময়ে আমি আসন্ন প্রসবা উটও পছন্দ করি না এবং যদি ইসলামের যুগে এরূপ অঙ্গীকারের জন্য আমাকে আহবান জানানো হয় তাহলেও 'আমি উপস্থিত আছি কিংবা প্রস্তুত আছি' বলতাম।

'হলফ-উল-ফুযুল' প্রতিষ্ঠার অন্য একটি প্রাসঙ্গিক প্রত্যক্ষ পটভূমির কথাও জানা যায় এবং তা হচ্ছে, জুবাইদ নামক একজন লোক মক্কায় এসেছিলেন কিছু মালপত্র নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। আস বিন ওয়ায়িল সাহমী তাঁর নিকট থেকে মালপত্র ক্রয় করেন কিন্তু তাঁর প্রাপ্য তাঁকে না দিয়ে তা আটক রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্যের জন্য তিনি আব্দুদ্দার, মাখযুম, জুমাহ, সাহম এবং আদী এ সকল গোত্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনের প্রতি কেউই কর্ণপাত না করায় তিনি জাবালে আবূ কুবাইশ পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন যার মধ্যে তাঁর নিজের অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত ছিল। আবৃত্তি শ্রবণ করে জুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব দৌড়ে গিয়ে বলেন, 'এ লোকটি অসহায় এবং সহায় সম্বলহীন কেন? তাঁরই অর্থাৎ জুবাইরের প্রচেষ্টায় উপরোক্ত গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরে আস বিন ওয়ায়িলের নিকট থেকে জুবাইরের পাওনা আদায় করে দেয়া হয়।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিয়ে

খাদিজা বিনতে খুয়াইলিত ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা। তিনি লোকজনকে নির্দিষ্ট বেতনে ও লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী নিয়োগ করতেন। ব্যবসায়িক গোত্র হিসেবে কুরাইশদের নাম-ডাক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্বের কথা জানতে পেরে তিনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে তার কোন সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বললেন যে, এজন্য তিনি অন্যদেরকে যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে উত্তম সম্মানী তাকে দেবেন। মাইসারা নামক এক কিশোর কেউ তার সাহায্যের জন্য সঙ্গে দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদিজার পূর্ণ সামগ্রী ও দাস মাইসারা কে সাথে নিয়ে সিরিয়ায় রওনা হলেন। অনতি বিলম্বে তিনি সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন।

সিরিয়ায় পৌঁছে তিনি জৈনিক ধর্মযাজকের গির্জার নিকটবর্তী এক গাছের নিচে বিশ্রাম করলেন। ধর্মযাজক মাইসারা কে জিজ্ঞেস করলেন, গাছটির নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি কে? মাইসারাহ বললেন,তিনি হারামের অধিবাসী জৈনিক কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তি। ধর্মযাজক বললেন, এই গাছের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ কখনো বিশ্রাম নেয়নি!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আনীত পণ্য বিক্রি করে দিলেন এবং নতুন কিছু জিনিস ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। পথে যেখানেই দুপুর হয় এবং প্রচন্ড রৌদ্র উঠে মাইসারাহ দেখতে পায় যে,দু'জন ফেরেশতা মুহাম্মদকে ছায়া দিয়ে রৌদ্র থেকে রক্ষা করছে এবং তিনি উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে এগিয়ে চলেছেন।মক্কায় পৌছে তিনি খাদিজাকে তার ক্রয় করা পণ্যদ্রব্য বুঝিয়ে দিলেন।খাদিজা ঐ মাল বিক্রি করে প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা লাভ করলেন।

মাইসারাহ খাদিজাকে যাজকের বক্তব্য ও নবীকে (সাঃ)দুই ফিরিশতার ছায়াদানের বিষয় অবহিত করলেন।খাদিজা ছিলেন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুদ্ধিমতি ও সম্ভ্রান্ত মহিলা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও সততার সাথে পরিচিত হওয়া তার জন্য একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্য রূপে বিবেচিত হলো, যা নিছক আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই তিনি লাভ করলেন। মাইসারা কাছে উক্ত অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে খাদিজা লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, ভাই আপনাদের গোত্রের মধ্যে আপনার যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা, যে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সর্বোপরি আপনার বিশ্বস্থতা, চরিত্র মাধুর্য ও সত্যবাদিতার যে সুনাম রয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ এবং অভিভূত। এই কথা বলে খাদিজা তাকে বিয়ে

করার প্রস্তাব দেন। কুরাইশদের মধ্যে খাদিজা ছিলেন সর্বাপেক্ষা অভিজাত বংশীয়া, সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সংক্রান্ত এবং অতিশয় ধনাঢ্য মহিলা। এ কারণে সম্ভব হলে তার গোত্রের সকলেই তাকে বিয়ে করার অভিলাষ পোষণ করতো।

নাবী কারীম (ﷺ) এবং খাদীজাহ (রাঃ)-এর মধ্যে শুভ বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'মাস পর। তিনি সহধর্মিনী খাদীজাহকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। ঐ সময় খাদীজাহ (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এর প্রথমা সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদীজাহ (রাঃ)-এর গর্ভজাত সন্তান। নাবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই উপনাম হয় 'আবুল কাসেম'। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম, ফাত্বিমাহ ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল 'ত্বাইয়িব' এবং 'ত্বাহির'। নাবী কারীম (ﷺ)-এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাত্বিমাহ (রাঃ) ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। ফাত্বিমাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নাবী কারীম (ﷺ)-এর ছয় মাস পর।

ক্বাবা'হ গৃহ পুনঃ নির্মাণ এবং হজরে আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন তখন কুরাইশগণ ক্বাবা'হ গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ, ক্বাবা'হ গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাঈল (আঃ)-এর আমল হতেই এ ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সেই বছরেই মক্কা প্লাবিত হয়ে

যাওয়ার কারণে ক্বাবা'হমুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ায় ক্বাবা'হগৃহের দেওয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে কোন মুহূর্তে তা ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন ক্বাবা'হ গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

ক্বাবা'হ গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ ক্বাবা'হ গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ-সম্পদ (হালাল) ব্যবহার করা হবে। এতে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা চলবে না। এ সকল নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল।

নতুন ইমারত তৈরির জন্য পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলার কাজে হাত দিতে কারো সাহস হচ্ছে না, অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেন এবং অন্যেরা ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পরও যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁর উপর কোন বিপদ আপদ আসছে না তখন সকলেই ভাঙ্গার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন নির্মাণ কাজ শুরু হল। প্রত্যেক গোত্র যাতে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে তজ্জন্য কোন্ গোত্র কোন্ অংশ নির্মাণ করবেন পূর্বাহ্নেই তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তর সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বাকূম নামক একজন রুমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল। নির্মাণ কাজ যখন কৃষ্ণ প্রস্তরের স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন নতুনভাবে এক সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যাটি হল 'হাজারে আসওয়াদ' তথা 'কৃষ্ণ প্রস্তর'টি স্থাপন করার মহা গৌরব অর্জন করবেন তা নিয়ে। এ ব্যাপারে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি চার বা পাঁচ দিন চললো।

সকলেই নিজে বা তাঁর গোত্র কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন করার দাবীতে অনড়। সকলেরই এক কথা, এ কাজটি তাঁরাই করবেন। কেউই সামান্য ছাড় দিতেও তৈরি নন। সকলেরই একই কথা, একই জেদ। জেদ ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হল রেষারেষিতে। রেষারেষির পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে রক্তারক্তি। এ ব্যাপারে রক্তারক্তি করতেও তাঁরা পিছপা হবেন না। সকল গোত্রের মধ্যেই চলছে সাজ সাজ রব। শুরু হয়েছে অস্ত্রের মহড়া। একটু নরমপন্থীগণ সকলেই আতঙ্কিত কখন যে যুদ্ধ বেধে যায় কে তা জানে।

এমন বিভীষিকাময় এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ষীয়ান নেতা আবু উমাইয়া মাখযূমী এ সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেলেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করলেন যে, আগামী কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তাঁর উপরেই এ বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা! দেখা গেল সকল আরববাসীর প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমিনই সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর এভাবে আসতে দেখে সকলেই চিৎকার করে বলে উঠল :

هٰذَا الْأَمِيْنُ، رَضِيْنَاهُ، هٰذَا مُحَمَّدٌ،

আমাদের বিশ্বাসী, আমরা সকলেই এর উপর সন্তুষ্ট, তিনিই মুহাম্মাদ (ﷺ)।

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) যখন তাঁদের নিকটবর্তী হলেন তখন ব্যাপারটি সবিস্তারে তাঁর নিকট পেশ করা হল। তখন তিনি এক খানা চাদর চাইলেন। তাঁকে চাদর দেয়া হলে তিনি মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণ প্রস্তরটি তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপতিগণকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তোলন করুন। তাঁরা তাই করলেন। চাদর যখন কৃষ্ণ প্রস্তর রাখার স্থানে পৌছল তখন তিনি স্বীয় মুবারক হস্তে কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিলেন। অত্যন্ত সহজ, সুশৃঙ্খল এবং সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এ দিকে কুরাইশগণের নিকট বৈধ অর্থের ঘাটতি দেখা দিল। এ জন্যই উত্তর দিক হতে ক্বাবা'হ গৃহের দৈর্ঘ আনুমানিক ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেয়া হল। এ অংশটুকুই 'হিজর' 'হাতীম' নামে প্রসিদ্ধ। এবার কুরাইশগণ ক্বাবা'হর দরজা ভূমি হতে বিশেষভাবে উঁচু করে দিলেন যেন এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে যাকে তাঁরা অনুমতি দেবেন। যখন দেয়ালগুলো পনের হাত উঁচু হল তখন গৃহের অভ্যন্তর ভাগে ছয়টি পিলার বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হল এবং তার উপর ছাদ দেয়া হল। ক্বাবা'হ গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে একটি চতুর্ভূজের রূপ ধারণ করল। বর্তমানে ক্বাবা'হ গৃহের উচ্চতা হচ্ছে পনের মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর বিশিষ্ট দেয়াল এবং তার সামনের দেয়াল অর্থাৎঃ দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দেয়াল হচ্ছে দশ দশ মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর মাতাফের জায়গা হতে দেড় মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দরজা বিশিষ্ট দেয়াল এবং এর সাথে

সামনের দেয়াল অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দেয়াল বার মিটার করে। দরজা রয়েছে মেঝে থেকে দু'মিটার উঁচুতে। দেয়ালের পাশেই চতুর্দিকে নীচু জায়গা এক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চেয়ার সমতুল্য অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে যার উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ ত্রিশ সেন্টিমিটার। একে শাজে বওয়া (চলন্ত দুর্লভ) বলা হয়। এটাও হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বায়তুল্লাহর অংশ। কিন্তু কুরাইশগণ এটাও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন সংক্ষিপ্ত চরিত্র

বিভিন্ন মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে যে সকল সদগুণাবলির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে সবগুলোর চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অস্তিত্বের সবটুকু জুড়ে। তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনার যথার্থতা, পারদর্শিতা এবং ন্যায় পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রদান করা হয়েছিল সুষমামন্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা। তিনি দীর্ঘ সময় যাবৎ নীরবতা অবলম্বনের মাধ্যমে নিরবছিন্ন ধ্যান ও অনুসন্ধান কাজে রত থাকতে এবং বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের উদঘাটন করতে সক্ষম হতেন। তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিবেচনা এবং নির্ভুল নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা মানব সমাজের প্রকৃত অবস্থা, দল বা গোত্র সমূহের গতিবিধি ও মন-মানসিকতা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতেন। যার ফলে শত অন্যায়, অশ্লীলতা এবং অনাচার পরিবেষ্টিত সমাজে বসবাস করেও তিনি ছিলেন সবকিছুর উর্ধ্বে, সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র। শরাবপায়ীদের সাথে বসবাস করেও কোনদিন তিনি শরাব স্পর্শ করেন নি, দেবদেবীর আস্তানায় যবেহকৃত পশুর মাংস্ তিনি কখনো খাননি এবং মূর্তির নামে অনুষ্ঠি কোন প্রকার খেলাধূলায় তিনি কখনো অংশ গ্রহণ করেননি।

জীবনের প্রথমস্তর থেকেই তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত যাবতীয় মিথ্যা উপাস্যকে ঘৃণা করতেন এবং সে ঘৃণার মাত্রা এতই অধিক ছিল যে, তাঁর দৃষ্টিতে আর অন্য কোন জিনিস এত নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ছিল না। এমনকি লাত ও উযযার নামে শপথ করার ব্যাপারটি তাঁর কানে গেলে তিনি তা সহ্য করতেই পারতেন না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে আল্লাহর খাস রহমত, হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে লালিত পালিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, যখনই পার্থিব কোন ফায়দা লাভের দিকে প্রবৃত্তি আকৃষ্ট বা আকর্ষিত হয়েছে অথবা অপছন্দনীয় কিংবা অনুসরণীয় রীতিনীতি অনুসরণের প্রতি আখলাক আকৃষ্ট হয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন সেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইবনে আসীরের একটি বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা যে সকল কাজ করেছে দু'বার ছাড়া আর কখনো সে ব্যাপারে আমার খেয়াল জাগেনি। কিন্তু সে দু'বারের বেলায় আল্লাহ তা'আলা আমার এবং সে কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর পর কখনো সে ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন খেয়াল জন্মে নি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমাকে পয়গম্বরীর মর্যাদা প্রদান করেছেন।

এ ঘটনা ছিল, যে বালকের সঙ্গে আমি মক্কার উপরিভাগে ছাগল চরাতাম এক রাত্রে তাকে বললাম, 'তুমি আমার ছাগলগুলো একটু দেখাশোনা করো, আমি মক্কায় যাই এবং সেখানে অন্যান্য যুবকগণের মতো যৌবন সংশি-ষ্ট আবৃত্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করি।'

সে বলল, 'ঠিক আছে। এর পর আমি বাহির হলাম এবং তখনো মক্কার প্রথম ঘরের নিকটেই ছিলাম এমন সময় কিছু বাদ্য যন্ত্রের শব্দ এসে কানে পৌঁছল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথা থেকে বাদ্যযন্ত্রের এ শব্দ ভেসে আসছে?'

লোকেরা বলল, 'অমুকের বিবাহ হচ্ছে, তারই বাজনা বাজছে''। আমি সেই যন্ত্র সঙ্গীত শ্রবণের জন্য সেখানে বসে পড়লাম। অমনি আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণ আমার শ্রবণ শক্তির উপর আরোপিত হল। তিনি আমার কর্ণের কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং আমি সেখানে শুয়ে পড়লাম। তারপর সূর্যের তাপে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পর আমি আমার সে বন্ধুর নিকট চলে গেলাম এবং তার জিজ্ঞাসার জবাবে ঘটনাটি তার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। এর পর আবার এক রাত্রি আমার বন্ধুর নিকট বসেছিলাম এবং মক্কায় পৌঁছে তদ্রুপ ঘটনার সম্মুখীন হলাম। তদন্তর আর কখনো অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি নি।

সহীহুল বুখারীতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ক্বাবা'হ গৃহের নিমার্ণ কাজ চলছিল তখন নাবী কারীম (ﷺ) এবং আব্বাস (রাঃ) প্রস্তর বহন করে আনছিলেন। আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, 'স্বীয় লুঙ্গি আপন কাঁধে রাখ তাহলে প্রস্তর বহন জনিত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি''। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লুঙ্গি বেঁধে দেয়া হল। অন্য বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, এরপর তাঁর লজ্জাস্থান আর কোন দিনই দেখা যায় নি।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর কাজকর্ম ছিল সব চাইতে আকর্ষণীয়, চরিত্র ছিল সর্বোত্তম এবং মহানুভবতা ছিল সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। তিনি ছিলেন সর্বাধিক শিষ্টাচারী, নম্র-ভদ্র, সদালাপী ও সদাচারী। তিনি ছিলেন সব চাইতে দয়াদ্র চিত্ত, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও সত্যবাদী। মিথ্যা কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয় ছিলেন যে আরববাসীগণ সকলেই তাঁকে 'আল-আমীন' বলে আহবান জানাতেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন আরববাসীগণের মধ্যে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। খাদীজাহ (রাঃ) সাক্ষ্য দিতেন যে, 'তিনি অভাবগ্রস্তদের বোঝা বহন করতেন, নিঃস্ব ও অসহায়দের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। ন্যায্য দাবীদারদের তিনি সহায়তা করতেন এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য মশহুর ছিলেন।

হেরা গুহার অভ্যন্তরে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন।পুরো রমাযান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহূর্তে সকল কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান সত্ত্বার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। স্বগোত্রীয় লোকদের অর্থহীন বহুত্ববাদী বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁর অন্তরে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোন পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হতেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। যে আত্মার নসীবে নবুয়তরূপী এক মহান আসমানী নেয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিকপথ নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বিশ্বব্যবস্থায় সব চাইতে মর্যাদাশীল ও দায়িত্বশীল-আমানতদার মনোনীত করে তাঁর কাঁধে দায়িত্বভার অর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জীবন বিধানের রূপরেখা পরিবর্তন এবং অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে শাশ্বত আদর্শের আঙ্গিকে ইতিহাসের পরিমার্জিত ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখন নবুয়ত প্রদানের প্রাককালে তাঁর জন্য একমাসব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন যাতে তিনি গভীর ধ্যানের সূত্র ধরে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুক্কায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তি ও জিবরাঈল (আঃ)-এর আগমন

নাবী কারীম (ﷺ)-এর বয়সের ৪০তম বছর যখন পূর্ণ হল- এটাই হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির বয়স এবং বলা হয়েছে যে, এ বয়স হচ্ছে পয়গম্বরগণের নবুয়ত প্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স-তখন নবুওয়তের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন তা প্রতীয়মান হতো সুবহে সাদেকের মত। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ছয়টি মাস যা ছিল নবুওয়তের সময় সীমার ছয়চল্লি-শতম অংশ এবং নবুওয়তের সময়সীমা ছিল তেইশ বছর। এরপর তিনি যখন হেরাগুহায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকল তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত

বর্ষণের ইচ্ছা করলেন। তারপর আল্লাহ রাববুল আলামীন জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াতে করীমা নাযিল করে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবুওয়তের মহান মর্যাদা প্রদানে ভূষিত করেন।[1]

বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণাদি গভীরভাবে অনুধাবন করলেই জিবরাঈল (আঃ)'র আগমনের প্রকৃত দিন তারিখ ও সময় অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আমাদের সন্ধানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রমাযান মাসে ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে। খ্রীষ্টিয় হিসাব অনুযায়ী দিনটি ছিল ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী নাবী কারীম (ﷺ)-এর বয়স ছিল চল্লি-শ বছর ছয় মাস বার দিন এব সৌর হিসাব অনুযায়ী ছিল ৩৯ বছর ৩ মাস ২০ দিন।[2]

আসুন, এখন আমরা উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেই। এটা নৈসর্গিক নূর বা আসমানী দীপ্তির মতো এমন এক আলোক রশ্মি ছিল যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হতে থাকে, জীবনের গতিধারা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হতে থাকে। আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি যখন যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাত রশ্মির মতো প্রকাশিত হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হতে থাকলেন। নিরবাচ্ছিন্ন নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকার সুবিধার্থে তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় গৃহে প্রত্যাবর্তণ না করে রাতের পর রাত তিনি এবাদত বন্দেগী এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এ জন্য খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে সব ফুরিয়ে গেলে পুণরায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।

পূর্বের মতো খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে পুনরায় তিনি হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান মগ্ন হতেন। ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তিনি হেরাগুহার নির্জনতায় অবস্থান করতে থাকেন।

এমনভাবে একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন আল্লাহর দূত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, 'তুমি পড়''। তিনি বললেন, 'পড়ার অভ্যাস আমার নেই।' তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়''। তিনি আবারও বললেন, 'আমার পড়ার অভ্যাস নেই''। তারপর তৃতীয় দফায় আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়-

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) [العلق:1: 3])

অর্থঃ সেই প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিন্ড থেকে। পড় সেই প্রভূর নামে যিনি তোমাদের জন্য অধিকতর দয়ালু।"[3]

তারপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নাবী কারীম (ﷺ) কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদীজাহ বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।' খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করে খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কোন ভয় করবেন না, আপনি ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।'

এরপর খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে স্বীয় চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযার নিকট নিয়ে গেলেন। জাহেলিয়াত আমলে অরকা খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং ইবরাণী ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। এক সময় তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লেখতেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তিনি কী যেন সব কথাবার্তা বলছেন এবং অস্থির হয়ে পড়ছেন।'অরাকা বললেন, 'ভাতিজা, বলতো তুমি কী দেখেছ? কী হয়েছে তোমার?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হেরাগুহায় যেভাবে যা ঘটেছিল সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন অরাকার নিকট।

আনুপূর্বিক সব কিছু শ্রবণের পর বিস্ময়-বিহবল কণ্ঠে অরাকা বলে উঠলেন, 'ইনিই তো সেই মানুষ যিনি মুসা (আঃ)-এর নিকটেও আগমন করেছিলেন।'[4]

তারপর বলতে থাকলেন, 'হায়! হায়! যেদিন আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা আপনার উপর নানাভাবে জুলম অত্যাচার করবে এবং আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম।'

অরাকার মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘একী! ওরা আমাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে?’

ওয়ারাকা বললেন, ‘হ্যাঁ, তারা অবশ্যই আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে।’ তিনি আরও বললেন ‘শুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই জনসমাজে সত্যের বার্তা বাহক কোন সাধক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার স্বাগোত্রীয় লোকেরা নানাভাবে তার উপর জুলম, নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে।’ তিনি আরও বললেন, ‘মনে রাখুন আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্ব প্রকারে আপনাকে সাহায্য করব।’ কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওরাকা মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ দিকে ওহী আসাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের ইসলাম গ্রহন

খাদিজা বিনতে খুবাইলিদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলেন ।আল্লাহর কাছ থেকে যে প্রত্যাদেশ তিনি পেলেন তা সত্য বলে মেনে নিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের কাজে তাকে সহযোগিতা করলেন ।বস্তুতঃতিনি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও তাকে সত্য রূপে গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি।

এভাবে আল্লাহ তার নবীর দুঃখ -কষ্ট কে লাগব করেন। যখনই অবাঞ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হতো কেউ তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো, তখন তিনি মর্মাহত হতেন।তিনি খাদিজার কাছে গেলেই আল্লাহর ইচ্ছায় তার মনোকষ্ট দূর হয়ে যেতো।খাদিজা তাকে সান্তনা দিতেন, তার মনের দুঃখ -বেদনা হালকা করে দিতেন , তার দাওয়াতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকৃতি দিতেন এবং মানুষের আচরণকে যাতে তিনি হালকাভাবে গ্রহণ করেন, সেজন্য অনুপ্রাণিত করতেন। আল্লাহ তার (খাদিজার) উপর রহমত নাযিল করুন।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"এ কারণে আমি খাদিজাকে জান্নাতে এমন একটি গৃহের সুসংবাদ দিতে আদিষ্ট হয়েছি,যে গৃহ অনুপম কারুকার্যখচিত মুক্তার তৈরি এবং যেখানে কোন হৈচৈ, দুঃখ-কষ্ট ও অসুস্থতা থাকবে না।"

ওহী বিরতি

কত দিন যাবৎ ওহী বন্ধ ছিল সেই ব্যাপারে ইতিহাসবেত্তাগণ কয়েকটি মতামত পেশ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সঠিক কথা হলো ওহী বন্ধ ছিল মাত্র কয়েকদিন। কতদিন যাবৎ ওহী বন্ধ ছিল সে ব্যাপারে ইবনে সা'দ ইবনে আব্বাস হতে একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন যা এ দাবীর পৃষ্ঠপোষকতা করে। কোন কোন সূত্রে এ কথাটি প্রচারিত হয়ে এসেছে যে, আড়াই কিংবা তিন বছর যাবৎ ওহী অবতীর্ণ বন্ধ ছিল; কিন্তু তা সঠিক নয়।

এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং এতদসম্পর্কিত বর্ণনা ও বিজ্ঞজনের মতামতসমূহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের ফলে আমার নিকট একটি কিছু অপ্রচলিত বিষয় প্রকাশিত হয়েছে এবং বিজ্ঞজনের মধ্যে এ বিষয়ে দ্বিমত প্রত্যক্ষ করা যায় না তা হলো :

নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেরা গুহায় কেবলমাত্র একমাস ধরে নির্জনে কাটাতেন; আর সেটি হলো প্রত্যেক বছরের রামাযান মাস। নবুওয়াতের বছর ছিল এ তিন বছরের শেষ বছর। এই রামাযানের পুরো মাস অবস্থানের শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম সকালে বিশ্বজাহানের নাবী শেষ নাবী ওহী লাভে ধন্য হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। তাছাড়া বুখারী, মুসলিমের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ওহী বন্ধ হওয়ার পর দ্বিতীয় বার ওহী অবতীর্ণ হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন নির্জনে পুরো মাস অবস্থানের পর ফিরে আসছিলেন সে সময়।

ওহী বন্ধ থাকার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত বোধ করতেন। সহীহুল বুখারী শরীফের তাবীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহী বন্ধ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতই বিচলিত ও বিব্রতবোধ করতেন এবং তাঁর দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তিবোধ এতই অধিক বৃদ্ধি পেত যে, পর্বত শিখর হতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলতেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যখনই তিনি পর্বত শীর্ষে আরোহণ করেছেন তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনি আল্লাহর সত্যনবী।' এতদশ্রবণে তাঁর প্রাণের অস্বস্তি ভাব স্তিমিত হয়ে আসত, মনে লাভ করতেন অনাবিল শান্তি, তারপর ফিরে আসতেন গৃহে। আবারও কোন সময় কিছু বেশীদিনের জন্য ওহী বন্ধ থাকলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতো।

ইসলাম কবুলকারী প্রথম দল

এটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত কথা যে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবচাইতে কাছের, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ছিলেন সর্ব প্রথম তিনি তাঁদেরই নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ঐ সকল লোককে সত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন যাঁদের মুখমণ্ডলে কল্যাণ এবং সত্য-প্রীতির আভাষ ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া যাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সততা, সত্যবাদিতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সুবিদিত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁর প্রতি এত বেশী অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, প্রথম আহবানেই সাড়া দিয়ে তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং প্রথম মুসলিম হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। এদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন নাবী- পত্নী খাদীজাহতুল কোবরা (রাঃ) বিনতে খুওয়াইলিদ, তাঁর স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ বিন শোরাহবীল কালবী,[1] তাঁর চাচাত ভাই আলী বিন আবূ ত্বালিব যিনি তখনো তাঁর লালন-পালনাধীন শিশু ছিলেন এবং তাঁর সওর গুহার সঙ্গী আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)। এরা সকলে প্রথম দিনেই মুসলিম হয়েছিলেন।[2]

তারপর আবূ বাকর (রাঃ) ইসলামের প্রচার কাজে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কোমল-স্বভাব, পছন্দনীয় অভ্যাসের অধিকারী, সচ্চরিত্র এবং দরাজ দিল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, দূরদর্শিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সৎ সাহচর্যের কারণে তাঁর নিকট লোকজনের গমনাগমন প্রায় সব সময় লেগেই থাকত। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিকট আগমন ও প্রত্যাগমনকারী এবং আশপাশে বসবাসকারীগণের মধ্যে যাঁকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন তাঁর সামনেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উসমান (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ত্বালহাহ বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠি।

প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন বিলাল হাবশী (রাঃ)-ও ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। এর পর ইসলাম কবূল করেন বনু হারিস বিন ফিহর গোত্রের আবূ 'উবায়দাহ 'আমির বিন জাররাহ (রাঃ), আবু সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমী (রাঃ), আরক্কাম বিন আবিল আরক্কাম (রাঃ), উসমান বিন মাযউন যুমাহী (রাঃ), এবং তাঁর দু'ভাই যথাক্রমেঃ কুদামা এবং আব্দুল্লাহ, উবায়দাহ বিন হারিস বিন মুত্তালিব বিন আবদে

মানাফ, সাঈদ বিন যায়দ এবং তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ উমারের বোন ফাত্বিমাহ বিনতে খাত্তাব, খাব্বাব বিন আরাত তামীমী (রাঃ), জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব ও তার স্ত্রী আসমা বিনতে 'উমায়স, খালিদ বিন সাঈদ বিন 'আস আল উমাবী ও তার স্ত্রী আমীনাহ বিনতে খালাফ, অতঃপর তার ভাই 'আমর বিন সাঈদ বিন আস, হাতিব বিন হারিস জুমাহী ও তার স্ত্রী ফাতিমাহহ বিনতে মুখাল্লিল ও তার ভাই খাত্তাব বিন হারিস এবং তার স্ত্রী ফুকাইহাহ বিনতে ইয়াসার ও তার ভাই মা'মার বিন হারিস, মুত্তালিব বিন আযহার যুহরী ও তার স্ত্রী রামলাহ বিনতে আবূ 'আওফ, নাঈম বিন আবদুল্লাহ বিন নুহাম আদবী (রাঃ), এদরে সকলেই কুরাইশ ও কুরাইশের বিভিন্ন শাখা গোত্রের।

কুরাইশ ব্যতীত অন্য গোত্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীরা হলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মাসউদ বিন রাবী'আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী ও তার ভাই আহমাদ বিন জাহশ, বিলাল বিন রিবাহ হাবশী, সুহাইব বিন সিনান রূমী, 'আম্মার বিন ইয়াসার আনসী, তার পিতা ইয়াসার ও তার মাতা সুমাইয়া এবং আমির বিন ফুহাইরাহ।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন, উম্মু আইমান বারাকাত হাবশী, উম্মুল ফযল লুবাবাতুল কুবরা বিনতে হারিস হিলালিয়াহ (আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী), আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীর গুণে গুণন্বিতদের সংখ্যা পুরুষ-মহিলা মিলে ৩৩০ জন। তবে এটা অকাট্যভাবে জানা যায় নি যে, তারা সকলেই প্রকাশ্যে দাওয়াত চালু হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নাকি ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে চালু হওয়া পর্যন্ত তাদের কেই কেউ ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন।

প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মুমিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হলো এবং রিসালাতের বোঝা বহনের মতো যোগ্যতা অর্জিত হলো ও ইসলাম তার নিজ অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও বাতিল দীন, উপাস্যদেরকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করতে আদিষ্ট হলেন।

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়:

(وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) [الشعراء:214]،

‘‘আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।’ (আশ-শু‘আরা ২৬ : ২১৪)

এটি হচ্ছে সূরাহ শু‘আরার আয়াত এবং এ সূরাহয় সর্ব প্রথমে মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তের প্রারম্ভিক কাল কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, বনি ইসরাঈলসহ কিভাবে তিনি হিজরত করে ফেরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন এবং পরিশেষে কিভাবে স্বদলবলে ফেরাউনকে নিমজ্জিত করা হল সেব কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায়, ফেরাউন এবং তাঁর কওমকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতে গিয়ে মূসা (আঃ)-কে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল এ ছিল সেই কর্মকান্ডের একটি সমন্বিত আলোচনা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখন তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট দ্বীনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল সেই প্রসঙ্গে মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণাদি এ কারণেই তুলে ধরা হল, যাতে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর কিভাবে মিথ্যা এবং বাতিলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হক পন্থীদের কিভাবে অন্যায়-অত্যাচারে সম্মুখীন হতে হয় তার একটি চিত্র নাবী কারীম (ﷺ) এবং সাহাবীগণের (রাঃ) সম্মুখে বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এ সূরাহর মধ্যে নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতিসমূহ, যথাঃ ফেরাউন ও তার দল ব্যতীত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আদ, সামুদ, ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়, লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং আসহাবুল আইকার পরিণতির কথাও উল্লে-খিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল কওম নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদের উপর তাদের হঠকারিতার পরিণতি, কী কৌশলে আল্লাহ তাঁদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং ঈমানদারগণ অজস্র বিপদাপদ পরিবেষ্টিত থেকেও আল্লাহর রহমতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তা তুলে ধরাই হচ্ছে এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

আত্মীয়-স্বজনদের নিকট প্রচারের নির্দেশ

প্রথম সম্মেলন : যাহোক, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী কারীম (ﷺ) বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেণ। সেই সম্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফেরও এক দল লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের সংখ্য ছিল পঁয়তালি-শ জন। সম্মেলনের শুরুতেই আবূ লাহাব আকস্মিকভাবে বলে উঠলেন, 'দেখ এঁরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়- চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সঙ্গে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার পিতৃ-পরিবারই যথেষ্ট। তুমি যদি তোমার ধ্যান-ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাক তবে এটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক যে সমগ্র কুরাইশ গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং অন্যান্য আরব গোত্র এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তারপর এটা আমার জানার বিষয় নয় যে, স্বীয় পিতৃপরিবারের আর অন্য কেউ তোমার চাইতে বড় সর্বনাশা হতে পারে। আবূ লাহাবের এ জাতীয় অর্থহীন আস্ফালনের প্রেক্ষাপটে নাবী কারীম (ﷺ) সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ঐ নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় সম্মেলনঃ

এরপর নাবী কারীম (ﷺ) স্বগোত্রীয় লোকজনদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

الحَمْدُ لِلهِ، أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِيْنُهُ، وَأُوْمِنُ بِهِ، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

''সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

তারপর তিনি বলেনঃ

(إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، وَاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَاللهِ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا تَنَامُوْنَ، وَلَتَبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُوْنَ، وَلَتَحَاسَبْنَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا أَوِ النَّارِ أَبَدًا)

‘‘কল্যাণকামী পথ-প্রদর্শক স্বীয় আত্মীয়-পরিজনগণের নিকট কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ জানেন, তোমরা সকলেই সেভাবেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে যেমনটি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এবং সেভাবেই পুনরায় উত্থিত হবে যেমনটি তোমরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হও। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সফলতা সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং পুণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাস স্থল জন্নাতে ও পাপাচারের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাব ও দুঃখ কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

এ কথা শুনে আবূ ত্বালিব বললেন, (জিজ্ঞেস করো না) আমরা কতটুকু তোমার সাহায্য করতে পারব, তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমার কথাবার্তা কতটুকু সত্য বলে আমরা জানব। এখানে সমবেত লোকজন তোমার পিতৃ-পরিবারের সদস্য এবং আমিও অনুরূপ একজন সদস্য। পার্থক্য শুধু এ টুকুই যে, তোমার সহযোগিতার জন্য তাঁদের তুলনায় আমি অগ্রগামী আছি। অতএব, তোমার নিকট যে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে থাক। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরামভাবে তোমার কাজকর্ম দেখাশোনা ও তোমাকে সহানুভূতি করতে থাকব। তবে আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই।

আবূ লাহাব বললেনঃ ‘আল্লাহর শপথ, এ হচ্ছে অন্যায় এবং দুষ্টামি-নষ্টামি। এর হাত অন্যদের আগে তোমরাই ধরে নাও।’

আবূ লাহাবের মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর আবূ ত্বালিব বললেন, ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি তাঁর হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব।

সাফা পর্বতের উপর

যখন নাবী কারীম (ﷺ) খুব ভালভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আবূ ত্বালিব তাঁকে সাহায্য করবেন তখন এক দিবস তিনি সাফা পর্বত শিখরে আরোহণ করে জন সাধারণকে আহবান করলেন, (يَا صَبَاحَاه) হায় প্রাতঃকাল[1] ব’লে তা শ্রবণ করে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা সেখানে যখন সমবেত

হলেন তখন তিনি সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহর একত্ববাদ, স্বীয় নবুওয়ত এবং পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে আহবান জানালেন। এ ঘটনার এক অংশ সহীহুল বুখারীতে ইবনে আব্বাস কর্তৃক এইভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

যখন (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِي) আয়াত অবতীর্ণ হল তখন নাবী কারীম (ﷺ) সাফা পর্বত শিখরে আরোহন করে কুরাইশ গোত্রের সকলকে লক্ষ্য করে বিশেষ কিছু শব্দ উচ্চারণ করে চিৎকার করতে থাকলেনঃ

يَا بَنِيْ فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ، (يَا بَنِيْ فُلَانٍ، يَا بَنِيْ فُلَانٍ، يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)

‘‘ওহে বনু ফিহর! ওহে বনু আদী! (ওহে বনু অমুক, ওহে বনু ওমুক, ওহে বনু আবদে মানাফ, ওহে বনু আবদুল মুত্তালিব)

এ আহবান শ্রবণ করে সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেলেন। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর উপস্থিতি সম্ভব না হলে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। ফলকথা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের সকলকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবূ লাহাবও উপস্থিত ছিলেন।

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيِّ بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ تُرِيْدُ أَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟)

‘‘হে কুরাইশ বংশীয়গণ! তোমরা বল, আজ (এ পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে) যদি আমি তোমাদিগকে বলি যে, পর্বতের অন্য দিকে এক প্রবল শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের যথা- সর্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে তোমরা আমার এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে কি?

সকলে সমস্বরে উত্তর করল হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই। আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখি নি।

তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন ,

(إِنِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدْى عَذَابٍ شَدِيْدٍ، إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَي الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ) (أَيْ يَتَطَلَّعُ وَيُنْظَرُ لَهُمْ مِنْ مَكَانٍ مُّرْتَفِعٍ لِئَلاَّ يُدْهِمُهُمْ الْعَدُوُّ) (خَشِىَ أَنْ يَسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يُنَادِيْ: يَا صَبَاحَاه)

“যদি তাহাই হয়, তবে শ্রবণ করুন। আমি আপনাদেরকে (পাপ ও আল্লাহ দ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম ও তজ্জনিত) অবশ্যম্ভাবী কঠোর দন্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি ....।

অতঃপর সাধারণ ও বিশেষভাবে সকলকে সত্যের পথে আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে বললেন

“হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর এবং তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট সঁপে দিয়ে তার সন্তুষ্টি অর্জন করো।”

“হে বনু কা’ব বিন লুহাই, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর। কেননা আমি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না।”

“হে বনু কা’ব বিন মুররাহ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর।”

“হে বনু কুসাই সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর। কেননা আমি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না।”

“হে বনু আবদে মানাফ সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের উপকার বা অপকার কিছুরই মালিক নই। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না ।”

হে বনু আবদে শামস, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাও।”

“হে বনু হাশিম, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাও।”

“হে বনু আব্দুল মুত্তালিব সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি তোমাদের উপকার বা অপকার কিছুরই মালিক নই। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না। আমার নিকট থেকে তোমরা ইচ্ছমতো কোন সম্পদ চেয়ে পার কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না।”

“হে বনু আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না।”

“হে সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফুফু), আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কোন উপকারে আসবো না।”

“হে বনু হে ফাত্বিমাহ বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই। আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারবো না। তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব। অর্থাৎ যথাযথভাবে আতীয়তা বজায় রাখবো।”

যখন এ ভীতিপ্রদর্শনমূলক বক্তব্য শেষ হলো সম্মেলন ভেঙ্গে গেল ও লোকজন যার যার মতো চলে গেল, কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু আবূ লাহাব মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে নাবী (র)-এর নিকটে এসে বলে উঠলেন, ‘তোর সর্বনাশ হোক! এ জন্য কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস? এর ফলশ্রুতিতে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলো :[2]

(تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ) [سورة المسد:1]

‘‘আবূ লাহাবের হাত ধ্বংস হোক।’ (আল-মাসাদ ১১১ : ১)

এভাবে উচ্চকণ্ঠে আহানের উদ্দেশ্য ছিল দীনের দাওয়াতের বাণী পৌছে দেয়া। এর মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) তার নিকটস্ত লোকেদের মাঝে এটা পরিস্কার করলেন যে, তাঁর রেসালাতকে সত্যায়ন করার অর্থই হলো, রাসূল (ﷺ) এবং তাদের মধ্যে একটা সৌহাদ্যপূর্ণ জীবনের সূত্রপাত করণ। আর আরবে যে আত্মীয় সম্বন্ধের যে মজবুত ভিত্তি রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সতর্কবাণীর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

এর প্রতিধ্বনি মক্কার অলি-গলিতে পৌছেই নি এমন সময় নাযিল হলো

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

‘‘কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।” (আল-হিজর : ৯৪)

এ আয়াত অবতীর্ণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুশরিক সমাজে ও অলি-গলি ঘুরে ঘুরে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। তাদের নিকট আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনাতে থাকলেন, অন্যান্য রাসূলগণ যা দাওয়াত দিতেন তাই প্রচার করতে থাকলেন অর্থ্যাৎ

]يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُه [ُ

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।” এবং দৃষ্টির সামনেই আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে কুরাইশ নেতাদের সম্মুখে কাবাহ প্রাঙ্গণে সালাত আদায় করতেন। তাঁর দীনের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং একের পর এক লোকজন শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকলেন। ফলশ্রুতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেন নি

এ উভয় দলের বাড়িতে বাড়িতে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-বিরোধীতা ক্রমে বেড়েই চললো এবং কুরাইশগণ সর্বদিক থেকে মুমিনদের ঘৃণা করতে থাকলেন এবং তাদের সাধ্যমত ইসলামের সাথে মন্দ আচরণ করতে লাগলো।

হজ্জ যাত্রীগণকে বাধা দেয়ার বৈঠক

যে সময়ের কথা ইতোপূর্বে বলা হল সেই সময়ে কুরাইশগণের সামনে আরও একটি সমস্যা দেখা দিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রকাশ্য প্রচার অভিযানের কয়েক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই হজ্জের মৌসুম এসে উপস্থিত হল। যেহেতু এ মৌসুমে আরব ভূমির দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন আরম্ভ হয়ে যাবে এবং সেহেতু মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁদের নিকটে প্রচারাভিযান শুরু করবেন সেহেতু তাঁর সম্পর্কে সমাগত সকলের নিকট এমন এক কথা বলার প্রয়োজনবোধ করলেন যার ফলে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর ক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। এ প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সলাপরামর্শের জন্য তাঁরা অলীদ বিন মুগীরার গৃহে সমবেত হলেন। অলীদ বললেন ‘এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত ঠিক, কারো যাতে এ নিয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ কিংবা মত পার্থক্যের সৃষ্টি না হয় এবং তোমাদের একজনের কথাকে অন্যজন যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে।’

অন্যেরা বললেন, ‘আপনি একটা মোক্ষম মন্তব্য ঠিক করে দিন তাহলেই তা আমাদের সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।’

তিনি বললেন, ‘না তা হবে না বরং তোমরা বলবে এবং আমি তা শুনব।’

ওলীদের এ কথার পর কয়েকজন সমস্বরে উঠলেন ‘আমরা মন্তব্য করব যে, তিনি কাহিন।’

অলীদ বললেন, ‘না আল্লাহর শপথ তিনি কাহিন (গণক) নয়।

আমরা অনেক কাহিন দেখেছি। ইনি তো কাহিনদের মতো গুনগুন করে গান গান না। ছন্দাকারে কবিতা আবৃত্তি করেন না কিংবা কবিতা রচনাও করেন না।'

অন্যরা বললেন, 'তাহলে আমরা তাঁকে একজন পাগল বলব।'

অলীদ বললেন, 'না তিনি তো পাগল নন, আমরা পাগল দেখেছি এবং তাঁর রকম সকম সম্পর্কে জানি। এ লোকের মধ্যে পাগলাদের মতো দম বন্ধ করে থাকা, অস্বাভাবিক কোন কাজকর্ম করা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলা কিংবা অনুরূপ কোন কিছুই তো দেখি না।'

অন্যেরা বললেন, 'তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন কবি।'

অলীদ বললেন, 'তাঁর মধ্যে কবির কোন বৈশিষ্ট্য নেই যে, তাঁকে কবি বলা হবে। রযয, হাজয, কারীয, মাকবুয, মাবসুত ইত্যাদি সর্বপ্রকার কাব্যরীতি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। যাহোক তাঁর কথাবার্তাকে কিছুতেই কাব্য বলা যেতে পারে না।'

অন্যেরা বললেন, 'তাহলে আমরা তাঁকে যাদুকর বলব।'

অলীদ বললেন, 'এ ব্যক্তিকে যাদুকরও বলা যেতে পারে না। আমরা যাদুকর এবং যাদু সংক্রান্ত নানা ফন্দি-ফিকির দেখেছি, তারা সত্যমিথ্যা কত কথা বলে, কত অঙ্গ-ভঙ্গি করে কত যে, ঝাড়-ফুঁক করে এবং গিরা দেয় তার ইয়ত্তা থাকেনা। কিন্তু এ ব্যক্তি তো যাদুকরদের মতো সত্য-মিথ্যা কথা বলা, ঝাড়-ফুঁক কিংবা গিরা দেয়া কোন কিছুই করে না।'

অন্যেরা তখন বললেন, 'আমরা তাহলে আর কী বলব।'

অলীদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, তাঁর কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি মধুর, তাঁর ভিত শিকড় বড়ই শক্ত এবং শাখা-প্রশাখা বড়ই মনোমুগ্ধকর। তোমরা তাঁর সম্পর্কে যাই বল না কেন, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকবেন তাঁরা তোমাদের কথাবার্তাকে অবশ্যই মিথ্যা মনে করবেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পুনরায় তিনি বললেন, 'তাঁর সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে খুব জোর যাদুকর বলতে পারো। তাঁর এটা কিছুটা উপযোগী বলে মনে হতে পারে। তিনি এমন সব কথা উত্থাপন করেছেন যা যাদু বলেই মনে হয়। তিনি পিতাপুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে গোত্রে গোত্রে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে যাদুকর বলার সিদ্ধান্তে একমত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।[1]

কোন কোন বর্ণানায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, অলীদ যখন তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন তখন তাঁরা বললেন, 'আপনি তাহলে আপনার গ্রহণযোগ্য অভিমত ব্যক্ত করুন।' প্রত্যুত্তরে অলীদ বললেন, 'আমাকে তবে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দাও।' এরপর তিনি বহুক্ষণ ধরে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং উল্লে-খিত অভিমত ব্যক্ত করেন।[2]

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) [المدثر:18: 25]

"১৮. সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল, ১৯. ধ্বংস হোক সে, কিভাবে সে (কুরআনের অলৌকিকতা স্বীকার করার পরও কেবল অহমিকার বশবর্তী হয়ে নবুওয়াতকে অস্বীকার করার) সিদ্ধান্ত নিল! ২০. আবারো ধ্বংস হোক সে, সে সিদ্ধান্ত নিল কিভাবে! ২১. তারপর সে তাকালো। ২২. তারপর ভ্রু কুঁচকালো আর মুখ বাঁকালো। ২৩. তারপর সে পিছনে ফিরল আর অহংকার করল। ২৪. তারপর বলল- 'এ তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এ তো পূর্বে থেকেই চলে আসছে। ২৫. এটা তো মানুষের কথা মাত্র।' (আল-মুদ্দাসসির ৭৪ : ১৮-২৬)

যা হোক, তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করলেন তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন। কিছু সংখ্যক কাফির মক্কায় আগমনকারী হজ্জযাত্রীগণের পথের পাশে কিংবা পথের মোড়ে মোড়ে জটলা করে নাবী কারীম (ﷺ)-এর প্রচার এবং তাবলীগের ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই বলে হজ্জযাত্রীগণকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করলেন। নাবী কারীম (ﷺ) সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে তাঁর সম্পর্কে বহু কিছু বলতে থাকলেন।[3] এ সব ব্যাপারে আবূ ল-াহাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

হজ্বের মৌসুমে হজ্ব যাত্রীগণের শিবিরে এবং উকায, মাজিন্নাহ ও যুলমাজায বাজারে নাবী কারীম (ﷺ) যখন আল্লাহর একত্ব এবং দ্বীনের তাবলীগ করতেন তখন আবূ লাহাব তাঁর পিছন পিছন গিয়ে বলতেন, 'এর কথায় তোমরা কান দিয়ো না। সে মিথ্যুক এবং বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।[4]

এভাবে দৌড় ঝাপের ফল হল যে, হজ্ব পালনের পর হাজীগণ যখন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাছাড়া তাঁরা এ কথাও অবগত হয়ে গেলেন যে মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুওয়ত দাবী করেছেন। এভাবে হজ্ব যাত্রীগণের মাধ্যমেই নাবী কারীম (ﷺ)-এর নবুওয়ত এবং ইসলামের প্রাথমিক কথাবার্তা সমগ্র আরব জাহানে বিস্তার লাভ করল।

বিরুদ্ধাচরণের বিভিন্ন পন্থা

কুরাইশগণ যখন দেখলেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাঁর দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগ থেকে নিবৃত্ত করার কোন কৌশল কার্যকর হচ্ছে না তখন তাঁরা পুনরায় চিন্তাভাবনা করে তাঁর তাবলীগী কর্মকান্ডকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য নানামুখী পন্থা-প্রক্রিয়া অবলম্বন শুরু করলেন। যে সকল পন্থা তাঁরা অবলম্বন করলেন তা হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১)প্রথম পন্থা : উপহাস, ঠাট্টা-তামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মিথ্যাপ্রতিপন্ন, অকারণ হাসাহাসি বিভিন্ন অবমাননাকর উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নাবী কারীম (ﷺ)-কে তাঁরা জর্জরিত এবং অতীষ্ঠ করে তুলতে চাইলেন। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণকে সন্দেহপরায়ণ, বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে তাঁদের উদ্যম ও কাজের স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অশালীন অপবাদ এবং গালিগালাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁরা কখনো তাঁকে পাগল বলেও সম্বোধন করতেন। যেমনটি ইরশাদ হয়েছেঃ

(وَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ) [الحجر:6]

‘‘তারা বলে, ‘ওহে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো অবশ্যই পাগল।’ (আল-হিজর ১৫ : ৬)

কখনো কখনো নাবী (ﷺ)-কে যাদুকর বলত এবং মিথ্যার অপবাদও দিত। যেমনটি ইরশাদ হয়েছেঃ

(وَعَجِبُوْا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) [ص:4]

‘‘আর তারা (এ ব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিরগণ বলল- ’এটা একটা যাদুকর, মিথ্যুক।’ (স্ব-দ ৩৮ : ৪)

এ কাফিরগণ নাবী (ﷺ)-এর অগ্রভাগে ও পিছনে ক্রোধান্বিত এবং প্রতি হিংসাপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা নিয়ে ঘোরাফিরা করত। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

(وَإِن يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ) [القلم:51]

কাফিররা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, 'সে তো অবশ্যই পাগল।' (আল-ক্বালাম ৬৮ : ৫১)
অধিকন্তু, নাবী কারীম (ﷺ) যখন কোথাও গমন করতেন এবং তাঁর দুর্বল ও মজলুম সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেন তখন এদের লক্ষ্য করে মুশরিকগণ উপহাস করে বলতঃ

(مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ) [الأنعام:53]

''এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের সম্পর্কে অধিক অবগত নন?' (আল-আন'আম ৬ : ৫৩)
সাধারণতঃ মুশরিকগণের অবস্থা তাই ছিল যার চিত্র নীচের আয়াত সমূহে তুলে ধরা হয়েছেঃ

(إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ وَإِذَا انقَلَبُوْا إِلىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّوْنَ وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ) [المطففين: 29: 33]

''পাপাচারী লোকেরা (দুনিয়ায়) মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। ৩০. আর তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। ৩১. আর তারা যখন তাদের আপন জনদের কাছে ফিরে আসত, তখন (মু'মিনদেরকে ঠাট্টা ক'রে আসার কারণে) ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। ৩২. আর তারা যখন মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'এরা তো এক্কেবারে গুমরাহ্।' ৩৩. তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাযাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।' (আল-মুত্বাফফিফীন ৮৩ : ২৯-৩৩)

মুশরিকদের উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, হাসাহাসি ও বিভিন্নভাবে আঘাতের মাত্রা এর বাড়িয়ে দিল যে তা নাবী (ﷺ)-কে মর্মাহত করে তুলল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

"আমি জানি, তারা যে সব কথা-বার্তা বলে তাতে তোমার মন সংকুচিত হয়। (আল-হিজর ১৫ : ৯৭)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে দৃঢ় করলেন এবং এমন বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করলেন, যাতে করে তার অন্তর থেকে ব্যথা-বেদনা দূরীভূত হয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"কাজেই প্রশংসা সহকারে তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর, আর সাজদাহকারীদের দলভুক্ত হও। আর তোমার রবের ইবাদত করতে থাক সুনিশ্চিত ক্ষণের (অর্থাৎ মৃত্যুর) আগমন পর্যন্ত। (আল-হিজর ১৫ : ৯৮-৯৯)

অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা ইতোপূর্বেই তাঁর প্রিয় হাবীবকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ সব ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"(সেই) ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্যকেও ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, (কাজেই শিরকের পরিণতি কী শীঘ্রই তার জানতে পারবে।" (আল-হিজর ১৫ : ৯৫-৯৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো জানিয়ে দিলেন যে, এ অবস্থার শীঘ্রই উন্নতি হবে এবং এ ঠাট্টা-বিদ্রুপ তাদের ক্ষতির কারণ হবে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

"তোমার পূর্বেও রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, অতঃপর যা নিয়ে তারা ঠাট্ট-বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল।" (আল-আনআম ৬ : ১০)

দ্বিতীয় পন্থা : সংশয় সন্দেহের উসকানি ও মিথ্যা দাওয়াতের মুখোশ উন্মোচন

নাবী (ﷺ)-এর শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়াদির বিকৃত করে দেখানো, নবী (ﷺ)-এর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা এবং মিথ্যা ও অপপ্রচার করা, নাবী (ﷺ)-এর শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সব কিছুকে অর্থহীন ও আজেবাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করা, এ সবগুলো অনবরত এত অধিক পরিমানে করা যাতে জনসাধারণ তার দ্বীন প্রচারের দিকে ধীর স্থিরভাবে মনযোগ দেয়া কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না পায়। মুশরিকগণ যেমন কুরআন সম্পর্কে বলেছেন: (أَضْغَاثُ أَحْلَام) 'এসব অলীক স্বপ্ন' রাত্রে তৈরি করে আর দিনে সে তিলাওয়াত করে (بَلِ افْتَرَاه) সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে অর্থাৎ সে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়েছে এবং তারা এও বলে যে, (إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) 'এক মানুষ তাকে (মুহাম্মাদ (সা)-কে) শিখিয়ে দেয়' (আন-নাহল : ১০৩) তারা বলে,

إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ

'কাফিররা বলে- 'এটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়, সে তা (অর্থ্যাৎ কুরআন) উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন জাতির লোক এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে'। (আল-ফুরক্কান ২৫ : ৪)

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"তারা বলে, এগুলো পূর্ব যুগের কাহিনী যা সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)] লিখিয়ে নিয়েছে আর এগুলোই তার কাছে সকাল-সন্ধ্যা শোনানো হয়। (আল-ফুরকান ২৫ : ৫)

কখনো তারা বলত যে, কাহিনদের উপর যেমন জিন ও শয়তান নাযিল তেমনি তার উপরও একজন জিন ও শয়তান নাযিল হয়। একথার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

"তোমাদেরকে কি জানাবো কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট"। (আশ্ শুআরা ২৬ : ২২১-২২২)

ওটা তো মিথ্যাবাদী পাপীষ্টের উপর নাযিল হয়। তোমরা আমার মধ্যে কোন মিথ্যাচার ও ফাসেকী পাও না। সুতরাং কুরআনকে কিভাবে তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বল?

কখনো তারা নাবী (ﷺ) সম্পর্কে বলত, তাকে একপ্রকার পাগলামীতে পেয়েছে, সে কিছু খেয়াল করে সে অনুযায়ী প্রজ্ঞাপূর্ণ শব্দ তৈরি করে যেমন কবিরা করে থাকে। তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

"তুমি কি দেখো না তারা বিভ্রান্ত হয়ে (কল্পনার জগতে) প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? আর তারা বলে যা তারা করে না।" (আশ শুআরা ২৬ : ২২৫-২২৬)

আয়াতে কথিত গুণ তিনটি কবিদের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু নাবী (ﷺ)-এর মধ্যে এগুলো অনুপস্থিত। অধিকন্তু তার অনুসারীগণ হলেন, হিদায়াতপ্রাপ্ত, আল্লাহ ভীরু, সৎকর্মশীল তাদের চরিত্রে, কাজে কর্মে সবক্ষেত্রে। তাদেরকে কোন প্রকার বিভ্রান্ত স্পর্শ করে নি। নাবী (ﷺ) কবিদের মতো উদ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান না বরং তিনি এক-অদ্বিতীয় প্রতিপালক, এক দীন, এক পথের দিকে আহবান করেন। তিনি যা বলেন তা পালন করেন, যা বলেন না তা করেন না। তবে তিনি কিভাবে কবিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, আর কবিদের সাথে তার তুলনা-ই বা কিভাবে দেয়া যায়। মুশরিকদের পক্ষে থেকে ইসলাম, কুরআন ও নাবী (ﷺ)-এর উপর আরোপিত প্রত্যেক সন্দেহের ক্ষেত্রে এভাবে সন্তোষজনক উত্তর দান করা হয়।

মুশরিকরা সবচেয়ে বেশি সন্দেহে ছিল প্রথমত তাওহীদ বিষয়ে, দ্বিতীয়ত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়াত-রেসালাতে, তৃতীয়ত মৃতদের পুনরুজীবিত হওয়া ও কিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়া নিয়ে। কুরআন তাওহীদ বিষয়ে তাদের সকল প্রকার সন্দেহের যথোপযুক্ত জবাব তো দিয়েছেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি ও বিস্তারিত আকারে আলোচনা করেছে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। শুধু তা-ই নয় তাদের বাতিল মা'বুদের অসারতা সম্পর্কে এত বেশি সমালোচনা করেছে যে, এ বিষয়ে আর কোন আলোচনার অবকাশ নেই। সম্ভবত দীন ইসলাম বিষয়ে তাদের ক্রোধ-আক্রোষের পরিমাণ এত বেশি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আল্লাহ ভীতি, তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য, আমানতদারীতা এবং তাঁর নবুওয়াত সত্য বলে জানা সত্ত্বেও কাফিরদের সন্দেহের কারণ এই যে, তারা বিশ্বাস করতো নবুওয়াত-রিসালত এমনই বড় ও মর্যাদাপূর্ণ পদ যে তা কোন মানুষের হাতে অর্পন করার মতো নয়। সুতরাং তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস মতে যেমন কোন মানুষ রাসূল হতে পারেন না, তেমনি কোন রাসূল কক্ষনো মানুষ হতে পারেন না। ফলে রাসূলল্লাহ (রঃ) যখন তাঁর নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন আর মানুষদেরকে আহবান জানালেন সব উপাস্যকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে তাদের বিবেক পেরেশান ও হতবাক হলো এবং তারা বলে উঠলো :

مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا

‘ এ কেমন রসূল যে খাবার খায়, আবার হাট-বাজারে চলাফেরা করে ? তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে?’ (আল-ফুরক্বান ২৫ : ৭)

তার বলে মুহাম্মাদ (ﷺ) তো মানুষ-

مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

“আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি।” (আল-আন’আম ৬ ৯১) তাদের এ দাবী খণ্ডন করে আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন,

قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ

“বল, তাহলে ঐ কিতাব কে অবতীর্ণ করেছিলেন যা নিয়ে এসেছিলেন মূসা, যা ছিল মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও সঠিক পথের দিকদিশারী।” (আল-আন’আম ৬ :৯১) অথচ তারা জানে যে আল্লাহর নাবী মূসা (আঃ)ও মানুষ ছিলেন। তাছাড়া পূর্ববতী নাবী-রাসূলকেই তার জাতি অস্বীকার করে বলতো-

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا [ابراهيم ١٠] قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ [ابراهيم١١

“তুমি আমাদেরই মত মানুষ বৈ তো নও,” “তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলেছিল, যদিও আমরা তোমাদের মতই মানুষ ব্যতীত নই, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাহদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন।” (ইবরাহীম ১৪ : ১০-১১)

সুতরাং নাবী-রাসূল তো মানুষই হয়ে থাকে; আর রেসালাত ও মানবত্ব- এ উভয়ের কোন তফাৎ নেই।

অধিকন্তু তাদের জানা রয়েছে যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা (আলাইহিমুস সালাম)- তারা সকলেই মানুষ ও নাবী ছিলেন যে ব্যাপারে তাদের সন্দেহের কোন সুযোগ নেই। কাজে কাজেই তারা বলে, আল্লাহ এই দরিদ্র-ইয়াতিম ব্যতীত আর রিসালাতের দায়িত্ব দেয়ার মতো আর কাউকে পেলেন না যে তাকেই রাসূল করে পাঠাতে হবে? আল্লাহ তা’আলা মক্কার বড় বড় জাদরেল নেতাদের না বানিয়ে এই ইয়াতিমকেই রাসূল মনোনীত করলেন?

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

“আর তারা বলে, এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলো না দু জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?” (আয-যুখরুফ ৪৩ : ৩১)

আল্লাহ তা’আলা তাদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন,

(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)

“তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করে?” (আয-যুখরুফ ৪৩ : ৩২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ওহী আল্লাহ তা’আলার এক বিশেষ রহমত।

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

“নবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই অবগত।” (আল-আন’আম ৬ : ১২৪)

আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হতে তাদের অমূলক সন্দেহের দাঁতভাঙ্গা পেয়ে উপায়ান্তর না দেখে তারা আরেকটি বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলো তা হলো। তারা বলল, রাসূলগণ হবেন দুনিয়ার রাজা-বাদশা তারা থাকবেন শত শত গোলাম ও পরিচারকবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাদের জীবন হবে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ও শান-শওকতপূর্ণ; তাদেরকে

দেয়া হবে জীবন-জীবিকার প্রাচুর্যতা। আর মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কী রয়েছে? সে জীবন ধানণের সামান্য বস্তুর জন্যও বাজারে যায় আবার সে দাবি করে যে, সে কিনা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল?

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

"তারা বলে- "এ কেমন রসূল যে খাবার খায়, আর হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে? কিংবা তাকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন, অথবা তার জন্য একটা বাগান হয় না কেন যা থেকে সে আহার করত? যালিমরা বলে- "তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করছ।" (আল-ফুরকান ২৫ : ৭-৮)

তাদের এ ভিত্তিহীন ও অমূলক সন্দেহের উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে- অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ নবী-রাসূল প্রেরণের মহা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সুমহান বাণীকে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, ইতর-ভদ্র, স্বাধীন বা দাস নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। আর যদি ঐসব নাবী রাসূল খুব শান-শওকতপূর্ণ জীবন-যাপন করেন, পরিবেষ্টিত থাকেন অসংখ্য খাদেম ও পরিচারক দ্বারা যে রমক রাজা বাদশাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তবে তো দুর্বল ও দরিদ্রশ্রেণীর জনগণ তার ধারে-কাছে পৌছতেও পারবে না এবং তার নবুওয়াত-রিসালত থেকে কোন উপকারও লাভ করতে পারবে না। অথচ এরাই হচ্ছে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ফলে রিসালতের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যহত তো হবেই, উপরন্তু উপযুক্ত উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

আর তারা যে মৃত্যুর পর পুনথানের বিষয় অস্বীকার করে তা তাদের এ বিষয়ে আশ্চর্যতাবোধ, বেমানান মনে হওয়া ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তারা বলে,

)أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُون(ِ
)ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) وكانوا يقولون

আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও (উঠানো হবে)? আমরা যখন মরব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনো কি আমাদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে?" (আস-স-ফফাত ৩৭ : ১৬-১৭) তারা এও বলে যে, "এ ফিরে যাওয়াটা তো বহু দূরের ব্যাপার।" (ক্ব-ফ ৫০ : ৩)

তারা নিতান্ত একটা অদ্ভুত বিষয় সাব্যস্ত করে বলে,

هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ

"কাফিরগণ বলে- তোমাদেরকে কি আমরা এমন একজন লোকের সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে, না হয় সে পাগল। বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই শাস্তি এবং সুদূর গুমরাহীতে পড়ে আছে।" (সাবা ৩৪ : ৭-৮) তাদের কেউ এ কবিতা চরণ আবৃত্তি করে-

أمؤيك ثم بغك ثم حَشرُ ** حديث لخرافة يا أم عمرو

"মৃত্যু বরণ, অতঃপর পুনঃজীবন লাভ, আবার একত্রিতকরণ! হে উম্মু আমরা এটা তো কল্পকাহিনী ব্যতিত আর কিছুই নয়"।

তাদের এ দাবীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা এমন দেখা যায় যে, যালিম তার যুলুমের প্রতিফল না ভোগ করেই মারা যায়, অত্যাচারিত ব্যক্তি তার অত্যাচারের বদলা না পেয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার সৎকর্মের প্রতিদানপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই দুনিয়া ছেড়ে পরপারে চলে যায়, নিকৃষ্ট পাপী তার পাপের প্রতিফল আস্বাদন করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমতাবস্থায় যদি পুনরায় জীবন লাভ এবং মৃত্যুর পর উভয় দলের মধ্যে কোন সমতা বিধান করা না হয় বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট পাপী, অত্যাচারী বিনা শাস্তিতে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয় তবে তো এমন দাঁড়ায় যে, তা সুস্থ বিবেক তা কক্ষনোই সমর্থন করে না করতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলাও তার এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতে শুধু ফিতনা ফাসাদের আখড়ায় পরিণত করার নিমিত্তে পরিচালিত করছেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

"আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমনভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?" (আল-কালাম ৬৮ : ৩৫,৩৬)

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

"যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তাদেরকে কি আমি ওদের মত করব যারা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে? মুত্তাকীদের কি আমি অপরাধীদের মত গণ্য করব?" (স্ব-দ ৩৮: ২৮)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"যার অন্যায় কাজ করে তারা কি এ কথা ভেবে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে আর ঈমান গ্রহণকারী সৎকর্মশীলদেরকে সমান গণ্য করব যার ফলে তাদের উভয় দলের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? কতই না মন্দ তাদের ফায়সালা!" (আল-জাসিয়াহ ৪৫ : ২১)

তাদের মস্তিষ্ক-বিবেক মৃত্যুর পুনরায় জীবন লাভ করারে অসম্ভব মনে করে এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন,

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا

"তোমাদের সৃষ্টি বেশি কঠিন না আকাশের? তিনি তো সেটা সৃষ্টি করেছেন।" (আন-নাযিআত ৭৯ - ২৭)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“তারা কি দেখে না যে আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর ওগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।” (আল-আহকাফ ৪৬ : ৩৩)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

“তোমরা তোমাদের প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবশ্যই জান তাহলে (আল্লাহ যে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম এ কথা) তোমরা অনুধাবন কর না কেন?” (আল-ওয়াকিয়াহ ৫৬ : ৬২)
বিবেক-বিবেচনা ও প্রচলিত কথা হলো, মৃত্যুর পর পুনঃজীবন দান, (أَهْوَنُ عَلَيْه)
“এটা তার জন্য অতি সহজ।” (আর-রূম ৩০ : ২৭)

তিনি আরো বলেন,

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُه

“যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো।” (আল-আম্বিয়া ২১ : ১০৪)
আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,
(أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّل)
“আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।” (ক্ব-ফ ৫০ : ১৫)
এভাবে একের পর এক তাদের সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে ও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে যা প্রত্যেক চিন্তাশীল ও প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারীদের তৃপ্তিদান করেছে। কিন্তু মুশরিকদের উদ্দেশ্য তো কেবল অহংকার-বড়ত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর জমীনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের মতামতকে বিশ্ববাসীর উপর চাপিয়ে দেয়া। ফলে তারা তাদের অবাধ্যতার উপরই অটল থাকলো।
তৃতীয় পন্থা : অতীতকালের ঘটনাবলী এবং উপাখ্যান সমূহ এবং কুরআন কারীমে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে অর্থহীন বাগড়া বা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে জনমনে ধাঁধার সৃষ্টি করা এবং মুক্ত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না দেয়া

উপযুক্ত সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মুশরিকগণ মানুষদেরকে তাদের সাধ্যমত কুরআন ও ইসলামের দাওয়াতের কথা শ্রবণ করতে বাধা প্রদান করতো। তারা যখন দেখতে যে, নাবী (ﷺ) লোকেদেরকে দীনের পথে আহবান করছে বা সালাত আদায় করছে, কুরআন তেলাওয়াত করছে তখন তারা মানুষদেরকে সেখান হতে তাড়িয়ে দিত, হৈচৈ-হৈ-হুল্লোড়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হট্টগোল পাকিয়ে দিত, গান গাইতো এবং নানা খেল-তামাশায় মেতে উঠত। এ বিষয়ে কুরআনের বাণী,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

“কাফিররা বলে- এ কুরআন শুনো না, আর তা পড়ার কালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।” (হা-মীম সাজদাহ ৪১ : ২৬)

অবস্থা এমন করে ফেলতো যে, নবী (ﷺ) সেখানে আর লোকেদের কুরআন তেলাওয়াত শোনাতে পারতেন না। এ অবস্থা পঞ্চম নবুওয়াতী বর্ষের শেষ অবধি চলে। অনেক সময় রাস্তাঘাটে তাঁর তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে মুশরিকরা এরকম হট্টগোল বাধাত।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে নাযর বিন হারিসের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে ছিল কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম শয়তান। নযর বিন হারিস একদা হীরাহ চলে গেলেন। সেখানে রাজা-বাদশাহদের ঘটনাবলী, ইরানের বিখ্যাত বীর রুস্তম ও প্রাচীন গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের কাহিনী শিখলেন। এ সব শেখার পর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন জায়গায় আল্লাহর নির্দেশাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন তখন সেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতেন, ‘আল্লাহর শপথ হে কুরাইশগণ! আমার কথা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কথার চেয়ে উত্তম। এরপর তিনি পারস্য সম্রাটদের, রুস্তম এবং সেকান্দার বাদশাহর (আলেকজান্ডার) কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতেন এবং বলতেন, বল, কোনদিক দিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কথা আমার কথার চেয়ে উত্তম

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে এটাও জানা যায় যে, ইসলাম বৈরিতার চরম পর্যায়ের ব্যবস্থা হিসেবে নাযর একাধিক ক্রীতদাসী রেখেছিলেন। যখন তিনি জানতে পারতেন যে, কোন লোক ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছে করছে তখন সেই লোকের প্রতি এক

ক্রীতদাসীকে নিয়োজিত করে দিতেন। ক্রীতদাসীকে বলতো তুমি তাকে খাওয়া দাওয়া করাও এবং তার মনোরঞ্জনের জন্য গীত গাও, বাদ্য বাজাও। মুহাম্মাদ যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছে এটা তার চেয়ে উত্তম।[2] এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

‘কিছু মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে আর আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।’ (লুক্বমান ৩১ :৬)

চতুর্থঃঅন্যায় অত্যাচার

নবুওয়তের চতুর্থ বছরে যখন প্রথমবার সর্ব সাধারণের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হল, তখন মুশরিকগণ তা প্রতিহত করার কৌশল হিসেবে ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কৌশল কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁরা ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করে অল্প অল্প করে অগ্রসর হতে থাকেন এবং এভাবে এক মাসের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করেন নি। কিন্তু তাঁরা যখন এটা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের ঐ কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপ্তিলাভের পথে তেমন কার্যকর হচ্ছে না, তখন তাঁরা সকলে পুনরায় এক আলোচনা চক্রে মিলিত হন এবং মুসলমানদের শাস্তি প্রদান ও তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক গোত্রপতি তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের শাস্তি প্রদান করা শুরু করে দিল। অধিকন্তু ঈমান আনয়নকারী দাস-দাসীদের উপর তারা অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিল।

স্বাভাবিকভাবেই আরবের নেতা ও গোত্রপতিদের অধীনে অনেক ইতর ও নিম্নশ্রেণীর লোকজন থাকতো। এসব লোকেদের তারা তাদের ইচ্ছেমত পরিচালনা করতো। এদের মধ্যে যারা মুসলামান হতো তাদের উপর তারা চড়াও হতো। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতো। তারা তাদের শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলাসহ এমন সব পাশবিক আচরণ করতে যা পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিটিও প্রত্যক্ষ করে অস্থির কিংবা বিচলিত না হয়ে পারতেন না।

আবূ জাহল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার কথা শুনত তখন সে তাকে ন্যায়-অন্যায় বলে গালি গালাজ করত, অপমান-অপদস্থ করত এবং ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাত। জ্ঞাতি গোষ্ঠীর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি মুসলিম হতো তাহলে তাকে সে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারধোর করত এবং মারধোর করার জন্য অন্যদের প্ররোচিত করত।[1]

'উসমান বিন আফফানের চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে নীচ থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত'।[2]

মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর মা যখন তার ইসলাম গ্রহণের খবর পেল তখন সে তার খানা পানি (আহারাদি) বন্ধ করে দিল এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। প্রথম জীবনে তিনি আরাম আয়েশ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে সর্পের গাত্র থেকে খুলে পড়া খোলসের মতো তার শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়ত।[3]

বিলাল, উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহীর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উমাইয়া তার গলায় দড়ি বেঁধে ছোকরাদের হাতে ধরিয়ে দিত। তারা সেই দড়ি ধরে তাঁকে পথে প্রান্তরে টেনে হিচড়ে নিয়ে বেড়াত। এমনকি টানাটানির ফলে তার গলায় দড়ির দাগ বসে যেত। উমাইয়া স্বয়ং হাত পা বেঁধে তাকে প্রহার করত এবং প্রখর রোদে বসিয়ে রাখত। তাকে খানা পানি না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখত। এ সবের চেয়েও অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর হতো তখন যখন দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের সময় কংকর ও বালি আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং তাকে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হতো। তারপর বলত আল্লাহর শপথ তুই এভাবেই শুয়ে থাকবি। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বি। অথবা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গে কুফরী করবি। বিলাল(রাঃ) ঐ অবস্থাতেই বলতেন, 'আহাদ, আহাদ''। (অর্থ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)। একদিন বিলাল (রা.) এমনভাবে এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিলেন তখন আবূ বাকর সিদিক (রা.) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বিলাল (রা.)-কে এক কালোদাসের বিনিময়ে এবং বলা হয়েছে যে, দু'শত দেহরাম (৭৩৫ গ্রাম রুপা) অথবা দু'শ আশি দিরহামের (১ কেজিরও বেশী রুপা) বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।[4

আম্মার বিন ইয়াসির বনু মাখযুমের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির এবং মাতার নাম সুমাইয়া। তিনি এবং তাঁর পিতামাতা সকলে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ

করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর কেয়ামতের আযাব ভেঙ্গে পড়ে। দুপুর বেলা প্রখর রোদ্র তাপে মরুভূমির বালুকণারাশি এবং কংকর রাশি যখন আগুণের মতো উত্তপ্ত থাকত তখন আবূ জাহলের নেতৃত্বে মুশরিকগণ তাদেরকে নিয়ে গিয়ে সেই উত্তপ্ত বালি এবং কংকরের উপর শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। এক দিবস তাদেরকে যখন সেভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, “হে ইয়াসিরের বংশধর ধৈর্য্য ধারণ করো, তোমাদের স্থান জান্নাতে’। অতঃপর শাস্তি চলা অবস্থায় ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন।

পাষণ্ড আবূ জাহল আম্মারের মা সুমাইয়ার নারী অঙ্গে বর্শ বিদ্ধ করে। অতঃপর তিনি মারা যান। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ। সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত ছিলেন আবূ হুজাইফাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন মাখযুমের ক্রীতদাসী। সুমাইয়া ছিলেন অতি বৃদ্ধা এবং দুর্বল।

‘আম্মারের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। কখনো তাকে প্রখর রোদে শুইয়ে দিয়ে তার বুকে লাল পাথর চাপা দেয়া হতো, কখনো বা পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেয়া হতো। মুশরিকগণ তাকে বলত, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে গালমন্দ দেবে এবং আমাদের উপাস্য লাত এবং উযযা সম্পর্কে উত্তম কথা না বলবে ততক্ষণ তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হবে না। নেহাৎ নিরূপায় হয়ে ‘আম্মার (রা.) তাদের কথা মেনে নিলেন।[5] তারপর নাবী করীমের দরবারে উপস্থিত হয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সবিস্তারে ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারমা অবতীর্ণ হল :

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

‘কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে। (আন-নাহল ১৬ : ১০৬)

আবূ ফুকাইহাহ (রা.) বনু আব্বাস গোত্রের দাস ছিলেন। সে ছিল আযদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অপর নাম ছিল আফলাহ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তাঁর মালিক পায়ে লোহার শিকল বেঁধে, শরীর হতে কাপড় খুলে নিয়ে তাকে কংকরময় পথ ও প্রান্তরে

টেনে নিয়ে বেড়াতেন।[6] অতঃপর তার পিঠের উপর ভারী পাথর চাপা দিত ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারতেন না। এভাবে শাস্তি দেয়ার এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এমন শাস্তি চলছিল নিয়মিতভাবে। অতঃপর তিনি হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলার সাথে তিনি হিজরত করেন। একদা তারা তার পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে উত্তপ্ত ময়দানে নিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগালো। এতে কাফিররা ধারণা করলো যে, আবূ ফুকাইহাহ মারা গেছে। ইত্যবসরে আবূ বকর (রা.) সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ক্রয় করে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ করে দিলেন।

খাব্বাব বিন আরাত খুযা'আহ গোত্রের উম্মু আনমার সিবা' নাম্নী এক মহিলার দাস ছিলেন। খাব্বাব বিন আরাত ছিলেন কর্মকার। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মু আনমার তাকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিত। উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তার পিঠ ও মাথায় সেঁক দিত যাতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনকে অস্বীকার করে। কিন্তু এতে তার ঈমান ও ইসলামে টিকে থাকার সংকল্প আরো বৃদ্ধি পায়। আর মুশরিকগণ তার উপর নানাধরণের নির্যাতন চালাতেন। কখনো বা খুব শক্ত হাতে চুল টানাটানি করে নিষ্পেষণ চালাতেন। কখনো বা আবার খুব শক্ত হাতে তার গ্রীবা ধরে মুচড়ে দিতেন। এক সময় তাকে কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হয়েছিল যাতে তিনি উঠতে না পারেন। এতে তার পৃষ্ঠদেশ পুড়ে গিয়ে ধবল কুষ্ঠের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল।[7]

রুমী কৃতদাসী যিন্নীরাহ[8] ইসলাম গ্রহণ করলে এবং আল্লাহর উপর আনার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। তাকে চোখে আঘাত করা হয় ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ হওয়ার পরে তাকে বলা হলো তোমাকে লেগেছে। উত্তরে যিন্নীরাহ বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে লাত ও উযযার আসর লাগে নি। বরং এটা আল্লাহর একটা অনুগ্রহ এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তা ভাল হয়ে যাবে। অতঃপর একদিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তার চক্ষু ভাল করে দিয়েছেন। তার এ অবস্থা দর্শন করে কুরাইশরা বলল, এটা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর একটা যাদু।

বনু যুহরার কৃতদাসী উম্মু 'উবায়েস ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুশরিকগণ তাকে শাস্তি দিত; বিশেষ করে তার মনীব আসওয়াদ বিন 'আবদে ইয়াগুস খুব শাস্তি দিত। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘোরতর শত্রু এবং ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের অন্যতম ছিল।

বনু আদী গোত্রের এক পরিবার বনু মুয়াম্মিলের এক দাসীর মুসলিম হওয়ার সংবাদে 'উমার বিন খাত্তাব তাকে এতই প্রহার করেছিলেন যে, তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে

এ বলে ক্ষান্ত হয়েছিলেন, 'মানবত্বের কোন কারণে নয় বরং খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে শাস্তি দেয়া থেকে আপাততঃ তোমাকে রেহাই দিলাম। অতঃপর বলতেন, তোমার সাথে তোমার মনিব এমন আচরণই করবে।[9] ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল উমার (রা.) ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে।

নাহদিয়া এবং তার কন্যা উম্মু উবায়েস সকলেই দাসী ছিলেন। এঁরা উভয়েই বনু আব্দুদ্দার গোত্রের। ইসলাম গ্রহণের পর এরা সকলেই মুশরিকদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার ফলে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার সম্মুখীন হন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যে সব দাসকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মখীন হতে হয় তাদের মধ্যে আমির বিন ফুরায়রাও একজন। তাকে এতই শাস্তি দেয়া হয় যে, তার অনুভূতি শক্তি লোপ পায় এবং তিনি কি বলতেন নিজেই তা বুঝতে পারতেন না।

অবশেষে আবূ বাকর (রা.) দাস-দাসীগুলোকেও ক্রয় করে নেয়ার পর মুক্ত করে দেন।[10] এতে তাঁর পিতা আবূ কুহাফাহ তাঁকে ভৎর্সনা করে বললেন, আমি দেখছি যে, তুমি দুর্বল দাস-দাসীদের মুক্ত করে দিচ্ছ। এর পর যদি তুমি কোন প্রহৃত ব্যক্তিকে মুক্ত কর তবে আমি তোমাকে বাধা প্রদান করবো। পিতার এ কথা শ্রবণ করত আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি তো কেবল তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই মুক্ত করি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর প্রশংসা এবং তাঁর শত্রুদের নিন্দা জ্ঞাপন করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

"কাজেই আমি তোমাদেরকে দাউ দাউ ক'রে জ্বলা আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। - চরম হতভাগা ছাড়া কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। - যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়"। (সূরাহ আল-লাইল ৯২ : ১৪-১৬)

উপর্যুক্ত আয়াতে ধমকী উমাইয়া বিন খালাফ ও তার মতো আচরণকারীদের উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

“তাথেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে, - যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, - (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, - একমাত্র তার মহান প্রতিপালকের চেহারা (সন্তোষ) লাভের আশায়। - সে অবশ্যই অতি শীঘ্র (আল্লাহর নিমাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২ : ১৭-২১)

উপর্যুক্ত আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন, আবূ বাকর সিদীক (রা.)।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আবূ বকর (রা.)-কেও শাস্তি পেতে হয়েছে। তাঁকে এবং তাঁর সাথে ত্বালহাহ বিন উবাইদুল্লাহকে সালাত থেকে বিরত রাখতে এবং দীন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নওফেল বিন খুওয়াইলিদ একই রশিতে শক্ত করে বোঁধে রাখতো। কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। তাঁরা উভয়ে সর্বদা এক সাথে সালাত আদায় করতেন। এজন্য তাঁদেরকে ‘কারীনাইন’ (দু’ সঙ্গী) বলা হয়। আবার এও বলা হয় যে, তাদের সাথে এরকম করার কারণ, ‘উসমান বিন উবাইদুল্লাহ- ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহর ভাই।

প্রকৃত অবস্থা ছিল মুশরিকগণ যখন কারো মুসলিম হওয়ার সংবাদ পেতেন তখন তাদের কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তারা উদ্বাহু এবং বদ্ধ পরিকর হয়ে যেতেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দরিদ্র মুসলমানদেরকে শাস্তি দেয়া ছিল তাদের নিকট একটি মামুলি ব্যাপার। বিশেষ করে দাস-দাসীদের শাস্তি দিতে কোন পরওয়াই করতো না। কেননা তাদের শাস্তি দেয়া কারণে কেউ ক্রুদ্ধও হতো না আর তাদের শাস্তি লাঘবের জন্য কেউ এগিয়েও আসতো না। বরং তাদের মনিবেরাই স্বয়ং শাস্তি প্রদান করতো। তবে কোন বড় ও সম্ভান্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের শাস্তি দেয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে তারা যখন তাদের গোত্রের সম্মানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হতেন। এসব সম্ভ্রান্ত লোকের উপর মুশরিকরা সামান্যই চড়াও হতো যদিও এদেরকেই তারা দীনের ক্ষেত্রে বেশি ভয় করতো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান

তাদের প্রকৃত সমস্যা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। বংশ মর্যাদার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শত্রু-মিত্র পক্ষের কেউ তার নিকট আগমন করলে তাকে মান-মর্যাদা বা

ইজ্জতের ভূষণে ভূষিত হয়েই সেখানে আগমন করতে হতো। কোন দুষ্টদুরাচার কিংবা অনাচারীর পক্ষে তার সম্মুখে কোন অশ্লীল বা জঘন্য কাজ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন কখনই সম্ভব হতো না ।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর্যুক্ত গুণাবলী এবং ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রসূত প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হল চাচা আবূ ত্বালিবের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই আবূ ত্বালিব এত মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, তার কথা অমান্য করা কিংবা তার গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করার মতো দুঃসাহসিকতা কারোরই ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অন্যান্য কুরাইশগণকে কঠিন দুশ্চিন্তা, এবং টানা পোড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হল। সাত-পাঁচ এ জাতীয় নানা কথা নানা প্রশ্ন এবং নানা যুক্তিতর্কের পসরা নিয়ে তারা আবূ ত্বালিবের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তবে তা খুব হিকমত ও নম্রতার সাথে এবং মনে মনে চ্যালেঞ্জ ও ভীতিপ্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা গোপন করে যাতে করে তাদের বক্তব্য আবূ ত্বালিব খুব সহজেই মেনে নেয়।

আবূ ত্বালিব সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি দল

ইবনে ইসহাক্ব বলেন যে, কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একত্র হয়ে আবূ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবূ ত্বালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীগণকে গালিগালাজ করছেন, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছেন, আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেকহীন, মূর্খ বলছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রষ্ট বলছেন। অতএব, হয় আপনি তাকে এ জাতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখুন নতুবা আমাদের এবং তার মধ্য থেকে আপনি দূরে সরে যান। কারণ, আপনিও আমাদের মতই তার বক্তব্য মতে ভিন্নধর্মের অনুসারী। তার ব্যাপারে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট হব।

এর জবাবে আবূ ত্বালিব অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাঙ্গে পাঁচরকম কথা-বার্তা বলে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করলেন। এ প্রেক্ষিতে তারা ফিরে চলে গেলেন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ পূর্ণোদ্যমে তার প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। দীনের দায়োত প্রচার করতে থাকলেন এবং সেদিকে লোকেদেরকে আহ্বান জানাতে থাকলেন।[1]

এদিকে কুরাইশগণও বেশি দেরি করলেন না যখন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাজ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত পূর্ণামাত্রায় চালিয়ে যাচ্ছেনই, বরং তিনি তাঁর দাওয়াতী তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিরুপায় তারা পূর্বের চেয়ে আরো ক্রোধ ও গরম মেজাজ নিয়ে আবূ ত্বালিবের নিকট পুনরায় আগমন করলেন।

আবূ ত্বালিবের প্রতি কুরাইশগণের ধমক

আবূ ত্বালিবের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কুরাইশ প্রধানগণ আবূ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আবূ ত্বালিব! আপনি আমাদের মাঝে মান-মর্যাদার অধিকারী একজন বয়স্ক ব্যক্তি। আমরা ইতোপূর্বে আপনার নিকট আবেদন করেছিলাম যে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে নিন্দাবাদ করা থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু আপনি তা করেন নাই। আপনি মনে রাখবেন, আমরা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনা যে আমাদের পিতা পিতামহ এবং পূর্ব পুরুষদের গালি-গালাজ করা হোক, আমাদের বিবেককে নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করা হোক এবং আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করা হোক। আমরা আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি হয় আপনি তাকে সে সব থেকে নিবৃত্ত রাখুন, নচেৎ তামাদের দু'দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতেই থাকবে'।

কুরাইশ প্রধানগণের এমন কঠোর বাক্য বিনিময় এবং আস্ফালনে আবূ ত্বালিব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সেই মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করতে না পেরে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ডেকে পাঠালেন। চাচার আহবানে নাবী কারীম (ﷺ) সেখানে উপস্থিত হলে আবূ ত্বালিব তাঁর নিকট কুরাইশ প্রধানগণের আলোচনা এবং আচরণ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করার পর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা! একটু বিচার বিবেচনা করে কাজ করো। যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই সে ভার আমার উপর চাপিয়ে দিও না।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ধারণা করলেন, মানবকুলের মধ্যে তার একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সহায় চাচাও বোধ হয় আজ থেকে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন এবং তাকে সাহায্য দানের ব্যাপারে তিনিও বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। তিনি এটাও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, আজ থেকে তিনি এক নিদারুণ সংকটে নিপতিত হতে চললেন। তবুও আল্লাহ তা'আলার উপর অবিচল আস্থা রেখে তিনি বললেন,

يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته

'চাচাজান, আল্লাহর শপথ। যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু চাচাজান! আপনি অবশ্যই জানবেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।

স্বজাতীয় এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নির্বুদ্ধিতা, হঠকারিতা এবং পাপাচারে ব্যথিত-হৃদয় নাবী (ﷺ)-এর নয়নযুগলকে বাষ্পাচ্ছন্ন করে তুলল। তিনি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে ভবিষ্যতের দিনগুলো তার জন্য আরও কঠিন হবে এবং আরও ভয়াবহতা এবং কঠোরতার সঙ্গে তাকে মোকাবালা করে চলতে হবে। তার নয়ন যুগলে অশ্রু কিন্তু অন্তরে অদম্য সাহস। এমন এক মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি চাচা আবূ ত্বালিবের সম্মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন।

তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের এ অসহায়ত্ব ও মানসিক অশান্তিতে আবূ ত্বালিবের প্রাণ কেঁদে উঠল। পরক্ষণেই তিনি তাকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন। যখন নাবী কারীম (ﷺ) তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাকে সম্বোধন করে বললেন : 'প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র! নির্দ্বিধায় নিজ কর্তব্য পালন করে যাও। আল্লাহর কসম করে বলছি আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করব না।[1] তারপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতার চরণগুগুলো আবৃত্তি করলেন :

والله لن يصلوا إليك تجنعيهم ** حتى أرَسُدّ في العراب دفيئا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ** وانهز وقرّ بذاك منك عيوكا

অর্থ : 'আল্লাহ চান তো তারা স্বীয় দলবল নিয়ে কখনই তোমার নিকট পৌছতে পারবে না যতক্ষণ না আমি সমাহিত হয়ে যাব। তুমি তোমার দ্বীনী প্রচার-প্রচারণা কর্মকাণ্ড যথাসাধ্য চালিয়ে যাও তাতে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি আসবে না। তুমি খুশি থাক এবং তোমাব চক্ষু পরিতৃপ্ত হোক।

পুনরায় আবূ ত্বালিব সমীপে কুরাইশগণ

বিগত দিবসের চড়া-কড়া কথা সত্ত্বেও কুরাইশগণ যখন দেখল যে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিরত থাকা তো দূরের কথা, আরও জোরে শোরে প্রচার-প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন এটা তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে, আবূ ত্বালিব মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পরিত্যাগ করবেন না। এ ব্যাপারে তিনি কুরাইশগণ হতে পৃথক হয়ে যেতে এমনকি তাদের শত্রুতা ক্রয় করতেও প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু তবুও ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়। চড়া কড়া কথা বার্তা এবং যুদ্ধের হুমকি দিয়েও যখন তেমন কিছুই হল না তখন একদিন যুক্তি পরামর্শ করে অলীদ বিন মুগীরাহর সন্তান ওমারাহকে সঙ্গে নিয়ে আবূ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবূ ত্বালিব! এ হচ্ছে কুরাইশগণের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এবং ধার্মিক যুবক। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। এর শোনিতপাতের খেসারত এবং সাহয্যের আপনি অধিকারী হবেন। আপনি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিন। এ যুবক আজ হতে আপনার সন্তান বলে গণ্য হবে। এর পরিবর্তে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন। সে আপনার ও আমাদের পিতা, পিতামহদের বিরোধিতা করছে, আমাদের জাতীয়তা, একতা এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে এবং সকলের জ্ঞানবুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতার আবরণে আচ্ছাদিত করছে। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্ত র নেই। এক ব্যক্তির বিনিময়ে এক ব্যক্তিই যথেষ্ট'।

প্রত্যুত্তরে আবূ ত্বালিব বললেন, 'তোমরা যে কথা বললে এর চেয়ে জঘন্য এবং অর্থহীন কথা আর কিছু হতে পারে কি? তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে এ উদ্দেশ্যে দিচ্ছ যে আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে লালন-পালন করব আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দিব এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! কক্ষনোই এমনটি হতে পারবে না'।

এ প্রেক্ষিতে নওফাল বিন আবদে মানাফের পুত্র মুতয়িম বিন আদী বলল : 'আল্লাহর কসম হে আবূ ত্বালিব! তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোকজন তোমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা সুলভ কথাবার্তা বলছে, কাজকর্মের যে ধারা পদ্ধতি তোমার জন্য বিপজ্জনক তা থেকে তোমাকে রক্ষার প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। কিন্তু আমি যা দেখছি তাতে আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি তাদের কোন কথাকেই তেমন আমল দিতে চাচ্ছনা'।

এর জবাবে আবূ ত্বালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা আমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা প্রসূত কোন কথাবার্তাই বলো নি। বরং তোমরা আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে আমার

বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছ এবং বিরুদ্ধবাদীদের সাহায্যার্থে কোমর বেঁধে লেগেছ। তবে ঠিক আছে তোমাদের যেটা করণীয় মনে করবে তাইতো করবে।[1]
কুরাইশগণ যখন এবারের আলোচনাতেও হতাশ হলেন এবং আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিষেধ করতে ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া বাধা প্রদান করারা ব্যাপারে একমত হলেন না। তখন কুরাইশগণ অগত্যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সরাসরি শত্রুতা পোষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বিভিন্নমুখী শত্রুতা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর থেকে তার সম্মান-মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকলো এবং তাদের কাছে বিষয়টা খুব কঠিন হয়ে গেল যে তাদের ধৈর্য্যের ভেঙ্গে গেল। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে শত্রুতার হাতকে প্রশস্ত করে দিল। ফলে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস, সংশয়-সন্দেহ, বিশৃংখলা সৃষ্টি ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আবূ লাহাবের দৃষ্টিভঙ্গ ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। সে ছিল বনু হাশিমের অন্যতম নেতা। সে অন্যান্যদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর ব্যাপারে বেশি ভীত ছিল। সে ও তার স্ত্রী ছিল ইসলামের গোড়ার শত্রু। এমনকি অন্যান্য কুরাইশগণ যখন ঘুণাক্ষরেও নাবী কারীম (ﷺ)-কে নির্যাতন করার চিন্তা-ভাবনা করেন নি তখনে আবূ লাহাবের আচরণ ছিল অত্যন্ত মারমুখী। বনু হাশিমের বৈঠকে এবং সাফা পর্বতের নিকট তিনি যা কিছু করেছিলেন তা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, সাফা পর্বতের উপর নাবী কারীম (ﷺ)-কে আঘাত করার জন্য তিনি একখণ্ড পাথর হাতে উঠিয়েছিলেন।[1]
রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর আবূ লাহাব যে কত পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেছিলেন তার আরও বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার ছেলে ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মেয়ের মধ্যকার বিবাহ সম্পর্কোচ্ছেদ। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দু'মেয়ের সঙ্গে আবূ লাহাব তার দু'ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু নবুওয়াত প্রাপ্তির পর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের মাধ্যমে তিনি তার দু'ছেলেরই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন

তাঁর পাশবিকতার আরও একটি ঘটনা হচ্ছে নাবী কারীম (ﷺ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ যখন মারা যান তখন তিনি (আবূ লাহাব) উল্লাসে ফেটে পড়েন, টগবগিয়ে দৌড়াতে তার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট এ দুঃসংবাদকে শুভ সংবাদরূপে পরিবেশন করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর লেজকাটা (পুত্রহীন) হয়েছে।[3]

অধিকন্তু, ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে, হজ্বের মৌসুমে আবূ লাহাব নাবী কারীম (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বাজার ও গণজমায়েতে তার পিছনে লেগে থাকতেন এবং জনতার মাঝে অপপ্রচার চালাতেন।

তারিক্ব বিন আব্দুল্লাহ মুহারিবীর বর্ণনায় জানা যায় যে, এ ব্যক্তি নাবী কারীম (ﷺ)-কে শুধু মাত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং কোন কোন সময় তিনি নাবী (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করতেন, যার ফলে তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যেত।[4]

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (যার নাম আরওয়া) ছিলেন হারব বিন উমাইয়ার কন্যা আবূ সুফইয়ানের বোন। নাবী (ﷺ)-এর প্রতি অত্যাচার ও জুলম ও নির্যাতনে তিনি ছিলেন স্বামীর যোগ্য অংশিদারিণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণা মহিলা। এ সকল দুষ্কর্মে তিনি স্বামী থেকে পশ্চাদপদ ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চলার পথে এবং দরজায় কাঁটা ছড়িয়ে কিংবা পুঁতে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়া, কটুক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি নানাবিধ জঘন্য কাজকর্মে তিনি লিপ্ত থাকতেন। তাছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ফেৎনা ফাসাদের আগুন জ্বলিয়ে দেয়া এবং উস্কানী দিয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টিকরা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এজন্যই আল কুরআনে তাঁকে الحطب। (খড়ির বোঝা বহনকারিণী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যখন তিনি অবগত হলেন তাঁর এবং তাঁর স্বামীর ব্যাপারে নিন্দাসূচক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খোঁজ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন মসজিদুল হারামে কাবাহ গৃহের পাশে অবস্থান করছিলেন। আবূ বকর সিদীকও (রা.) তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আবূ লাহাব পত্নী যখন এক মুষ্ঠি পাথর নিয়ে বায়তুল হারামে (পবিত্র গৃহে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মুখভাগে এসে দণ্ডায়মান হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা মহিলার দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দেয়ার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখতে পেলেন না।

অথচ আবূ বাকর (রাঃ)-কে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আবূ বাকর তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, সে নাকি আমাদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ করে আমি যদি এখন তাকে পেতাম তার মুখের উপর এ পাথর ছুঁড়ে মারতাম। দেখ আল্লাহর শপথ আমি একজন মহিলা কবি। তারপর সে এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল।[5]

مذمما عصينا * وامره ابينا * ودينه قلينا

অর্থ : আমরা মন্দের অবজ্ঞা করেছি। তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং তাঁর দ্বীনকে (ধর্ম) ঘৃণা এবং নীচু মনে করে ছেড়ে দিয়েছি।
এর পর তিনি সেখান হতে চলে গেলেন। আবূ বাকর (রা.) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল। তিনি কি আপনাকে দেখেন নাই?’ আল্লাহর নাবী বললেন,

(ما رأتنى لقد أخذ الله ببصرها عنى)

“না, তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আল্লাহ তার দর্শন শক্তিকে আমার থেকে রহিত করে দিয়েছিলেন।[6]
অথচ আবূ বাকর (রাঃ)-কে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আবূ বাকর তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, সে নাকি আমাদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ করে আমি যদি এখন তাকে পেতাম তার মুখের উপর এ পাথর ছুঁড়ে মারতাম। দেখ আল্লাহর শপথ আমি একজন মহিলা কবি। তারপর সে এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল।[5]

مذمما عصينا * وامره ابينا * ودينه قلينا

অর্থ : আমরা মন্দের অবজ্ঞা করেছি। তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং তাঁর দ্বীনকে (ধর্ম) ঘৃণা এবং নীচু মনে করে ছেড়ে দিয়েছি।
এর পর তিনি সেখান হতে চলে গেলেন। আবূ বাকর (রা.) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল। তিনি কি আপনাকে দেখেন নাই?’ আল্লাহর নাবী বললেন,
(ما رأتنى لقد أخذ الله ببصرها عنى)

“না, তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আল্লাহ তার দর্শন শক্তিকে আমার থেকে রহিত করে দিয়েছিলেন।[6]

আবূ বাকর বাযযারও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এর সঙ্গে আরও কিছু কথা সংযোজন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবূ লাহাব পত্নী আবূ বাকর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আবূ বাকর! তোমার সঙ্গী আমার বদনাম করেছে। আবূ বাকর (রা.) বললেন, ‘না, এ ঘরের প্রভুর শপথ! তিনি কোন কবিতা রচনা কিংবা আবৃত্তি করেন না। আর না, সে সব তিনি মুখেই আনেন। তিনি বললেন, ‘তুমি সত্যই বলছ’। এ সব সত্ত্বেও আবূ লাহাব সেই সব লোহমর্ষক ঘটনাবলী ঘটিয়ে চলেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা ও প্রতিবেশী। উভয়ের ঘর ছিল পাশাপাশি এবং লাগালাগি। এভাবেই তাঁর অন্যান্য প্রতিবেশীগণও তার উপর নির্যাতন চালাতেন।

ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় রয়েছে যে, যে সকল লোকজনেরা নাবী কারীম (ﷺ)-কে তার বাড়িতে জ্বালা-যন্ত্রণা দিতেন তাদের নেতৃত্ব দিতেন আবূ লাহাব, হাকাম বিন আবিল আস বিন উমাইয়া, উক্ববা বিন আবী মু’আইত্ব , আদী বিন হামরা সাক্বাফী, ইবনুল আসদা হুযালী; এঁরা সকলেই ছিলেন তার প্রতিবেশী। এঁদের মধ্যে হাকাম বিন আবিল আস[7] ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর তাদের জুলম নির্যাতনের ধারা ছিল এরূপ, তিনি যখন সালাতে রত হতেন তখন ছাগলের নাড়ি ভূড়ি ও মলমূত্র এমনভাবে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত তার উপর। উনুনের উপর হাড়ি পাতিল চাপিয়ে রান্নাবান্না করার সময় এমনভাবে আবর্জনাদি নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত হাড়ি পাতিলের উপর। তাদের থেকে নিস্কৃতি লাভের মাধ্যমে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পৃথক মাটির ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন।

যখন তাঁর উপর এ সকল আবর্জনা নিক্ষেপ করা হতো তখন সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে দরজায় খাড়া হতেন এবং তাঁদের ডাক দিয়ে বলতেন,

يا بنى عبد مناف أي جوار هذا

“ওহে আবদে মানাফ প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর এ কেমন আচরণ।”

তারপর আবর্জনা স্তুপে নিক্ষেপ করে আসতেন।[8]

উক্ববা বিন আবী মু’আইত্ব আরও দুষ্ট প্রকৃতির এবং প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন। সহীহুল বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ‘একদা নাবী কারীম (আঃ) বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় আবূ জাহল এবং তার বন্ধুবর্গ

সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অন্যদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘কে এমন আছে যে, অমুকের বাড়ি থেকে উটের ভূড়ি আনবে এবং মুহাম্মাদ যখন সালাত রত অবস্থায় সিজদায় যাবে তখন তার পিঠের উপর ভূড়িটি চাপিয়ে দিবে। ঐ সময় আরববাসীগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি উক্ববা বিন আবী মু’আইত্ব [9] উঠল এবং কথিত ভূড়িটি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকল। যখন নাবী কারীম (ﷺ) সিজদায় গেলেন তখন সেই দুরাচার নরাধম ভুঁড়িটি নিয়ে গিয়ে তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিল। আমি সব কিছুই দেখছিলাম, কিন্তু কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। হায় যদি আমার মধ্যে তাকে বাচানোর কোন ক্ষমতা থাকত।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আরও বলেন, ‘এর পর তারা দানবীয় আনন্দ ও উত্তেজনায় পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলাঢলি, পাড়াপাড়ি করে মাতামাতি শুরু করে দিল। মনে হল ওদের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। হায় আফসোস! যদি তারা একটু বুঝত যে, কী সর্বনাশের পথ তারা বেছে নিয়েছে’।

একদিকে অর্বাচীনের দল যখন দানবীয় আনন্দ ও নারকীয় কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তখন দুনিয়ার সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) সিজদারত অবস্থায় বেহেশতী আবেহায়াত পানে বিভোর ছিলেন। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য।

নাবী তনয়া ফাত্বিমাহ (রা.) এ দুঃসংবাদপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত সেখানে আগমন করেন এবং ভূঁড়ি সরিয়ে পিতাকে তার নীচ থেকে উদ্ধার করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শির উত্তোলন করে তিনবার বললেন :

]اللهم عليك بقريش[

হে আল্লাহ! এ কুরাইশদিগকে পাকড়াও কর।”

যখন তিনি আল্লাহর নিকট এ আরয পেশ করলেন তখন তাদের মধ্যে কিছুটা অসুবিধা বোধের সৃষ্টি হল এবং তারা বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, এ শহরের মধ্যে প্রার্থনা কবুল হয়ে থাকে। তারপর তিনি নাম ধরে কয়েক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আরজি পেশ করলেনঃ

اللهم عليك بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووالد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابى معيظ

‘হে আল্লাহ আবূ জাহেলকে, উতবাহহ বিন রাবী’আহকে, শায়বাহ বিন রাবী’আহকে অলীদ বিন উতবাহহকে, উমাইয়া বিন খালাফ এবং উক্কবা বিন মু’আইত্ব কে পাকড়াও কর।’

রাসূলুল্লাহ সপ্তম জনের নাম বলেছিলেন কিন্তু বর্ণনাকারীর তা স্মরণ নেই। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, ‘সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার জীবন! এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদের নামে আরজি পেশ করেছিলেন বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়োর মধ্যে পতিত অবস্থায় আমি তাদের সকলকেই দেখেছি।[10]

উমাইয়া বিন খালাফের এ রকম এক স্বভাব হয়ে গিয়েছিল যে, যখনই সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখত তখনই তাঁকে ভর্ৎসনা করত এবং অভিশাপ দিত। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারীমা অবতীর্ণ হয় :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

‘প্রত্যেক অভিশাপকারী, ভর্ৎসনাকারী এবং অন্যায়কারীর জন্যই রয়েছে ধ্বংস (আল-হুমাযাহ ১০৪ : ১)

ইবনে হিশাম বলেন যে, ‘হুমাযাহা’ ঐ ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে অশ্লীল বা অশালীন কথাবার্তা বলে ও চক্ষু বাঁকা টেড়া করে ইশারা ইঙ্গিত করে এবং ‘লুমাযাহ’ ঐ ব্যক্তি যে অগোচরে লোকের নিন্দা বা বদনাম করে ও তাদের কষ্ট দেয়।[11]

উমাইয়ার ভাই উবাই ইবনে খালফ ‘উক্কবা বিন আবী মু’আইতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এক দফা উক্কবা নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট বসে কিছু শুনল। উবাই এ কথা জানতে পেরে তাকে খুব ধমক দিল, তার নিন্দা করল। তার নিকট অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে কৈফিয়ত তলব করল এবং বলল যে, তুমি গিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে এস। শেষ পর্যন্ত উক্কবা তাই করল। উবাই বিন খালফ নিজেই একবার মরা পচা হাড় নিয়ে তা চূর্ণ করে এবং জোরে ফূঁ দিয়ে তার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দিকে উড়িয়ে দেয়।[12]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নির্যাতনকারী দলের মধ্যে যারা ছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে আখনাস বিন শারীক সাক্কাফী। আল কুরআনে তার ৯টি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তার মন মানসিকতা ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

“তুমি তার অনুসরণ কর না, যে বেশি বেশি কসম খায় আর যে (বার বার মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে মানুষের কাছে) লাঞ্ছিত। - যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, - যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, - কঠোর স্বভাব, তার উপরে আবার কুখ্যাত।” (আল-ক্বালাম ৬৮ : ১০-১৩)

আবূ জাহল কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে কুরআন শ্রবণ করত। কিন্তু তার সে শ্রবণ ছিল নেহাৎই একটি মামুলী ব্যাপার। তার এ শ্রবণের মূলে আন্তরিক বিশ্বাস, আদব কিংবা আনুগত্যের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেটাকে কিছুটা যেন তার উদ্ভট খেয়াল বলা যেতে পারে। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অশ্লীল কিংবা কর্কশ কথাবার্তার মাধ্যমে কষ্ট দিত এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করত। অধিকন্তু, অন্যায় অত্যাচারের ক্ষেত্রে সফলতা হওয়াটাকে গর্বের ব্যাপার মনে করে গর্ব করতে করতে পথ চলত। মনে হতো সে যেন মহা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ সম্পাদন করেছে। কুরআন মাজীদের এ আয়াত তার স্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিল।[13]

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ

“কিন্তু না, সে বিশ্বাসও করেনি, সলাতও আদায় করেনি।” (আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫ : ৩১)

সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রথমদিকে যখন থেকে সালাত পড়তে দেখল তখন থেকে সালাত হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এক দফা নাবী কারীম (ﷺ) মাকামে ইবরাহীমের নিকট সালাত পড়ছিলেন এমন সময় সে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই সে বলল, মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে সালাত পড়া থেকে বিরত থাকতে বলিনি? সঙ্গে সঙ্গে সে নাবী কারীম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ধমকও দিল। নাবী কারীম (ﷺ)-ও ধমকের সুরে তাঁর এ কথার কঠোর প্রতিবাদ করলেন। প্রত্যুত্তরে সে বলল, “হে মুহাম্মাদ। আমাকে কেন ধমকাচ্ছ? আল্লাহর শপথ দেখ এ উপত্যকায় (মক্কায়) আমার বৈঠক সব চেয়ে বড়’। তার উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা’আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[14]

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ

“কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক।” (আল-আলাক্ব ৯৬ : ১৭)

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জামার বুকের অংশ ধরে জোরে হেঁচকা একটান দিলেন এবং এ আয়াতে কারীমা পাঠ করলেন:

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ

"দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ, -তারপর তোমার জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।" (আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫ : ৩৪-৩৫)

এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর সেই শত্রু বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ। আল্লাহর শপথ, তুমি ও তোমার প্রতিপালক আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি মক্কার পর্বতের মধ্যে বিচরণকারীদের মধ্যে সব চেয়ে মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি।[15]

তার এ অসার এবং উৎকট অহমিকা প্রকাশের পরও আবূ জাহাল সেসব থেকে নিবৃত্ত হল না। বরং তার অনাচার ও অন্যায় আচরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলল। যেমনটি সহীহুল মুসলিমে আবূ হুরাইরাহহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এক দফা আবূ জাহল কুরাইশ প্রধানদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের সম্মুখে মুহাম্মাদ (ﷺ) কি স্বীয় মুখমণ্ডলকে ধূলায় লাগিয়ে রাখে? প্রত্যুত্তরে বলা হল, হ্যাঁ"।

এরপর সে আস্ফালন করে বলল, 'লাত ও উযযার কসম, যদি আমি তাকে পুনরায় সেই অবস্থায় (সালাতরত) দেখি তাহলে গ্রীবা পদতলে পিষ্ঠ করে ফেলব এবং মুখমণ্ডল মাটির সঙ্গে আচ্ছা করে ঘর্ষণ দিয়ে মজা দেখিয়ে দিব'।

কিছু দিন পর ঘটনাক্রমে একদিন সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাত পড়তে দেখে ফেলে এবং কুরাইশ প্রধানদের নিকট স্বঘোষিত সংকল্প কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু আকস্মিকভাবে পরিলক্ষিত হল যে, অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সে পশ্চাদপসরণ শুরু করেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দু'হাত নড়াচড়া করে কী যেন এড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে আবূল হাকাম! তোমার কী এমন হল যে, তুমি অমন ধারা ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ে পড়লে? সে উত্তর করল, 'আমার এবং তার মধ্যে আগুনের এক গর্ত রয়েছে, ভয়াবহ বিভীষিকাময় ও ভীতপ্রদ শিকল রয়েছে'।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'সে যদি আমার নিকট যেত তবে ফেরেশতাগণ তার এক একটা অঙ্গ উঠিয়ে নিয়ে যেতেন।[16]

উপর্যুক্ত বর্ণনা হচ্ছে, মুশরিকগণ (যারা ধারণা করতো তারা আল্লাহর বান্দা এবং তার হারামের অধিবাসী) মুসলমান এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর যেভাবে অবর্ণনীয় অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল তার সংক্ষিপ্ত চিত্র।

এ রকম ভয়াবহ সংকটময় অবস্থায় এমন যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী ছিল যার মাধ্যমে মুসলমানগণ মুশরিকদের এমন বর্বোরোচিত অত্যাচার হতে রেহাই পেতে পারে। অতএব তিনি (ﷺ) দুটি হিকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাতে করে সহজ পন্থায় দাওয়াতী কাজ চালানো যায় এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। সিদ্ধান্ত দুটি হলো:

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম মুখযুমীর বাড়িকে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে মনোনিত করলেন।

২. নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে হাবশায় হিযরত করার আদেশ করলেন।

আরকামের বাড়িতে

আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম মাখযূমীর বাড়িটি ছিল সাফা পর্বতের উপর অত্যাচারীদের দৃষ্টির আড়ালে এবং তাদের সম্মেলন স্থান হতে অন্য জায়গায় অবস্থিত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বাড়িকেই মুসলমানদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়ার উপযুক্ত স্থান হিসেবে গ্রহণ করলেন। যাতে তিনি (ﷺ) সাহাবীদেরকে কুরআনের বাণী শোনানো, তাদের অন্তরকে কলূষমুক্তকরণ এবং তাদেরকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দিতে পারেন। আর মুসলমানগণ যেন নিরাপদে তাদের ইবাদাত বন্দেগী চালিয়ে যেতে পারেন; রাসূল (ﷺ) এর উপর যা অবতীর্ণ হয় তা তারা নিরাপদে গ্রহণ করতে পারেন এবং অত্যাচারী মুশরিকদের অজান্তে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তারা যাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হতে পারেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, তিনি যদি তাঁদের সঙ্গে একত্রিত হন তাহলে মুশরিকগণ তার আত্মশুদ্ধি এবং কিতাব ও হিকমত শেখার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন এবং এর ফলে মুসলিম ও মুশরিক উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকবে। ইবনু ইসহাক্ব বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ (রা.) তাঁদের নির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলোতে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করতেন। ঘটনাক্রমে এক দিবস কিছু সংখ্যক কাফের কুরাইশ তাদের এভাবে সালাত পড়তে দেখে ফেলার পর অশ্লীল ভাষায় তাদের গালিগালাজ করতে থাকেন এবং আক্রমণ করে বসেন।

মুসলিমগণও সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। প্রতিহত করতে গিয়ে সা'দ বিন ওয়াক্কাস এক ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার করেছিলেন যে তার শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ইসলামে এটাই ছিল সর্বপ্রথম রক্তপাত।[1]

এটা সর্বজনবিদিত বিষয় যে, এভাবে যদি বারংবার মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকত তাহলে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেতেন। অতএব, ইসলামের সর্বপ্রকার কাজকর্ম অত্যন্ত সঙ্গোপনে সম্পন্ন করার দাবী ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিত। এ প্রেক্ষিতে সাধারণ সাহাবীগণ (রা.)

তা'লীম, তাবলীগ, ইবাদত বন্দেগী সম্মেলন ও পারস্পরিক মত বিনিময় ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্ম সঙ্গোপনেই করতে থাকেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর এবাদত-বন্দেগী এবং প্রচারমূলক কাজকর্ম মুশরিকগণের সামনাসামনি প্রকাশ্যেই করতে থাকেন। তাকে কোন কিছুতেই তারা বাধা দেয়ার সাহস পেত না। তবুও মুসলিমগণের কল্যাণের কথা চিন্তা-ভাবনা করে সঙ্গোপণেই তিনি তাদের সঙ্গে একত্রিত হতেন।

আবিসিনিয়ার মুসলমানদের প্রথম হিজরত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন একদিকে তার সাহাবীদের উপর অসহনীয় নির্যাতন চলছে অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা লাভ ও আবু তালিবের সহায়তা লাভের কারণে তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জীবন যাপন করছেন অথচ তিনি তাদের উপর আপতিত জুলুমকে কিছু মাত্র রোধ করতে পারছেন না।

অন্যায় অত্যাচারের উল্লে-খিত বিভীষিকাময় ধারা-প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সূচিত হয় নবুওয়ত চতুর্থ বর্ষের মধ্যভাগে কিংবা শেষের দিক থেকে। জুলুম নির্যাতনের শুরুতে এর মাত্রা ছিল সামান্য। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকল জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে পেতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যভাগে তা চরমে পৌঁছল এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মক্কায় মুসলিমদের টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই এ বিভীষিকার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাধ্য হলেন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে। অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশার এ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল সূরাহ যুমার।

এতে হিজরতের জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয় যে, 'আল্লাহর জমিন অপ্রশস্ত নয়।'

(لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر:10]

''হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায় 'ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।' (আয-যুমার ৩৯ : ১০)

অত্যাচারের মাত্রা যখন ধৈর্য ও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, বিশেষ করে কুরআন মাজীদ পড়তে এবং নামায আদায় করতে না দেয়ার মানসিক যন্ত্রণা যখন চরমে পৌঁছল তখন তারা দেশান্তরের কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। তিনি বহু পূর্ব থেকেই আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশীর উদারতা এবং ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু, সেখানে কারো প্রতি যে কোন অন্যায়-অত্যাচার করা হয় না সে কথাও তিনি জানতেন। মুসলিম সেখানে গমন করলে নিরাপদে থাকার এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভ করবে। এ সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে তাঁদের জীবন এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।[1]

এ দিকে মুহাজিরগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বসবাস করতে থাকলেন।[2] পূর্বাহ্নেই বলা হয়েছে যে, এ দলটি রজব মাসে মক্কা থেকে হিজরত করেন। কিন্তু সেই বছরটির রমাযান মাসে কাবা শরীফে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়।

মুসলিমদের সঙ্গে কাফিরদের সিজদাহ ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

একই বছর রমাযান মাসে নাবী কারীম (ﷺ) হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে বের হন। কুরাইশগণের এক বিরাট জনতা সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ) সেখানে উপস্থিত হয়েই আকস্মিকভাবে সুরায়ে 'নাজাম' পাঠ করতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল লোকেরা ইতোপূর্বে কুরআন শ্রবণ করত না এবং কোথাও কুরআন পাঠ করা হলে তারা শোরগোল করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করত যাতে তা শ্রুতিগোচর না

হয়। কারণ, তাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল কুরআন শ্রবণ করলে তারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। কুরআনের ভাষায় ব্যাপারটি ছিল এরূপঃ

(لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ) [فصلت:26]

‘‘এ কুরআন শুনো না, আর তা পড়ার কালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।’ (ফুসসিলাত ৪১ : ২৬)

কিন্তু নাবী কারীম (ﷺ) যখন এ সূরাহটি পাঠ আরম্ভ করলেন তখন এর অশ্রুত পূর্ব সুললিত বানী, অবর্ণনীয় কমনীয়তা ও অপরূপ মিষ্টতা যখন তাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হল তখন তারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবাবিষ্ট এবং হতচকিত হয়ে পড়লেন। ইতোপূর্বে কুরআন পাঠের সময় তারা যেভাবে গন্ডগোল করত সে রকম গন্ডগোল করা তো দূরের কথা বরং আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে তারা তা শুনতে থাকল। তাদের অন্তরে ভিন্নমুখী কোন ভাবেরই উদ্রেক হল না। তারপর নাবী কারীম (ﷺ) যখন এ সূরাহর শেষের আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকলেন তখন তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হতে থাকল। যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ-সম্বলিত শেষের আয়াতটি পাঠ করলেন :

(فَاسْجُدُوْا لِلهِ وَاعْبُدُوْا[1])

‘‘তাই, আল্লাহর উদ্দেশে সিজদাহয় পতিত হও আর তাঁর বন্দেগী কর। [সাজদাহ] (আন-নাজম ৫৩ : ৬২)

অতঃপর রাসূল (ﷺ) সিজদা করলেন এবং সাথে উপস্থিত মুশরিকরাও সকলে সিজদা করল।

কিন্ত পরক্ষণেই যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থা থেকে তাঁরা স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, আল্লাহর কুরআনের অলৌকিকত্ব তাদের স্বকীয়তা বিনষ্ট করে দিয়েছে যার ফলে তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অথচ যাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহহ করেন তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁরা আত্মগ্লানির অনলে দগ্ধীভূত হতে থাকেন। তাঁদের এ শোচনীয় মানসিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে

থাকে যখন অনুপস্থিত অন্যান্য মুশরিকগণ এ আচরণের জন্য তাঁদের লজ্জা দিতে ও নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকেন।

এ ত্রিশংকু অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা এবং তাঁদের সমালোচনা মুখর মুশরিকগণের দৃষ্টির মোড় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে অপবাদ দিয়ে একটি অপপ্রচার শুরু করলেন। তাঁরা একটি নির্জলা মিথ্যাকে নানা রূপ ও রং দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচার শুরু করলেন যে, তিনি তাঁদের প্রতিমাসমূহের ইজ্জত ও সম্মানের প্রসঙ্গ উল্লে-খ করে বলেছেনঃ

(تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجٰى)

(এরা সব উচ্চ পর্যায়ের দেবদেবী, তাদের শাফা'আতের আশা করা যায়।)

অথচ তা ছিল মিথ্যা। নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে সিজদাহ করে তাদের ধারণায় তারা যে ভুলটি করেছিলেন তার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই তাঁদের এ অপপ্রচার। নাবী (ﷺ) সম্পর্কে সর্বদাই যাঁরা মিথ্যা কুৎসা রটনা এবং নানা অপপ্রচারে লিপ্ত থাকতেন এ ক্ষেত্রেও যে তাঁরা তা করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, যে কোন সূত্রে যে কোন মুহূর্তে নাবী (ﷺ)-এর নির্মল চরিত্রে কলংক লেপন করতে তারা কখনই কুণ্ঠা বোধ করবেন না।[2]

যা হোক, কুরাইশ মুশরিকগণের সিজদাহ করার খবর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমগণের নিকটও গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু সেই সংবাদের রকম-সকম ছিল ভিন্ন। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যেমন নানা রং-চংয়ের সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে যায় এ ক্ষেত্রেও হল ঠিক তাই। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী মুহাজিরগণ খবর পেলেন যে, মক্কার কুরাইশগণ মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। এ কথা শোনা মাত্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেকেরই মনে ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হল এবং পরবর্তী শওয়াল মাসেই তাঁদের একটি দল মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু মক্কা থেকে তাঁরা এক দিনের পথের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন তখন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ব্যাপারটি যেভাবে তাঁদের নিকট চিত্রিত করা হয়েছে প্রকৃত ঘটনাটি তা নয়। তাই দলের কিছু সংখ্যক লোক আবিসিনিয়া অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং কিছু সংখ্যক সঙ্গোপনে কিংবা কুরাইশগণের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

এর পর মক্কা প্রত্যাগত মুহাজিরগণের উপর বিশেষভাবে এবং অন্যান্য মুসলিমগণের উপর সাধারণভাবে কুরাইশগণের অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। শুধু মুহাজিরগণই নন, এমন কি তাঁদের পরিবার পরিজনও এ নির্যাতনের হাত থেকে নিস্তার পেল না। এর কারণ হচ্ছে ইতোপূর্বে কুরাইশগণ যখন অবগত হয়েছিলেন যে, আবিসিনিয়ায় মুহাজিরগণের সাথে নাজ্জাশী অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আচরণ করছেন এবং নানাভাবে তাঁদের প্রতি মদদ জুগিয়ে চলেছেন। মুসলিমদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পরামর্শ দিলেন পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় হিজরত ছিল খুবই কঠিন। কেননা প্রথম হিজরতের সময় কুরাইশগণ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর মতো এখন তাঁরা সচেতন এবং যে কোন মূল্যে এ ধরণের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের ব্যাপারে কুরাইশগণের তুলনায় মুসলমানদের সচেতনতা ও ঐকান্তিকতার মাত্রা ছিল অনেক গুণে বেশী। উপরন্তু নিরীহ, নির্দোষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতি ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। যার ফলে কুরাইশগণের তরফ থেকে কোন অনিষ্ট কিংবা প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই তাঁরা সহীহুল সালামতে গিয়ে পৌঁছলেন হাবশের সম্রাটের দরবারে।

দ্বিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ জন কিংবা ৮৩ জন পুরুষ হিজরত করেছিলেন (এর মধ্যে আম্মার (রাঃ)-এর হিজরত সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে) এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা ঐ দলে ছিলেন।[1] আল্লামা সুলাইমান মুনসুরপুরী দৃঢ়ভাবে মহিলা মুহাজিরগণের সংখ্যা ১৮ বলেছেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে কুরাইশ ষড়যন্ত্র

জান-মাল ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমগণ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে সেখানে শান্তি স্বস্তি লাভ করায় কুরাইশগণের দারুণ গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে 'আমর বিন আস এবং গভীর জ্ঞানগরিমার অধিকারী আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে (যিনি

তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি) নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করার জন্য দূত মনোনীত করা হয়। তারপর সম্রাট নাজ্জাশী এবং বেতরীকগণের (খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজকদের পুরোহিত) জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ দূত দ্বয়কে দৌত্যকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আবিসিনিয়ায় পৌঁছে তারা সর্বপ্রথম বেতরীক পুরোহিতগণের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর তাঁদের নিকট সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন যার ভিত্তিতে তারা মুসলিমগণকে হাবশ হতে বাহির করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদির তেমন কোন ভিত্তিই ছিল না, তবুও উপঢৌকনের সুবাদে বেতরীকগণ (পাদ্রীগণ) এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, মুসলিমগণকে হাবশ হতে বহিস্কার করার ব্যাপারে সম্রাট নাজ্জাশীকে তাঁরা পরামর্শ দিবেন। বেতরীকগণের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভের আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতেরা সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে আরজি পেশ করেন। তাঁদের আরজির বিবরণ হচ্ছে এরূপঃ

‘‘হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অর্বাচীন যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ণ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেন নি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এরা নাকি একটা নতুন ধর্মমতও আবিস্কার করেছেন। এর চাইতে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে পারে বলুন। আমাদের গোত্রীয় প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ সকল অর্বাচিনের পিতামাতা, মুরুববী ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের দু’জনকে দূত হিসেবে দরবারে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এদের ভালমন্দ সম্পর্কে ভালভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রয়েছেন।’

কুরাইশ দূতেরা সম্রাটের নিকট যখন এ আরজি পেশ করলেন তখন পুরোহিতগণ বললেন, ‘মহামান্য সম্রাট! এরা উভয়েই খুব যুক্তিসংগত এবং সঠিক কথা বলেছেন। আপনি এদের হাতে ঐ দেশত্যাগী যুবকদের সমর্পণ করে দিন। আমাদের মনে হয় এটাই ভাল যে, তাঁরা তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ নিয়ে যান।

কুরাইশ দূতগণের কথাবার্তা শ্রবণের পর সম্রাট নাজ্জাশী গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'আলোচ্য বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বিষয়টির খুঁটি নাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের আহবান জানালেন। মুসলিমগণও আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করে বিষয়ের খুঁটি-নাটিসহ সকল কথা সম্রাট সমীপে পেশ করার জন্য উত্তম মানসিক প্রস্তুতি সহকারে সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমন কি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে সে ধর্মটি কোন্ ধর্ম?'

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব অকপটে বলে চললেন, 'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রাববুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহবান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্ল-ীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক

করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু, নামায, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবে জা'ফার অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। তারপর আবারও বললেন, 'এই পয়গম্বরকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর (মহিমান্বিত প্রভূর) পয়গম্বর বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর আনীত দ্বীনে এলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের পয়রবী করে চলছি। সুতরাং আমরা এক এবং অদ্বিতীয় প্রভূ আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না এবং বিশ্ব জাহানে কোথাও তাঁর কোন শরীক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। পয়গম্বর যে সব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধ জেনে তার সদ্ব্যবহার করছি। এ কারণে আরব সমাজের বিভিন্নগোত্র ও সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা চান এ সত্য, সুন্দর, শাশ্বত ও সুনির্মল দ্বীপে থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করায় তারা আমাদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালিয়েছেন। এক আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত করানোর জন্য আমাদের উপর আঘাতের উপর আঘাত হেনেছে, নিদাঘের উত্তপ্ত কংকর ও বালুকারাশির উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়েছে, পায়ে দড়ি বেঁধে পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি এইভাবে যখন তাঁরা আমাদের উপর অবিরামভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকলেন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহর জমিনকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললেন এবং এমন কি আমাদের ও আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ও প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকলেন তখন আপনার মহানুভবতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার কথা অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের নির্দেশ প্রদান করলেন দেশত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে। হে সম্রাট! আমরা আপনার সহৃদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষন্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজ্জাশী বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফর বললেন, 'জী হ্যাঁ''।

নাজ্জাশী বললেন, 'তা হলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।

জা'ফর (রাঃ) আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় ভাবগদগদ চিত্তে সুরায়ে মরিয়মের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন: (كهيعص)

নাজ্জাশী এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাঁড়ি ভিজে গেল। জাফরের তিলাওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশী 'আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোন কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট থেকে এ নির্দেশ লাভের পর তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁর দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। আদম সন্তানদের গোমরাহ করার ব্যাপারে আযাযীল শয়তান যেমন একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে এরাও তেমনি একটি কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় অন্য কৌশল প্রয়োগের ফন্দি ফিকির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে 'আমর বিন আস আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল এদের সম্পর্কে এমন প্রসঙ্গ নিয়ে আসব যা এদের জীবিত থাকার মূল কর্তন করে ফেলবে। আর না হয়, এদের ব্যাপারে এমন মন্ত্রের অবতারণা করব যাতে এদের মূল কর্তিত হয়ে এবং সজীবতা ও সতেজতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহ বললেন, 'না-না, এমনটি করা সমীচীন হবে না। কারণ, এরা যদিও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তবুও এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা আমাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোক এবং আত্মীয়-স্বজনও বটে।

কিন্তু 'আমর বিন আস একথার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে স্বীয় মতের উপর অটল রইলেন। পরের দিন পুনরায় নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে, 'আমর বিন আস বললেন, 'হে সম্রাট! এরা ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলেন যা কেউই কোন দিন বলেনি। আপনি ওদের কাছ থেকে এটা জেনে নিয়ে এর প্রতিকার করুন।'

একথা শোনার পর সম্রাট নাজ্জাশী পুনরায় মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে এসে উপস্থিত হলে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলিমগণ কী ধারণা পোষণ করেন তা তিনি জানতে চাইলেন। সম্রাটের মুখ থেকে এ কথা শুনে মুসলিমগণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হলেন। কারণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খ্রীষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে তত্ত্বগত মত পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টানগণ বলেন মসীহ (জেসাস) আল্লাহর পুত্র। কিন্তু পার্থক্য হেতু মুসলিমগণ বলেন ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তত্ত্বগত এ পার্থক্য হেতু মুসলিমদের সংশয় এ কারণে যে, এ কথা বললে সম্রাট নাজ্জাশী যদি বা বিরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহলে মুসলিমদের জন্য তা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেটা ছিল নেহাৎই একটা ক্ষণিকের ব্যাপার। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আস্থাশীল দৃঢ়চিত্ত মুসলিমগণ পরক্ষণেই মনস্থির করে ফেললেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন সেটাই হবে তাঁদের মূলমন্ত্র এবং সেটাই হবে তাঁদের বক্তব্য তাতে ভাগ্যে যা ঘটবে ঘটুক।

নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে জা'ফর বললেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর মা মরিয়ম ছিলেন সতী-সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কুমারী মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়।'

এ কথা শ্রবণের পর নাজ্জাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা (আঃ)-এর চাইতে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।' এ প্রেক্ষিতে পুরোহিতগণও 'হুঁ' 'হুঁ' বলে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

নাজ্জাশী বললেন, 'হ্যাঁ', এখন তো তোমরা হাঁ হুঁ বলে সমর্থন জ্ঞাপন করবেই।'

তারপর নাজ্জাশী মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা নির্ভয়ে, শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আমার রাজ্যে বসবাস কর। যে কেউ তোমাদের উপর অন্যায় করবে তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।'

এর পর তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এই কুরাইশ দূতদের আনীত উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও। উপঢৌকনে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেন তখন আমার নিকট থেকে উপঢৌকন কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। সে ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে

কাজ করতে গিয়ে কিভাবে আমি উৎকোচ গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে অন্য লোকদের কথা গ্রহণ করেন নি, আমি কোন লোকের কোন কথা গ্রহণ করতে পারি না।'

এ ঘটনার বর্ণনাকারিণী উম্মু সালামাহ বলেছেন, এরপর প্রত্যাখ্যাত উপঢৌকন সহ কুরাইশ দূতগণ চরম বেইজ্জতির সঙ্গে নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমরা তাঁর ছত্রছায়ায় সম্মানের সঙ্গে তার রাজ্যে অবস্থান করতে থাকলাম।

ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লে-খ রয়েছে। কোন কোন চরিতকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির ঘটনাটি সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের পর। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলঅ হয়েছে 'আমর বিন আস দু'দফা নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতি সূত্রে সম্রাট নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথনের উল্লে-খ করা হয়েছে তার সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার হুবহু মিল রয়েছে। অধিকন্তু ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে এবং ঐ একই প্রশ্নোত্তরের কথা উল্লে-খিত হয়েছে। কাজেই, উপর্যুক্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের প্রেক্ষাপটে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিমদের ফেরত আনার জন্য 'আমর বিন আস মাত্র একবার নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছিলেন এবং ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আবাসিনিয়ায় হিজরতের পর পরই।

অত্যাচারে কঠোরতা অবলম্বন ও নাবী কারীম (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

যা হোক মুশরিকগণের চাতুর্য শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হল অকৃতকার্যতায় এবং তাঁরা এটাও উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা কিংবা তাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে স্বদেশভূমির বাইরে সাফল্য লাভের কোনই সম্ভবানা নেই। কাজেই তাদের প্রচার-সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ করতে হলে কিংবা শায়েস্তা করতে হলে স্বদেশের সীমানার মধ্যেই তা করতে হবে। তাছাড়া ষ্ট্রাটেজী বা কর্মকৌশল হিসেবে তাঁরা এটাও স্থির করলেন যে, এদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হলে হয় বল প্রয়োগ করে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রচারাভিযান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে আর না হয় তাঁর অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম মক্কায় অবস্থান করছিলেন যারা ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও মযাদার পাত্র অথবা কারো আশ্রিত। এসত্ত্বেও তারা উদ্যত মুশরিকদের থেকে গোপনে ইবাদত বন্দেগী করতেন। তবুও তারা মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রকাশ্যভাবে মুশরিকদের সম্মুখে সালাত ও অন্যান্য ইবাদত করতেন এবং সংগোপনে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন এতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারতো না। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি (ﷺ) এমনভাবে প্রচার কাজ আরম্ভ করলেন যে তাঁকে আর কোন শক্তিই আটকিয়ে রাখতে সক্ষম হলো না। দাওয়াতে রেসালাতের কাজ যখন এরকম এক পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পিয়ারা হাবীবকে নির্দেশ দেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

'কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আল-হিজর ১৫ : ৯৪)

উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর মুশরিকদের কাজ কেবল এটুকুই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মর্যাদা ও প্রভাবের কারণে এ ব্যতিত আর কিছুই করার ছিল না। অধিকন্তু মুহাম্মাদ (আঃ)-এর অভিভাবক ছিলেন আবূ ত্বালিব যিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মুশরিকগণের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তার কারণে মুহাম্মাদের উপর যে কোন কিছু করতে ভীত ছিল। তাছাড়া বনু হাশিমের পক্ষ থেকেও তাদের আশংকা ছিল। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখতে পারছিল না। যখনই মুশরিকরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের মনস্থ করতো তারা দেখতো যে, তাদের এ কর্মপন্থা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দাওয়াতের কাছে খড়কুটোর মতোই তুচ্ছ ও অকার্যকর।

অত্যাচারে অত্যাচারে কিভাবে তারা মুসলিমদের জর্জরিত এবং অতিষ্ট করে তুলেছিল তার অসংখ্য প্রমাণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পৃষ্ঠায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখিত হল :

একদা আবূ লাহাবের পুত্র উতায়বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ; আমি

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) ও (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى)
এ আয়াত দুটোকে অস্বীকার করছি। এর পরই সে নাবী কারীম (ﷺ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। সে জামা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলল এবং তাঁর পাক মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রহমতে থুথু সে পর্যন্ত গিয়ে পৌছে নাই। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

"হে আল্লাহ! তোমার কুকুরগুলোর মধ্য থেকে এর জন্য একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও।"
নাবী কারীম (ﷺ)-এর দু'আ আল্লাহর সমীপে গৃহীত হল এবং এভাবে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।
কিছু সংখ্যক কুরাইশ লোকজনের সঙ্গে একদফা উতায়বা বিদেশ গেল। যখন তারা শাম রাজ্যের জারকা নামক স্থানে শিবিরস্থাপন করল তখন রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে তাদের চারপাশে ঘোরাফিরা করতে থাকল। ওকে দেখেই ওতায়বা ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, 'হায়! হায়!, আমার ধ্বংস। আল্লাহর শপথ, সে আমাকে খেয়ে ফেলবে। এ মর্মেই মুহাম্মাদ (ﷺ) আমার ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন। দেখ আমি শাম রাজ্যে অবস্থান করছি অথচ তিনি মক্কা থেকেই আমাকে হত্যা করছেন'।
উতায়বার এ কথা শ্রবণের পর তার সঙ্গী সাথীরা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাকে তাদের মধ্যস্থানে শুইয়ে দিল যাতে বাঘ এসে সহজে তার নাগাল না পায়। কিন্তু গভীর রাতে সেখানে বাঘ এসে সকলকে পাশ কাটিয়ে সোজা উতয়বার নিকটে যায় এবং তার মাথাটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়।[1]
এক দফা উক্বা বিন আবী মু'আইত্ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সিজদারত ছিলেন তখন তার ঘাড় এত জোরে পদতলে পিষ্ঠ করল যে মনে হল তার অক্ষিগোলক দুটো তখনই অক্ষিপট থেকে বেরিয়ে আসবে।[2]
অন্যান্য কুরাইশ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কেও সত্যিকারভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাদের অন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস হতে ইবনে ইসহাক্ব তাঁর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এক দফা

কুরাইশ মুশরিকগণ কাবাহ’র হাতীমে সম্মিলিতভাবে অবস্থান করছিল। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা বলল, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছি তার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতই এর ব্যাপারে আমরা বড়ই ধৈর্য ধারণ করেছি।

এ ধারায় যখন তাদের কথোপকথন চলছিল তখন কিছুটা যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগমনের পর সর্ব প্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা’বাহ ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এ সব করতে গিয়ে তাকে মুশরিকগণের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হল। এ অবস্থায় কিছু বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে তারা তার প্রতি কটাক্ষ করায় নাবী (ﷺ)-এর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল তার বহিঃপ্রকাশ তার চেহারা মুবারকে আমি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলাম। এর পর দ্বিতীয় দফায় তিনি যখন সেখানে গেলেন তখনো মুশরিকগণ অনুরূপভাবে তাকে বিদ্রপাত্মক কথাবার্তা বলে ভর্ৎসনা করল। আমি এবারও তার মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তারপর তৃতীয় দফায় তিনি সেখানে গেলে এবারও তারা পূর্বের মতো বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলল। এবার নাবী কারীম (ﷺ) সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন,

أتسمعون يا معشر قريش اما والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح

‘হে কুরাইশগণ! শুনছ? সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন, আমি তোমাদের নিকট কুরবাণীর পশু নিয়ে এসেছি।’

তাদের প্রতি নাবী (ﷺ)-এর এ সম্বোধন এবং কথাবার্তা তাদেরকে এতই প্রভাবিত করে ফেলল (তাদের উপর মূর্ছা পাওয়ার মতো অবস্থা এসে পড়ল) এবং এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে গেল যে তাদের মনে হতে লাগল যেন প্রত্যেকের মাথার উপর চড়ুই বসে রয়েছে। এমনকি ঐ দলের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর সব চেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল সেও যেন খুব ভাল হয়ে গেল এবং পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা শুরু করল। অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলতে থাকল, ‘আবূল কাশেম! প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কসম! আপনি কখনই জ্ঞানহীন ছিলেন না।’

দ্বিতীয় দিনেও তারা সেখানে একত্রিত হয়ে তার সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় রত ছিল এমন সময় তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এভাবে দেখে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। আমি লক্ষ্য করলাম তাদের মধ্য থেকে একজন তার গলার চাদর ধরে নিল এবং বল প্রয়োগ শুরু করে দিল। আবূ বকর (রা.) তাকে বাচানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি

ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : 'তোমরা লোকটিকে কি এ জন্য হত্যা করছে যে, তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ আমার প্রভু?'

এর পর তারা নাবী (ﷺ)-কে ছেড়ে দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেছেন যে, এটাই ছিল সব চেয়ে কঠিন অত্যাচার ও উৎপীড়ন যা আমি কুরাইশগণকে করতে দেখেছি।[3] (সার সংক্ষেপ শেষ হল)

সহীহুল বুখারীতে উরওয়া বিন জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত এক বিবরণ থেকে জানা যায়,)-এর ﷺতিনি বলেছেন যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন আসকে মুশরিকগণ নাবী (উপর সব চেয়ে কঠিন যে নিপীড়ন চালিয়েছিল, তা আমার সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা) কাবাহ গৃহের হাতীমে ﷺকরার জন্য প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, একদা নাবী (সালাত পড়ছিলেন এমন সময় উক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব সেখানে আগমন করলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েই নিজ কাপড় দ্বারা তাঁর গ্রীবা ধারণ করে অত্যন্ত জোরে চপেটাঘাত করলেন এবং গলা টিপে ধরলেন। এমন সময় আবূ বকর সেখানে উপস্থিত হলেন এবং উক্কবার দু'কাঁধ ধরে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : তোমরা লোকটিকে এ জন্যই হত্যা করছ যে, তিনি বলেছেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ।[4] আসমার বর্ণনায় অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বকরের নিকট যখন এ আওয়াজ পৌছল যে, 'আপন বন্ধুকে বাঁচাও' তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে বের হলেন। তার মাথার উপর চারটি ঝুঁটি ছিল। যাবার সময় আবূ বকর বলতে বলতে গেলেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : তোমরা লোকটিকে শুধু এ কারণে হত্যা করছ যে, তিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ।

এরপর মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবূ বকরের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি যখন ফেরৎ আসলেন তখন তার অবস্থা ছিল এরূপ যে, আমরা তাঁর চুলের মধ্য থেকে যে ঝুঁটিটাই ধরছিলাম সেটাই আমাদের টানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল

হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কার বিস্তৃত অঞ্চল অন্যায় ও অত্যাচারের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সেই মেঘ মালার মধ্য থেকে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুত চমকিত হওয়ায় মজলুমদের পথ আলোকিত হল, হামযাহ মুসলিম হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত প্রাপ্তি ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষভাগ। সম্ভবতঃ তিনি যুল হিজ্জাহ মাসে মুসলিম হয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা যাঁর উপর রহম করেন তাঁর পক্ষেই ইসলামের অমিয় ধারা থেকে এক অাঁজলা পান করা সম্ভব হয়। যদিও হামযাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিও আল্লাহর তা'আলার খাস রহমতেরই ফলশ্রুতি তবুও তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লে-খ না করে পারা যায় না। ঘটনাটি হচ্ছে এরূপ, এক দিবসে আবূ জাহল সাফা পর্বতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নাবী কারীম (ﷺ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাবী (ﷺ)-কে দেখে অনেক কটু কাটব্য করল এবং অপমানসূচক কথাবার্তা বললে নাবী কারীম (ﷺ) তার কথাবার্তার কোন উত্তর দিলেন না। আবূ জাহল একটি পাথর তুলে নিয়ে নাবীজী (ﷺ)-এর মাথায় আঘাত করল। এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকল। তারপর সে ক্বাবা'হ গৃহের নিকটে কুরাইশগণের বৈঠকে গিয়ে যোগদান করল।

আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ানের এক দাসী নিজগৃহ থেকে সাফা পর্বতের উপর সংঘটিত ঘটনাটি আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ করছিল। হামযাহ (রাঃ) মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই (তখনো তাঁর হাতে তীর ধনুক ছিল এমতাবস্থায়ঃ) সে তাঁকে আবূ জাহলের অন্যায় অত্যাচার এবং নাবী (ﷺ)-এর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারটি বর্ণনা করে শোনাল। ঘটনা শ্রবণ

করা মাত্র তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কুরাইশগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মহাবীর এবং মহাবলশালী এক যুবক। এ মুহূর্তে বিলম্ব না করে তিনি এ সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছুটে চললেন যে, যেখানেই আবূ জাহলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হবে সেখানেই তিনি তার ভূত ছাড়াবেন। তিনি তার খোঁজ করতে করতে গিয়ে তাকে পেলেন মসজিদুল হারামে। সেখানে তিনি তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, ‘ও হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ূ নিঃসরণকারী! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তুমি গালি দিয়েছ এবং পাথর দিয়ে আঘাত করেছ। অথচ আমি তার দ্বীনেই আছি।

এরপর তিনি কামানের দ্বারা তার মাথার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন যাতে সে আহত হয়ে গেল। এর ফলে আবূ জাহলের বনু মখযুম ও হামযাহ (রাঃ)-এর বনু হাশিম গোত্রদ্বয় একে অপরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আবূ জাহল এভাবে সকলকে নিরস্ত করল যে, আবূ উমারাকে যেতে দাও। আমি প্রকৃতই তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালমন্দ এবং আঘাত দিয়েছি।[1]

প্রাথমিক পর্যায়ে হামযাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল কিছুটা যেন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আবেগের উৎস থেকে উৎসারিত। মুশরিকগণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কষ্ট দিত। এটা বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কাজেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো তার দুঃখ কষ্টের কিছু লাঘব হতে পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।[2] পরে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অন্তরে ইসলাম প্রীতি জোরদার করে দেয়ায় তিনি দ্বীনের রশি মজবুত করে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানদের শক্তি এবং সম্মান দুই-ই বৃদ্ধি পেল।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

অন্যায় অত্যাচারের বিস্তৃতি পরিমন্ডলে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার বুক চিরে আরও একটি জ্যোতিষ্মান বিদ্যুতের চমকে আরব গগণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ উমার বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষে[1] হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর। নাবী কারীম (ﷺ) উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারাণী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলতেন :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِيْ جَهْلٍ بن هشام

'হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।'

(আল্লাহ এ প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং উমার মুসলিম হয়ে গেলেন)। এ দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট উমার (রাঃ) অধিক প্রিয় ছিলেন।[2]

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর অন্তরে ইসলাম ধীরে ধীরে স্থান লাভ করতে থাকে। ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার সংক্ষেপ তুলে ধরার পূর্বে তাঁর মেজাজ এবং আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা সঙ্গত বলে মনে করি। উমার (রাঃ) তাঁর উগ্র মেজায, রূঢ় প্রকৃতি এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমগণকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁর হাতে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাষ যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো যে, ভাবাবেগের দু'বিপরীতমুখী শক্তি যেন তাঁর অন্তর রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে।

একদিকে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। অধিকন্তু কোন কোন সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মতো তাঁর মনে তত্ত্ব-চিন্তার উদ্রেকও হতো। তিনি আপন খেয়ালে চিন্তা করতে থাকতেন নানা বিষয়, নানা কথা। কোন কোন সময় এটাও তাঁর মনে হতো যে, ইসলাম যে পথের সন্ধান দিচ্ছে, যে পথের চলার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে সম্ভবতঃ সেটাই উত্তম ও পবিত্রতম

পথ। এ জন্য প্রায়শঃই তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতেন, কোন কোন সময় বিচলিত বোধ করতেন, কখনো বা নিরুৎসাহিত বোধ করতেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার সংক্ষেপ হচ্ছে এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন এবং ক্বাবা'হ গৃহেরপর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) সেই সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরাহ 'আলহাক্কা'' তিলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং এর ঝংকার, বাক্য বিন্যাস ও সুর-মাধূর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন। উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَا تُؤْمِنُوْنَ) [الحاقة:40، 41]

''যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল ('আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪০-৪১)

উমার (রাঃ) বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন একজন মন্ত্রতন্ত্রধারী গনৎকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ (ﷺ) তিলাওয়াত করলেনঃ

(وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ تَنزِيْلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ) إلى آخر السورة [الحاقة:42، 43]

'' এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতে সূরাহর শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং উমার (রাঃ) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ) বলেছেন যে, 'সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।[4]

প্রকৃতপক্ষে, উমার (রাঃ)-এর অন্তর রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতানায় অজ্ঞতাপ্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদ্দল প্রস্তরের মতো তাঁর মন-মস্তিষ্ককে এতই প্রভাবিত করে রেখেছিল যে ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। কাজেই, বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা সংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী[5] কিংবা বনু যুহরা[6] কিংবা বনু মাখযুমের।] কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।'

লোকটি বলল, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ।

লোকটি বলল, 'উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।'

এ কথা শুনে উমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঘৃতাহুতি দেয়ার মতো ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাত্ত একটি সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা'র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব (রাঃ) যখন উমার (রাঃ)-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং উমারের বোন ফাত্বিমাহ সহীফা খানা

লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাববাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'

তাঁর বোন উত্তর করলেন, 'না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম। উমার (রাঃ) বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?

এ কথা শোনা মাত্র উমার রাগান্বিত হয়ে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জোর করে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উমার (রাঃ) তাঁর বোনের গন্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِيْ غَيْرِ دِيْنِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

''উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি।

জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। ৯. মূসার কাহিনী তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ১০. যখন সে আগুন দেখল (মাদ্ইয়ান থেকে মিসর যাওয়ার পথে), তখন সে তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি তাথেকে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলন্ত আগুন আনতে পারব কিংবা আগুনের নিকট পথের সন্ধান পাব। **১১.**

তারপর যখন যে আগুনের কাছে আসল, তাকে ডাক দেয়া হল, 'হে মূসা! ১২. বাস্তবিকই আমি তোমার প্রতিপালক, কাজেই তোমার জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছ। ১৩. আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, কাজেই তুমি মনোযোগ দিয়ে শুন যা তোমার প্রতি ওয়াহী করা হচ্ছে। ১৪. প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার 'ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত কায়িম কর'।' (ত্ব-হা ২০ : ১-১৪)

বললেন, 'এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সন্ধান বল।'

উমারের এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'উমার! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবুল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা পর্বতের নিকটস্থ গৃহে অবস্থান করছিলেন।'

খাব্বাব (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর উমার (রাঃ) তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ উমার দন্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে হামযাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?'

লোকজনেরা উত্তর দিলেন, 'উমার বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

হামযাহ বললেন, 'ঠিক আছে। উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি উমারের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

(أَمَا أَنْتَ مُنْتَهِيًا يَا عُمَرُ حَتَّى يَنْزِلَ اللهُ بِكَ مِنْ الْخَزِى وَالنِّكَالِ مَا نَزَلَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ؟)

‘‘উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?’
তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর সমীপে দু‘আ করলেন,

اللهم هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اللهم أَعِزِّ الْإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

‘‘হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ উমার বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।’ নাবী (ﷺ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর উমার (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।’
উমার (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থিত লোকজনেরা এত জোরে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন।[৪] আরব মুলুকে এটা সর্বজন বিদিত বিষয় ছিল যে, উমার বিন খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লে-খযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল। ইবনে ইসহাক্ব নিজ সূত্রের বরাতে উমারের বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন যে, ‘যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম যে, মক্কায়, কোন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সব চাইতে প্রভাবশালী শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে বললাম এ আবূ জাহলই হচ্ছে তাঁর সব চাইতে বড় শত্রু। ততক্ষণাৎ তার গৃহে গমন করে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বাহির হয়ে

এসে (খুশি আমদেদ, খুশ আমদেদ) বলে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল এবং বলল, 'কিভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?' প্রত্যুত্তরে কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি বললাম, 'তোমাকে আমি এ কথা বলতে এলাম যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দ্বীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছ সে সবেরও মন্দ করুন। ইমাম ইবনে জাওযী উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যেত তখনই লোক তার পিছু ধাওয়া করত এবং তাকে মারধর করত। সেও তাদের পাল্টা মারধর করত। এ জন্য যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন আমার মামা আসী বিন হাশিমের নিকটে গেলাম এবং তাঁকে আমার মুসলিম হয়ে যাওয়ার খবর জানালাম। আমার কথা শোনামাত্রই সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারপর কুরাইশের একজন বড় প্রধানের বাড়িতে গেলাম (সম্ভবতঃ আবূ জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এবং তাকেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করলাম কিন্তু সেও গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।[10]

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমার বলেন, যখন 'উমার (রাঃ) মুসলমান হলেন তখন তিনি বললেন কে এমন আছে যে কোন কথাকে খুব প্রচার কিংবা ঢোল শোহরত করতে পারে? লোকেরা বলল, জামীল বিন মা'মার জুমাহী। একথা শোনার পর তিনিস জামীল বিন মা'মার জুমাহীর নিকট গেলেন, আমি তার সাথেই ছিলাম। 'উমার তাকে বললেন যে, তিনি মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহর শপথ এ কথা শোনামাত্র অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে সে ঘোষণা করতে থাকল যে, খাত্তাবের পুত্র উমার বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে। উমার তাঁর পিছনেই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি এ বলে উত্তর দিলেন যে, 'এ মিথ্যা বলছে। আমি বেদ্বীন হই নি বরং মুসলিম হয়েছি।'

যাহোক, লোকজনেরা তাঁর উপর চড়াও হল এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে জনতা এবং অন্য পক্ষে উমার; মারপিট চলতে থাকল। এত সময় ধরে মারপিট চলতে থাকল যে, সেই অবস্থায় সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে পড়ল। উমার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। লোকজন তাঁকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে ছিল। উমার বললেন, 'যা খুশী করো। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি সংখ্যায় তিন শত হতাম তাহলে মক্কায় তোমরা অবস্থান করতে, না আমরা করতাম তা দেখাদেখি হয়ে যেত।[11]

এ ঘটনার পর মুশরিকগণ আরও ক্রোধান্বিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল এবং উমার (রাঃ)-এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যেমনটি সহীহুল বুখারীর মধ্যে ইবনে উমার হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, উমার ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন এমন সময় আবূ 'আমর আস বিন ওয়ায়েল সাহমী সেখানে আগমন করল। সে ইয়ামান দেশের তৈরী নকশাদার জোড়া চাদর এবং রেশম দ্বারা সুসজ্জিত চমকদার জামা পরিহিত অবস্থায় ছিল। তার সম্পর্ক ছিল সাহম গোত্রের সাথে এবং জাহেলিয়াত যুগে এ গোত্র বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্য করবে বরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার'?

উমার (রাঃ) বললেন, 'আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি এবং এ জন্যই আপনার জাতি আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।

আস বলল, 'তা সম্ভব নয়।'

আসের এ কথা শুনে আমি মনে কিছুটা শান্তি পেলাম, কিছুটা তৃপ্তি অনুভব করলাম। তারপর আস সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তখন জনতার ভিড়ে সমগ্র উপত্যকা গিজ গিজ করছিল।

আমজনতার অগ্রভাগে অবস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোথায় চলেছ?' উত্তরে তারা বলল, 'আমরা চলেছি খাত্তাবের ছেলের একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে। কারণ, সে বেদ্বীন (বিধর্মী) হয়ে গিয়েছে।'

আস বলল, 'না সে দিকে যাবার কোন পথ নেই।'

এ কথা শুনা মাত্রই জনতা আর অগ্রসর না হয়ে তাদের পূর্বের স্থান অভিমুখে ফিরে গেল।[12]

উমারের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকগণের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত হল। অপর পক্ষে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে আঁচ-অনুমান কিংবা কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে এর পাশাপাশি আলোচিত পরের ঘটনাটি থেকে। মুজাহিদ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, আমি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কী কারণে লকব বা উপাধি 'ফারূক' হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার তিনদিন পূর্বে হামযাহ (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন, তারপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, 'আমি যখন মুসলিম

হলাম তখন আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদি জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?

নাবী (ﷺ) ইরশাদ করলেন, ‘অবশ্যই! সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদি জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও হক বা সত্যের উপরেই তোমরা রয়েছ।’

উমারের বর্ণনা : ‘তখন আমি সকলকে লক্ষ্য করে বললাম যে, গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব।

তারপর আমরা দু’টি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দু’সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির শিরোভাগে ছিলেন হামযাহ (রাঃ) আর অন্য সারির শিরোভাগে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় যাঁতার আটার মতো হালকা ধূলি কণা উড়ে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম। উমার (রাঃ) বলেছেন, ‘কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযাহকে মুসলিমদের সঙ্গে দেখল তখন মনে মনে তারা এত আঘাতপ্রাপ্ত হল যে, এমন আঘাত ইতোপূর্বে আর কখনো পায়নি। সেই দিনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার উপাধি দিয়েছিলেন ‘ফারূক’’]

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত উমার (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ততদিন পর্যন্ত আমরা ক্বাবা’হগৃহের নিকট নামায আদায় করতে সাহস করিনি।

সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন থেকে ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সে দিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের আহবান জানানো সম্ভব হল।

পূর্বের সূত্র ধরেই বলা হয়েছে, ‘আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বৈঠক করলাম এবং আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করলাম। যারা আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদও করলাম।

ইবনে মাসউদের বর্ণনাঃ ‘যখন হতে উমার (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে কুরাইশ নেতাদের কথোপকথন

দু'জন সম্মানিত এবং প্রতাপশালী বীর অর্থাৎ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মুসলিম হওয়ার পর থেকে মুশরিকগণের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং মুসলিমদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে পাশবিকতা ও মাতলামির স্থলে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর প্রচার এবং তাবলীগের কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতা অবলম্বনের পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে সদাচার করা এবং অর্থ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব, নারী ইত্যাদি যোগান দেয়ার প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁকে প্রচার কাজ থেকে নিবৃত্ত করার এক নয়া কৌশল প্রয়োগের মনস্থ করে। কিন্তু সেই হতভাগ্যদের জানা ছিল না যে, সমগ্র পৃথিবী যার উপর সূর্য উদিত হয় দাওয়াত ও তাবলীগের তুলনায় খড় কুটারও মর্যাদা বহন করে না। এ কারণে এ পরিকল্পনায়ও তাদের অকৃতকার্য ও বিফল হতে হয়।

ইবনে ইসহাক্ব ইয়াযিদ বিন যিয়াদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন ক্বা'ব কুরাযীর এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, আমাকে বলা হয় যে, উতবাহ বিন রাবী'আহ যিনি গোত্রীয় প্রধান ছিলেন, একদিন কুরাইশগণের বৈঠকে বললেন- 'ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসজিদুল হারামের এক জায়গায় একাকী অবস্থান করছিলেন, 'হে কুরাইশগণ! আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে কেনই বা কথোপকথন করব না এবং তাঁর সামনে কিছু উপস্থাপন করব না। হতে পারে যে, তিনি আমাদের কোন কিছু গ্রহণ করে নিবেন। তবে যা কিছু তিনি গ্রহণ করবেন তাঁকে তা প্রদান করে আমরা তাঁকে তাঁর প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত করে দেব।' এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন হামযাহ মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবং মুশরিকগণ দেখছিল যে, মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুশরিকগণ বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আপনি যান এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলুন। এরপর উতবাহ সেখান থেকে উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বসল এবং বলল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র! আমাদের গোত্রে তোমার মর্যাদা ও স্থান যা আছে এবং বংশীয় যে সম্মান আছে তা তোমার জানা আছে। এখন তুমি নিজ গোত্রের নিকট এক বড় ধরণের ব্যাপার নিয়ে এসেছ যার ফলে গোত্রভুক্ত বিভিন্ন লোকজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ওদের বিবেক-বুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতার সম্মুখীন করে ফেলেছ। তাদের উপাস্য প্রতিমাদের

এবং তাদের ধর্মের দোষত্রুটি প্রকাশ করে মৃত পূর্ব পুরুষদের ‘কাফের’ সাব্যস্ত করছ। এ সব নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমার নিকট কয়েকটি কথা পেশ করছি। তার প্রতি মনোযোগী হও। এমনটি হয়তো বা হতেও পারে যে, কোন কথা তোমার ভাল লাগবে এবং তুমি তা গ্রহণ করবে।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘আবুল ওয়ালীদ বল আমি তোমার কথায় মনোযোগী হব।’

আবুল ওয়ালীদ বলল, ‘ভ্রাতুষ্পুত্র! এ ব্যাপারে তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ এবং মানুষকে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছ তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, এর মাধ্যমে তুমি কিছু ধন-সম্পদ অর্জন করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ একত্রিত করে দেব যে, তুমি আমাদের সব চাইতে অধিক ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে, কিংবা যদি তুমি এটা চাও যে, মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমার কাম্য তাহলে আমাদের নেতৃত্ব তোমার হাতে সমর্পন করে দিব এবং তোমাকে ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান কিংবা মীমাংসা আমরা করব না, কিংবা যদি এমনও হয় যে, তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত করে দিচ্ছি। তাছাড়া তোমার নিকট যে আগমন করে সে যদি জিন কিংবা ভূত-প্রেত হয় যাকে তুমি দেখছ অথচ নিজে নিজে তার কুপ্রভাব প্রতিহত করতে পারছ না, তাহলে আমার তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং তোমার পূর্ণ সুস্থতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন আমরাই তা করতে প্রস্তুত আছি, কেননা কখনো কখনো এমনও হয় যে, জিন-ভূতেরা মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে এবং এ জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনও হয়ে দাঁড়ায়।

উতবাহ এক নাগাড়ে এ সব কথা বলতে থাকল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে থাকলেন। যখন সে তার কথা বলা শেষ করল তখন নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, ‘আবুল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে? সে বলল, ‘হ্যাঁ’

নাবী (ﷺ) বললেন, ‘বেশ ভাল, এখন আমার কথা শোন।’

সে বলল, ‘ঠিক আছে শুনব।’

নাবী (ﷺ) বললেন,

(بسم الله الرحمن الرحيم حٰم تَنزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ) [فصلت:1: 5].

অর্থঃ হা'মীম, এ বাণী করুণাময় দয়ালু (আল্লাহ) এর তরফ থেকে নাজিলকৃ, এটা এমন একটি কিতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ কুরআন যা আরবী ভাষায় (অবতারিত), জ্ঞানী লোকদের জন্য (উপকারী)। (এটা) সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক কিন্তু অধিকাংশ লোকই মুখ ফিরিয়ে নিল। সুতরাং তারা শুনেই না। এবং তারা বলে, যে কথার প্রতি আপনি আমাদের ডাকেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত। (ফুসসিলাত ৪১ : ১-৫)
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঠ করতে থাকেন এবং উতবাহ নিজ দু'হাত পশ্চাতে মাটির উপর রাখা অবস্থায় তাতে ভর দিয়ে শ্রবণ করতে থাকে। যখন নাবী (ﷺ) সিজদার আয়াতের নিকট পৌঁছে গেলেন। তখন সিজদা করলেন এবং বললেন, আবুল ওয়ালীদ তোমাকে যা শ্রবণ করানোর প্রয়োজন ছিল তা শ্রবণ করেছ, এখন তুমি জান এবং তোমার কর্ম জানে।
উতবাহ সেখান থেকে উঠে সোজা তার বন্ধুদের নিকট চলে গেল। তাকে আসতে দেখে মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করতে থাকল, আল্লাহর শপথ! আবুল ওয়ালীদ তোমাদের নিকট সেই মুখ দিয়ে আসছে না যে মুখ নিয়ে সে গিয়েছিল, তারপর আবুল ওয়ালিদ যখন তাদের নিকট এসে বসল তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'আবুল ওয়ালীদ! পিছনের খবর কি?'

সে বলল, 'পিছনের খবর হচ্ছে আমি এমন এক কথা শুনেছি যা কোনদিনই শুনি নি। আল্লাহর শপথ! সে কথা কবিতা নয়, যাদুও নয়। হে কুরাইশগণ! আমরা কথা মেনে নিয়ে ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। (আমার মত হচ্ছে) ঐ ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সে পৃথক হয়ে থেকে যাক। আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ থেকে যে বাণী শ্রবণ করলাম তা দ্বারা অতিশয় কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি তাকে কোন আরবী হত্যা করে ফেলে তবে তো তোমাদের কর্মটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তি যদি আরবীদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় তাহলে এর রাজত্ব পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই রাজত্ব হিসেবে গণ্য হবে! এর অস্তিত্ব বা টিকে থাকা সব চাইতে বেশী তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।
লোকেরা বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আল্লাহর কসম, তোমার উপরও তার যাদুর প্রভাব কাজ করেছে।'

উতবাহ বলল, ‘তোমরা যাই মনে করনা কেন, তাঁর সম্পর্কে আমার যা অভিমত আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। এখন তোমরা যা ভাল মনে করবে, তাই করবে।[1]
অন্য এক বর্ণনায় এটা উল্লে-খিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (ﷺ) যখন তিলাওয়াত আরম্ভ করেছিলেন তখন উতবাহ নীরবে শুনতে থাকে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ আয়াতে কারীমা পাঠ করেন,

فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدَ) [فصلت:13]

‘‘এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল- আমি তোমাদেরকে অকস্মাৎ শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি- ‘আদ ও সামূদের (উপর নেমে আসা) অকস্মাৎ-শাস্তির মত।’ (ফুসসিলাত ৪১ : ১৩)
এ কথা শোন মাত্রই উতবাহ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এবং এটা বলে তার হাত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখের উপর রাখল যে, আমি আল্লাহর মাধ্যম দিয়ে এবং আত্মীয়তার প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়ে কথা বলছি যে, এমনটি যেন না করা হয়। সে এ ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল যে প্রদর্শিত ভয় যদি এসেই যায়। এরপর সে সমবেত মুশরিকগণের নিকট চলে যায় এবং তাদের সঙ্গে উল্লে-খিত আলাপ আলোচনা করে।
কুরাইশগণ উক্তরূপ উত্তরে একেবারে নিরাশ হয়ে যায় নি কেননা তিনি (ﷺ) তাদেরকে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, বরং উতবাহকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন মাত্র। অতঃপর ‘উতবাহ সেখান হতে ফিরে এসেছে। ফলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে যাবতীয় বিষয়াদী সম্পর্কে পরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা করল।
অতঃপর একদিবসে তারা মাগরিবের পর কা’বাহর সম্মুখে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ডেকে পাঠালে তিনি (ﷺ) দ্রুত সেখানে হাজির হলেন এমন মনে করে যে, তাতে হয়তো কোন কল্যাণ রয়েছে। যখন তিনি (ﷺ) তাদের মাঝে আসন গ্রহণ করলেন, তারা উতবাহর অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করল। তাদের ধারণা ছিল যে, সেদিন ‘উতবাহ একা একা প্রস্তাব করাতে মুহাম্মাদ সম্মত হয়নি; তবে সবাই সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব করলে তা মেনে নিবেন অবশ্যই। কিন্তু তাদের প্রস্তাব শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা আমার ব্যাপারে এসব কি বলছ, আমি তোমাদের নিকটে কোন ধন-সম্পদ ও মর্যাদা চাই না। তোমাদের নিটক কোন রাজত্ব চাই না। তবে আল্লাহ তা’আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাঁর পক্ষ হতে আমার উপর

কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে ভাল কর্মের উত্তম ফলাফলের শুভসংবাদ দেই এবং অন্যায় ও পাপকর্মের শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমি রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং সৎ উপদেশ প্রদান করছি। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলো দুনিয়া ও আখিরাতে এর ভাল পরিণাম ভোগ করবে। আর যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করে যাবো।

তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়ে আরেক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। তা হলো তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাজে দাবি জানালো যে, নাবী (ﷺ) যেন তাদের জমিন থেকে পাহাড়সমূহ দূরীভূত করে দেন, তাদের জমিন প্রশস্থ করে দেন। অতঃপর সেই জমিনে ঝর্ণা ও নদ-নদী প্রবাহিত করে দেন। আর তিনি (ﷺ) যেন তাদের মৃতদেরকে জীবিত করে দেন; বিশেষ করে কুসাই বিন কিলাবকে। তিনি (ﷺ) এসব কর্ম সম্পাদন করলেই কেবল তারা ঈমান আনবে। তাদের এ কথার জবাবে রাসূল (ﷺ) পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন।

এরপর তারা আবার অন্য একটি বিষয় উত্থাপন করলো- তারা বললো নাবী (ﷺ) যেন তার প্রভুর নিকট একজন ফেরেশতাকেও নাবী করে পাঠান যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দাবীকে সত্যায়ন করবে। আর আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে বাগ-বাগিচা, ধন-সম্পদ ও স্বর্ণের অট্টালিকা প্রদান করেন। এবারও রাসূল (ﷺ) একই জবাব দিলেন।

অতঃপর তারা চতুর্থ একটি বিষয় উপস্থাপন করলো- মুহাম্মাদ যেহেতু তাদের শাস্তির ভয় দেখায় সুতরাং কুরাইশরা নাবী (ﷺ) এর কাছে আযাব আনয়ন করার দাবি জানালো এবং এও বললো তাদের উপর যেন আকাশ হয়ে পড়ে। (আল্লাহ তা'আলা যথাসময়ে এটা সম্পাদন করবেন।)

শেষ পর্যায়ে তারা ভীষণ হুমকি দিল এমনকি তারা বললো, আমরা তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবনা, এতে হয় আমরা তোমাকে শেষ করবো অথবা আমরা নিঃশেষ হবো। তাদের এ ধরনের ধমকি শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে স্বীয় পরিবারবর্গের নিকটে ফিরে গেলেন।

আবু জাহেলের আচরণ

আল্লাহর রাসূল হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মপ্রকাশের পর, তাওহীদের বাণী প্রচারের পারম্যকাল থেকেই আবু জাহলের চাইতে বড় কোন শত্রুর মুখোমুখি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো হননি। হেন কোন অত্যাচার নেই যা আবু জাহল নবীজির ওপর করেনি। লাঞ্ছনা, অপমান, অপদস্থ তো ছিলই, শারীরিক আর মানসিকভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করা ব্যক্তি ছিল আবু জাহল।

সাহাবীদের উপর ও অকথ্য, নির্মম আর পাশবিক অত্যাচার নেমে এসেছিল এই আবুজাহেলের ইশারায়। একত্ববাদের বাণী প্রচার যখন থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের ব্রত হয়ে ওঠে, তখন থেকে আবু জাহল যেন ইসলামের এক অবধারিত শত্রু। আর কূটচাল, তার শত্রুতা,পাশবিকতা যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সাথে। মক্কার প্রাথমিক সেই সময়গুলোতে কেউ তাওহীদের বাণী প্রচারের নামবে কিন্তু আবু জাহল তাদের বাগড়া দেবে না এমনটা যেন ভাবাই যেত না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট হতে ফিরে আসলেন তখন আবূ জাহল কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, ‘কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দ। আপনার সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদের ধর্মে কলঙ্ক রটাচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষের নিন্দা করছে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে খাটো বলে রটনা করছে এবং দেবদেবীগণের অবমাননা করছে। এ সব কারণে আল্লাহ তা’আলার শপথ করে বলছি যে, আমি এক খণ্ড ভারী এবং সহজে উঠানো সম্ভব এমন পাথর নিয়ে বসব এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যখন সিজদায় যাবে তখন সেই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করে ফেলব। এখন এ অবস্থায় তোমরা আমাকে এক অসহায় ছেড়ে দাও, আর না হয় সাহায্য কর। বনু আবদে মানাফ এর পর যা চাই তা করুক’। উপস্থিত লোকেরা বলল, ‘আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি যা করার ইচ্ছে করেছ তার করে ফেল।

সকাল হলে আবূ জাহল তার ঘোষণার অনুরূপ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যথা নিয়মে আগমন করলেন এবং সালাতে রত হলেন। কুরাইশগণও সেখানে উপস্থিত হয়ে আবূ জাহলের কথিত কাণ্ড দেখার জন্য অপেক্ষামান রইল। যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিজদায় গমন করলেন তখন আবূ জাহল পাথর উঠিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু নিকটে পৌঁছে পরাস্ত সৈনিকের মতো

স্ববেগে পশ্চাদপসরণ করল। এ সময় তাকে অত্যন্ত বিবর্ণ এবং ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। তার দু'হাত পাথরের সঙ্গে শক্তভাবে চিমটে লেগে গিয়েছিল। পাথরের গা থেকে হাত ছাড়াতে তাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে এবং বেগ পেতে হয়েছিল।

এ দিকে কুরাইশগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক দ্রুত তার নিকট এগিয়ে আসে এবং বলতে থাকে, আবূল হাকাম! ব্যাপারটি হল কী? কিছুই যেন বুঝে উঠছি না।

সে বলল, 'আমি রাত্রিবেলা যা বলেছিলাম তা করার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম তখন একটি উট আমার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। হায় আল্লাহ! কক্ষনো আমি এমন মস্তক, এমন ঘাড় এবং এমন দাঁতবিশিষ্ট উট দেখি নি। মনে হল সে যেন আমাকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

ইবনে ইসহাক্ব বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'উষ্ট্রের রূপ ধারণ করে সেখানে ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। আবূ জাহল যদি আমার নিকট যেত তাহলে তার উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়ে যেত।

ইসলামের একেবারে প্রথম যুদ্ধ, প্রথম জিহাদ, সেই বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের লড়তে হয়েছে মূলত আবুজাহল বাহিনীর বিরুদ্ধে। মুসলিমদের প্রতিপক্ষ হিসেবে শত্রু শিবিরের নেতৃত্বের আসনে ছিল সে।

কুরাইশগণের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ও কিছু ছাড় দেয়া

কুরাইশগণ বিভিন্নভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি-ধমকি দিয়েও ব্যর্থ হলো এবং আবূ জাহল যে ন্যাক্কারজনক সংকল্প গ্রহণ করেছিল তা বিফল হলো তখন তারা সমস্যা থেকে উত্তোরণের নতুন কৌশল অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করলো। তাদের মনে এ ধারণা ছিল না যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য নাবী নয় বরং তাদের অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝

-তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। (সূরাহ শূরা : ১৪ আয়াত)

কাজেই তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, দীনের বিষয়ে মুহাম্মাদের সাথে কিছু সমতা আনয়ন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কিছু বিষয় পরিত্যাগ করতে বলার

চিন্তাভাবনা করলেন। এতে তারা ধারণা করলো যে, তারা এবার একটা প্রকৃত সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে যদিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সত্য বিষয়ের প্রতি আহবান করে থাকেন।

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাবাহ গৃহ ত্বাওয়াফ করছিলেন এমতাবস্থায় আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযা, ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়া বিন খালাফ এবং আস বিন ওয়ায়িল সাহমী তার সামনে উপস্থিত হলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন নিজ নিজ গোত্রের প্রধান। তাঁরা বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (ﷺ) এসো। তুমি যে মা'বুদের উপাসনা কর আমরাও সে মা'বুদের উপাসনা করি এবং আমরা যে মা'বুদের উপাসনা করি তোমরাও সে মা'বুদের উপাসনা কর। এরপর দেখা যাবে, যদি তোমাদের মা'বূদ কোন অংশে আমাদের মা'বূদ চেয়ে উন্নত হয় তাহলে আমরা সেই অংশ গ্রহণ করব, আর যদি আমাদের মা'বূদ কোন অংশে তোমার মা'বূদ চেয়ে উন্নত হয় তাহলে সেই অংশ গ্রহণ করবে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা সূরাহ কূল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ করেন। যার মধ্যে জলদগম্ভীর সূরে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

'বল, 'হে কাফিররা! ২. তোমরা যার ইবাদাত কর, আমি তার ইবাদাত করি না।' (আল-কাফিরূন ১০৯ : ১-২)

আবদ বিন হুমায়েদ ও অন্যান্য হতে একটি বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে, মুশরিকগণ প্রস্তাব করল যে, যদি আপনি আমাদের মাবূদকে গ্রহণ করেন তবে আমরাও আপনার আল্লাহর ইবাদত কর।[2]

ইবনে জারীর এবং তাবারানীর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, যদি তিনি এক বছর যাবৎ তাদের মা'বূদের (প্রভুর) পূজা অর্চনা করেন তাহলে তারা নাবী (ﷺ)-এর প্রভু প্রতিপালকের ইবাদত (উপাসনা) করবে।

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

"বল, ওহে অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার আদেশ করছ?" (যুমার : ৬৪ আয়াত) আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন হাস্যকর কথার এমন

স্পষ্ট ও দৃঢ় জবাব দেওয়ার পরও মুশরিকরা বিরত হলো না বরং আরো অধিক হারে এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা করতে থাকল। এমনকি তারা এ দাবি করলো যে, মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছে তার কিছু অংশ যেন পরিবর্তন করে। তারা বললো,

ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ

তারা বলে, 'এটা বাদে অন্য আরেকটা কুরআন আন কিংবা ওটাকে বদলাও'। (সূরাহ ইউনুস : ১৫ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেন,

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, বল, "আমার নিজের ইচ্ছেমত ওটা বদলানো আমার কাজ নয়, আমার কাছে যা ওয়াহী করা হয় আমি কেবল সেটারই অনুসরণ করে থাকি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে এক অতি বড় বিভীষিকার দিনে আমি শাস্তির ভয় করি"। (সূরাহ ইউনুস : ১৫ আয়াত)

আর এরকম কাজের মহাদুর্ভোগ সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

"আমি তোমার প্রতি যে ওয়াহী করেছি তাথেকে তোমাকে পদস্থলিত করার জন্য তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার (অর্থাৎ নাযিলকৃত ওয়াহীর) বিপরীতে মিথ্যা রচনা কর, তাহলে তারা তোমাকে অবশ্যই বন্ধু বানিয়ে নিত। - আমি তোমাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকেই পড়তে। - তুমি তা করলে আমি তোমাকে এ দুনিয়ায় দ্বিগুণ আর পরকালেও দ্বিগুণ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। সে অবস্থায় তুমি তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পেতে না।" (সূরাহ বানী ইসরাঈল : ৭৩-৭৪ আয়াত)

কুরাইশদের হতভম্বতা, প্রানান্তকর প্রচেষ্টা এবং ইহুদীদের সাথে মিলে যাওয়া

কুরাইশদের সর্বপ্রকার উদ্যোগ যখন ব্যর্থ হলো তখন কুরাইশদের কাছে অন্ধকার নেমে আসলো। হতভম্ভ হয়ে গেল তারা। এমন অবস্থায় তাদের মধ্যেকার অন্যতম শয়তান নাযর বিন হারিস একদিন কুরাইশগণকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'ওহে কুরাইশ ভাইগণ। আল্লাহর শপথ তোমাদের সম্মুখে এক মহা দুর্যোগপূর্ণ সময় উপস্থিত হয়েছে, অথচ তোমরা আজ পর্যন্ত এর কোন প্রতিকার কিংবা প্রতিবাদ কোনটাই করতে পার নি। মুহাম্মাদ (ﷺ) যখন তোমাদের মধ্যে যুবক ছিল, তখন সকলের প্রিয় পাত্র ছিল। সবার চেয়ে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ছিল। এখন যখন তার কান ও মাথার মধ্যেকার চুল সাদা হতে চলল (অর্থাৎ বয়সবৃদ্ধি পেয়ে মধ্য বয়সে পৌঁছল) এবং তোমাদের নিকট কিছু বাণী ও বক্তব্য উপস্থাপন করল তখন তোমরা বলছ যে, সে একজন যাদুকর। না, আল্লাহর শপথ যে যাদুকর নয়। আমরা যাদুকর দেখেছি তাদের ঝাড় ফুঁক ও গিরাবন্দিও দেখেছি, কিন্তু এর মধ্যে সে রকম কোন কিছুই দেখছিনা'।

তোমরা বলছ যে, সে একজন কাহিন।

কিন্তু তাকে তো কাহিন বলেও মনে হয় না। আমরা কাহিন দেখেছি, দেখেছি তাদের অসার বাগাড়ম্বর, উল্টোপাল্টা কাজ কর্ম এবং বাক চাতুর্য। কিন্তু এঁর মধ্যে তেমন কিছুই দেখিনা।

তোমরা বলছ, সে কবি, কিন্তু তাঁকে কবি বলেও তো মনে হয় না। আমরা কবি দেখেছি এবং কাব্যধারা হাজয, রাজ্য ইত্যাদিও শুনেছি। কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে যা শুনেছি, কোনদিন কারো কাছেই তা শুনিনি। তার কাছে যা শুনেছি তা তো অদ্ভুত জিনিস।

তোমরা তাকে বলছ পাগল! কিন্তু তাকে পাগল বলার কোন হেতুই তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা তো অনেক পাগলের পাগলামি দেখেছি, দেখেছি তাদের উল্টোপাল্টা কাজকর্ম, শুনেছি তাদের অসংলগ্ন ও অশ্লীল। কথাবার্তা এবং আরও কত কিছু। কিন্তু এর মধ্যে তেমন কোন ঘটনাই কোন দিন দেখিনি। ওহে কুরাইশগণ! আল্লাহর শপথ, তোমরা খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছ। খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে পরিত্রাণের পথ খোঁজ করো।

কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সত্যবাদিতা, ক্ষমাশীলতা, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যাবতীয় কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে টিকে থাকা, সকল প্রকার প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান, প্রত্যেক বালা-মসিবতে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা ও অনমণীয়তা প্রত্যক্ষ করলো

তখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সত্যিকার নাবী হওয়ার সপক্ষে তাদের সন্দেহ আরো ঘনিভূত হলো। ফলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্পর্কে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করার নিমিত্তে ইহুদীদের সাথে মিলিত হল। নাযর বিন হারিসের পূর্বোক্ত নসিহত শ্রবণ করে তারা তাকে ইহুদীদের শহরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। সুতরাং সে ইহুদী পণ্ডিতদের নিকটে আসলে তারা তাকে পরামর্শ প্রদান করলো যে, তোমরা তাকে তিনটি প্রশ্ন করবে। প্রশ্নগুলোর ঠিকঠক উত্তর দিতে পারলে বুঝা যাবে সে সত্যিকার নাবী। আর উত্তর দিতে না পারলে বুঝা যাবে, এটা তার নিজস্ব দাবি। যে তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো তা হচ্ছে-

১. তোমরা তার কাছে প্রথম যুগের সেই যুবকদের সম্পর্কে জানতে চাবে যে, তাদের অবস্থা আপনি বর্ণনা করুন। কেননা তাদের বিষয়টা নিতান্তই আশ্চর্যজনক ও রহস্যেঘেরা।

২. তোমরা তাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যে পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল। তার খবর কী?

৩. তোমরা তাকে রূহ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে যে, রূহটা মূলত কী জিনিস?

অতঃপর নাযর বিন হারিস মক্কায় ফিরে এসে বললো, “আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যা আমাদের এবং মুহাম্মাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবে।” এরপর সে ইহুদী পণ্ডিতগণ যা বলেছে তা তাদের জানিয়ে দিল। কথামতো কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে উক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কয়েকদিন পর সূরাহ কাহফ অবতীর্ণ হয় যে সূরাহতে সেইসব যুবকদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে- তারা হলো আসহাবে কাহফ, সারা পৃথিবী সফরকারী ব্যক্তি হলো- জুল কারনাইন। আর রূহ সম্পর্কে নাযিল হয় সূরাহ বানী ইসরাঈল। ফলে কুরাইশদের কাছে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সীমালংঘনকারীরা তা প্রত্যাখ্যান করে বসে।

এ হচ্ছে কুরাইশগণ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দাওয়াত মুকাবেলা করার সামান্য চিত্র। বাস্তব কথা হলো তারা রাসূলুল্লাহ-এর দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সর্ব প্রকারের চেষ্টা চালিয়েছে। তারা একস্তর থেকে অন্যস্তর, এক প্রকার থেকে অন্য প্রকার, কঠিন হতে নম্র, নম্র হতে কঠিন, তর্ক-বিতর্ক হতে আপোশরফা, মিমাংসা হতে আবার তর্ক-বিতর্ক, ধমকী প্রদান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তারা প্রলোভন দেখাতো, তাতে কাজ না তারা কখনো কোন প্রতিশ্রুতি দিত অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নিত। তাদের অবস্থা এমন

হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন তারা একবার সামনে অগ্রসর হচ্ছে আবার পিছনে হটছে। তাদের কোন স্থীরতা নেই আর নেই কোন প্রত্যাবর্তন স্থল। তাদের এরকম বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার দাবি ছিল যে, এর মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত স্তব্ধ ও বন্ধ হয়ে যাবে এবং কুফরী প্রাধন্য পাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো- তাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কর্মতৎপরতা, উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে একটি হাতিয়ার বাকী থাকল তা হলো অস্ত্রধারণ। তবে অস্ত্রধারণ কেবল মুসিবতই বৃদ্ধি করে না বরং ভিত্তিমূলকে নড়বড়ে করে দেয়। ফলে তারা এখন কী করবে ভেবে না পেয়ে পেরেশান হয়ে গেল।

আবূ ত্বালিব যখন দেখলেন যে, কুরাইশগণ সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখন তিনি স্বীয় প্রপিতামহ আবদে মানাফের দু'পুত্র হাশিম ও মুত্তালেব বংশধারার পরিবার বর্গকে একত্রিত করেন। তারপর এ কথা বলে তাদের আহবান জানান যে, এতদিন পর্যন্ত তিনি এককভাবেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের দেখাশোনা এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে যেহেতু তাঁর পক্ষে এককভাবে আর সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, সেহেতু সম্মিলিতভাবে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানালেন। আবূ ত্বালীবের এই অনুরোধ আরবী সম্প্রদায়িকতার আকর্ষণের প্রেক্ষিতে সেই দু'পরিবারের সকলেই তা মেনে নিলেন। কিন্তু আবূ ত্বালীবের ভাই আবূ লাহাব তা গ্রহণ না করে কুরাইশ মুশরিকগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজকর্ম করার এবং তাদের সাহায্য করার কথা ঘোষণা করলেন

মুশরিকদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো এবং তারা দেখতে পেল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম ও কাফির সকলের সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেছে। এ সব কারণে মুশরিকদের হতবুদ্ধিতা আরো বেড়ে গেল।

পূর্বোলি-খিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুশরিকগণ 'মুহাসসাব' নামক উপত্যকায় খাইফে বনী কিনানাহর ভিতরে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয় বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে উঠাবসা, কথোপকথন মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনকিছুই করা চলবে না। হত্যার জন্য

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যতদিন তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

মুশরিকগণ এ বর্জন বা বয়কটের দলিলস্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, তারা কখনো বনু হাশিমের পক্ষ হতে কোন সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে না, যে পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার জন্য মুশরিকগণের হাতে সমর্পন না করবে সে পর্যন্ত এ অঙ্গীকার নামা বলবৎ থাকবে।

এ অঙ্গীকার নামার সঠিক লেখক ছিলেন বোগায়েয বিন 'আমির বিন হাশিম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার প্রতি বদ দোওয়া করেছিলেন যার ফলে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এ অঙ্গীকার স্থিরীকৃত হল এবং অঙ্গীকারনামাটি ক্বাবা'হর দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হল। যার ফলে আবূ লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের কী কাফের, কী মুসলিম সকলেই আতঙ্কিত হয়ে 'শেয়াবে আবূ ত্বালিব' গিরি সংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়ত সপ্তম বর্ষের মুহারম মাসের প্রারম্ভে চাঁদ রাত্রিতে। তবে এ ঘটনা সংঘটনের সময়ের ব্যাপারে আরো মতামত রয়েছে।

তিন বৎসর, 'শিয়াবে আবূ ত্বালিব' গিরিসংকটে অন্তরীণাবস্থা

এ বয়কটের ফলে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব-সামগ্রী আমদানী ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়েছিল। কারণ, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যা মক্কায় আসত মুশরিকগণ তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারণে গিরি সংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হতো। উপবাসের অবস্থা এরূপ হয়ে যখন মর্মবিদারক কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকত তখন গিরি সংকটে তাঁদের নিকট জিনিসপত্র পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব পড়েছিল, যা পৌঁছত তাও অতি সঙ্গোপনে। হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাহিরে যেতে পারতেন না। অবশ্য যে সকল কাফেলা মক্কার বাহির থেকে আগমন করত তাদের নিকট থেকে তাঁরা জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু

মক্কার ব্যবসায়ীগণ এবং লোকজনেরা সে সব জিনিসের দাম এতই বৃদ্ধি করে দিত যে, গিরিসংকটবাসীগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই তা থেকে যেত।

খাদীজাহ (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম বিন হিযাম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য গম পাঠিয়ে দিতেন। এক দিবস আবূ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে উদ্যত হল, কিন্তু আবুল বোখতারী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল এবং তার ফুফুর নিকট খাদ্য প্রেরণে সাহায্য করল।

এ দিকে আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কিত সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের কারণে লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করত তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিজ শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কেউ যদি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে সে দেখে নিক যে, তিনি কোথায় শয়ন করেন। তারপর যখন লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়ত তিনি তাঁর শয্যাস্থল পরিবর্তন করে দিতেন। নিজ পুত্র, ভাই কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যথেকে এক জনকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন এবং তার পরিত্যাজ্য শয্যায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শয়নের ব্যবস্থা করতেন।

এ অবরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও হজ্বের সময় নাবী কারীম (ﷺ) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ গিরি সংকট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন এবং হজ্জ্বব্রত পালনে আগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। সে সময় আবূ লাহাবের কার্যকলাপ যা ছিল সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এরূপ অবর্ণনীয় সংকটময় অবস্থায় দীর্ঘ দু’ বা তিন বছর অতিক্রান্ত হল। এরপর নবুওয়াত ১০ম বর্ষের মুহাররম মাসে[1] লিখিত অঙ্গীকারনামাটি ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসমাপ্তিত ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কারণ, প্রথম থেকেই কিছু সংখ্যক ছিল এর বিপক্ষে। যারা এর বিপক্ষে ছিল তারা সব সময় সুযোগের সন্ধানে থাকত একে বাতিল কিংবা বিনষ্ট করার জন্য। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বছর দুয়েক অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর রহমতে সেই একরারনামা বিনষ্ট করার মোক্ষম এক সুযোগ এসে যায় অবলীলাক্রমে।

এর প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন বনু ‘আমির বিন লুঈ গোত্রের হিশাম বিন ‘আমর নামক এক ব্যক্তি। রাতের অন্ধকারে এ ব্যক্তি গোপনে গোপনে ‘শেয়াবে আবূ ত্বালিব’ গিরি সংকটের ভিতরে খাদ্য শস্যাদি প্রেরণ করে বনু হাশিমের লোকজনদের সাহায্য সহানুভূতি করতেন। এ ব্যক্তি এক দিন যুহাইর বিন আবূ উমাইয়া মাখযুমীর নিকট

গিয়ে পৌঁছলেন। যুহায়েরের মাতা আতেকা হলেন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং আবূ ত্বালীবের ভগ্নী। তিনি যুহাইরকে সম্বোধণ করে বললেন, যুহাইর! ‘তুমি এটা কিভাবে বরদাস্ত করছ যে, আমরা উদর পূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে আহার করছি, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করছি আর বনু হাশিম খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন যাপন করছে। বর্তমানে তোমার মামা বংশের যে অবস্থা চলছে তা তুমি ভালভাবেই জানো।’ বনু হালীমাহর কথা শুনে ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে যুহাইর বললেন, ‘সব কথাই তো ঠিক, কিন্তু এ ব্যাপারে একা আমি কী করতে পারি? তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যদি কেউ থাকত তাহলে অবশ্যই আমি এ একরারনামা ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম’’। হিশাম বলল, ‘বেশতো, এ ব্যাপারে আমি আছি তোমার সঙ্গে।’ যুহাইর বলল, বেশ, তাহলে এখন তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো।’

এ প্রেক্ষিতে হিশাম, মুত্ব’ঈম বিন আদীর নিকটে গেলেন। মুত্ব’ঈম বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সম্পর্ক সূত্রে আবদে মানাফের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিশাম তাঁদের বংশীয় সম্পর্কের কথা উল্লে-খ করে তাঁকে ভৎর্সনা করার পর ‘বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের দারুণ দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লে-খ করে বললেন, ‘বংশীয় ব্যক্তিদের এত দুঃখ, কষ্টের কথা অবগত হওয়া সত্ত্বও তুমি কিভাবে কুরাইশদের সমর্থন করতে পার?’ মুত্ব’ঈম বললেন, ‘সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু আমি একা কী করতে পারি? ‘হিশাম বললেন, ‘আরও একজন রয়েছে।’ মুত্ব’ঈম জিজ্ঞাসা করলেন সে কে? হিশাম বললেন, ‘আমি’’। মুত্ব’ঈম বললেন, ‘আচ্ছা তবে তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো’। হিশাম বললেন, ‘এটাও করেছি।’ বললেন, সে কে? উত্তরে বললেন, ‘যুহাইর বিন আবি উমাইয়া।’

মুত্ব’ঈম বললেন, ‘আচ্ছা তবে এখন চতুর্থ ব্যক্তির অনুসন্ধান করো’’। এ প্রেক্ষিতে হিশাম বিন ‘আমর আবুল বুখতারী বিন হিশামের নিকট গেলেন এবং মুতয়েমের সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গেও ঠিক একইভাবে কথাবার্তা হল।

তিনি বললেন, ‘আচ্ছা এর সমর্থক কেউ আছে কি?’ হিশাম বললেন হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কে? হিশাম বললেন, ‘যুহাইর বিন আবি উমাইয়া, মুত্ব’ঈম বিন আদী এবং আমি।’

তিনি বললেন, ‘আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এখন ৫ম ব্যক্তির খোঁজ করো। এবাবে হিশাম যামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদের নিকট গেলেন এবং তার সঙ্গে

কথাবার্তা বলেন বনু হাশিমের আত্মীয়তা এবং তাদের প্রাপ্যসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, 'আচ্ছা যে কাজের জন্য আমাকে ডাক দিচ্ছ, সে ব্যাপারে আরও কি কারো সমর্থন আছে?

হিশাম 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর করে সকলের নাম বললেন। তারপর তাঁরা সকলে হাজূনের নিকট একত্রিত হয়ে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, কুরাইশগণের অঙ্গীকারপত্রখানা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। যুহাইর বললেন, 'এ ব্যাপারে আমিই সর্ব প্রথম মুখ খুলব।'

পূর্বের কথা মতো পর দিন প্রাতে সকলে মজলিসে উপস্থিত হলেন। যুহাইর শরীরে একজোড়া কাপড় ভালভাবে লাগিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করে নিলেন। তারপর সমবেত জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে মক্কাবাসীগণ! আমরা তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করে খাওয়া-দাওয়া করব, উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করব। আর বনু হাশিম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় এবং আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না, যতক্ষণ ঐ অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক অঙ্গীকারপত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা না হচ্ছে।

আবূ জাহল মাসজিদুল হারামের নিকটেই ছিল- সে বললো, তুমি ভুল বলছ। আল্লাহর শপথ! তা ছিঁড়ে ফেলা হবে না।

প্রত্যুত্তরে যামআ বিন আসওয়াদ বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! তুমি অধিক ভুল বলছ। কিসের অঙ্গীকারপত্র! ওটা লিখার ব্যাপারে আমাদের কোন সম্মতি ছিল না। আমরা ওতে সন্তুষ্টও ছিলাম না।''

অন্য দিক থেকে আবুল বুখতারী সহযোগী হয়ে বলে উঠল,

''যামআ ঠিকই বলেছো। ঐ অঙ্গীকারপত্রে যা লেখা হয়েছিল তাতে আমাদের সম্মতি ছিল না এবং এখনো তা মান্য করতে আমরা বাধ্য নই।'

এর পর মুত্ব'ঈম বিন আদী বললেন, 'তোমরা উভয়েই ন্যায্য কথা বলেছো। এর বিপরীত কথাবার্তা যারা বলেছো তারাই ভুল বলেছো। আমরা এ প্রতিজ্ঞাপত্র এবং ওতে যা কিছু লেখা রয়েছে তা হতে আল্লাহর সমীপে অসন্তোষ প্রকাশ করছি।

ওদের সমর্থনে হিশাম বিন 'আমরও অনুরূপ কথাবার্তা বললেন।

এদের আলাপ ও কথাবার্তা শুনে আবূ জাহল বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, এ সব কথা আলাপ-আলোচনা করে বিগত রাত্রিতে স্থির করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ এ স্থান বাদ দিয়ে অন্যত্র কোথাও করা হয়েছে।'

ঐ সময় আবূ ত্বালিবও পবিত্র হারামের এক প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ অঙ্গীকারপত্র সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার কীট প্রেরণ করেছেন যা অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক এবং আত্মীয়তা বিনষ্টকারী অঙ্গীকার পত্রটির সমস্ত কথা বিনষ্ট করে দিয়েছে। শুধুমাত্র আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর চাচা আবূ ত্বালিবকে এ কথা বলেছিলেন এবং তিনিও কুরাইশগণকে এ কথা বলার জন্য মসজিদুল হারামে আগমন করেছিলেন।

আবূ ত্বালিব কুরাইশগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর তরফ থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট সংবাদ এসেছে যে, আপনাদের অঙ্গীকারপত্রটির সমস্ত লেখা আল্লাহ প্রেরিত কীটেরা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু আল্লাহর নামটি বর্তমান আছে। এ সংবাদটি আপনাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে প্রেরণ করেছেন। যদি তাঁর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর ও আপনাদের মধ্য থেকে আমি সরে দাঁড়াব। তখন আপনাদের যা ইচ্ছে হয় করবেন। কিন্তু তাঁর কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কটদের মাধ্যমে আপনারা আমাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছেন তা থেকে বিরত হতে হবে। এ কথায় কুরাইশগণ বললেন, 'আপনি ইনসাফের কথাই বলছেন।'

এ দিকে আবূ জাহল এবং লোকজনদের মধ্যে বাকযুদ্ধ ও বচসা শেষ হলে মুত্ব'ঈম বিন আদী অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর সেটা হাতে নিয়ে সত্যি সত্যিই দেখা গেল যে, এক প্রকার কীট লেখাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু মাত্র 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি অবশিষ্ট রয়েছে এবং যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম লেখা ছিল শুধু সেই লেখা গুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। কীটে সেগুলো খায়নি। তারপর অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা হল এবং এর ফলে বয়কটেরও অবসান ঘটল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং অন্যান্য সকলে শেয়াবে আবূ ত্বালিব থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুশরিকগণ নাবী (ﷺ)-এর নবুওয়তের এক বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে চমৎকৃত হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আচরণের ক্ষেত্রে কোনই পরিবর্তন সূচিত হল না। যার উল্লে-খ এ আয়াতে কারীমায় রয়েছে,

(وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) [القمر:2]

‘‘কিন্তু তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে- ‘এটা তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু’।’ (আল-ক্বামার ৫৪ : ২)

তাই মুশরিকগণ বিমুখ হলে গেল এবং স্বীয় কুফরে তারা আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে গেল।

আবূ ত্বালিব সমীপে শেষ কুরাইশ প্রতিনিধি দল

গিরি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর পূর্বের মতো আবারও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। অপরপক্ষে মুশরিকগণ যদিও বয়কট পরিহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তবুও পূর্বের মতই মুসলিমদের উপর চাপসৃষ্টি এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকল। আবূ ত্বালিবও পূর্বের মতই জীবন বাজি রেখে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাহায্য করতে থাকলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে থাকলেন। কিন্তু এখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ এবং বিশেষ করে গিরি সংকটে তিন বছর যাবৎ অবর্ণনীয় অভাব-অনটনের মধ্যে আবদ্ধ জীবন-যাপন করার ফলে তাঁর শক্তি সামর্থ্য প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল এবং কোমর বক্রাকার ধারণ করেছিল। গিরি সংকটের আবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার পর এ সব কারণে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ সময় মুশরিকগণ চিন্তা-ভাবনা করল যে, যদি আবূ ত্বালীবের মৃত্যু হয় এবং তারা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অন্যায়-অত্যাচার করে তবে এতে তাদের খুব বড় রকমের বদনাম হয়ে যাবে। এ কারণে আবূ ত্বালীবের সামনেই মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে তিনি কিছুটা সুযোগ-সুবিধাও দিতে পারেন আগে কোন দিনই যা দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। এ চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষাপটে একটি কুরাইশ প্রতিনিধিদল আবূ ত্বালীবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল এবং এটিই ছিল তাঁর নিকট অনুরূপ শেষ প্রতিনিধি দল।

ইবনে ইসহাক্ব এবং অন্যান্যদের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, যখন অসুস্থ আবূ ত্বালিব শয্যাগত হয়ে পড়লেন এবং দিনে দিনে তাঁর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকল তখন কুরাইশগণ এ মর্মে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল যে, ‘হামযাহ ও উমার মুসলিম হয়ে গিয়েছে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ধর্ম বিভিন্ন কুরাইশ গোত্রে বিস্তার লাভ

করেছে। কাজেই, চল আমরা আবূ ত্বালীবের নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম প্রচার থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে একটি অঙ্গীকার আদায়ের কথা বলি এবং আমাদের পক্ষ থেকেও কোন প্রকার অনিষ্ট না করার ব্যাপারে তাঁর অনুকূলে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে নেই। কারণ, এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত ভীত এবং আতংকিত যে, এই ধারায় মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রচার অব্যাহত রাখলে লোকজনেরা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে।

অন্য এক বর্ণনায় কুরাইশগণের বক্তব্য এ মর্মে প্রমাণ করা হয়েছে 'আমাদের ভয় হচ্ছে যে, বৃদ্ধ আবূ ত্বালিব মৃত্যু বরণ করলে এবং তারপর মুহাম্মাদ(ﷺ)-এর সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদের নিন্দা করবে এবং বলবে যে, তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ছেড়ে রেখেছিল। (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছুই করতে পারে নি) কিন্তু যখন তাঁর চাচা মৃত্যু মুখে পতিত হলেন তখন তারা তাঁর উপর আক্রমণ করে বসল। যাহোক, এ কুরাইশ প্রতিনিধি দল আবূ ত্বালীবের নিকট গিয়ে পৌঁছল এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করল। কুরাইশগণের মধ্য থেকে বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এই প্রতিনিধিদ দল গঠিত হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লে-খযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন উতবাহ বিন রাবী'আহহ্, শায়বাহ বিন রাবী'আহ, আবূ জাহল বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালফ, এবং আবূ সুফইয়ান বিন হারব। এ প্রতিনিধিদলে ছিল মোট পাঁচ জন সদস্য।

বৃদ্ধ আবূ ত্বালিবকে সম্বোধন করে তারা বলল, 'হে আবূ ত্বালিব! আমাদের মধ্যে মান-মর্যাদার যে আসনে আপনি সমাসীন রয়েছেন তা সম্যক অবহিত রয়েছেন এবং বর্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছেন তাও আপনার নিকট সুস্পষ্ট। আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আপনি আপনার জীবনের অন্তিম পর্যায় অতিবাহিত করছেন। এ দিকে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আমাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মতদ্বৈধতা চলে আসছে সেও আপনার অজানা নেই। আমরা চাচ্ছি যে, আপনি তাঁকে ডাকিয়ে নেবেন এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের নিকট থেকে এবং আমাদের সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য হবে আমরা তাঁর থেকে এবং সে আমাদের থেকে পৃথক থাকবে। অর্থাৎ আমাদের ধর্মমতের উপর সে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না এবং আমরাও তার ধর্মমতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করব না।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে আবূ ত্বালিব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়ে নিলেন এবং বললেন ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এরা হচ্ছেন তোমার

স্বজাতীয় সম্মানিত ব্যক্তি। তোমার জন্যই এরা এখানে সমবেত হয়েছেন। এরা চাচ্ছেন যে, তোমাকে কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করবেন এবং তোমাকেও তাঁদের কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ধর্মমতের ব্যাপারে তাঁরা তোমার প্রতি কোন কটাক্ষ করবেন না এবং তুমিও তাঁদের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ করবে না। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন,

(أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُعْطِيْتُكُمْ كَلِمَةً تَكَلَّمْتُمْ بِهَا، مَلَّكْتُمْ بِهَا الْعَرَبَ، وَدَانَتْ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ)

‘আমি যদি এমন একটি প্রস্তাব পেশ করি যা মেনে নিলে গোটা আরবের সম্রাট হওয়া যাবে এবং আজম অধীনস্থ হয়ে যাবে তাহলে এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী হতে পারে তা বলুন। কোন কোন বর্ণনায় এমনটিও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর চাচা আবূ ত্বালিবকে সম্বোধন করে বলেছেন, চাচা জান! আমি তাঁদের নিকট থেকে এমন এক প্রস্তাবের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন চাই যা মেনে নিলে সমগ্র আরব জাহান তাঁদের অধীনস্থ হয়ে যাবে এবং আজম তাঁদের নিকট কর দিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হবে।

অন্য এক বর্ণনায় কথাও উল্লে-খ রয়েছে যে, নাবী (ﷺ) বললেন, ‘চাচাজান! আপনি তাদেরকে এমন কথার প্রতি আহবান জানান না কেন যা প্রকৃতই তাদের মঙ্গল জনক।’

তিনি বললেন, তুমি কোন্ কথার প্রতি তাদের আহবান জানাতে বলছ?

নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এমন এক কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছি যে, কথা মেনে নিলে সমগ্র আরব তাদের অধীনস্থ হয়ে যাবে এবং অনারবদের উপর তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইবনে ইসহাক্বের এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের বললেন,

كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم

‘‘আপনারা শুধুমাত্র একটি কথা মেনে নিন যার বদৌলতে আপনারা হয়ে যাবেন আরবের সম্রাট এবং আজম হয়ে যাবে আপনাদের অধীনস্থ।’’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে যখন তার একথা শুনল তখন তারা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে গেল এবং মনে হল যেন তাদের হতবুদ্ধিতায় পেয়ে বসেছে। মুহাম্মাদ

(ﷺ)-এর শুধু একটি কথা মেনে নিলে তারা এত বেশী লাভবান হতে পারবে এ চিন্তা তাদের মন মগজকে একদম আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারা মনে মনে বলতে থাকল যে, একটি মাত্র কথাতে যদি এত বড় উপকার হয় তাহলে তা ছেড়ে দেয়া যায় কী করে? আবূ জাহল বলল, 'আচ্ছা তুমি বলত ঠিক সে কথাটি কী? তোমার পিতার কসম, কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে একটি কেন দশটি বললেও আমরা মান্য করতে প্রস্তুত আছি।' নাবী (ﷺ) বললেন,

(لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَتَخْلَعُوْنَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ)

''আপনারা বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা করেন তা পরিহার করুন।''

নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তারা হাতে হাত মারতে মারতে এবং তালি দিতে দিতে বলল, 'মুহাম্মাদ (ﷺ) তুমি এটাই চাচ্ছ যে, সকল আল্লাহর জায়গায় মাত্র এক আল্লাহকে আমরা মেনে নেই। বাস্তবিক তোমার ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যজনক!' তারপর তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে বলল, 'আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তি তোমাদের একটি কথাও মান্য করার জন্য প্রস্তুত নয়। অতএব, চলো এবং পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশ পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত দ্বীনের উপরেই অটল থাক যাবৎ আল্লাহ আমাদের এবং তার মধ্যে একটা মীমাংসা করে না দেন। এর পর তারা নিজ নিজ রাস্তায় চলে গেল।

এ ঘটনার পর সেই সব লোকজনকে কেন্দ্র করে কুরআন মাজীদে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল[1] :

(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوْا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلأُ× مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) [ص:1: 7]

''১. সা'দ, নাসীহাতে পূর্ণ কুরআনের শপথ- (এটা সত্য)। ২. কিন্তু কাফিররা আত্মম্ভরিতা আর বিরোধিতায় নিমজ্জিত। ৩. তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে

দিয়েছি, অবশেষে তারা (ক্ষমা লাভের জন্য) আর্তচিৎকার করেছিল, কিন্তু তখন পরিত্রাণ লাভের আর কোন অবকাশই ছিল না। ৪. আর তারা (এ ব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিরগণ বলল- 'এটা একটা যাদুকর, মিথ্যুক। ৫. সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে? এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার তো!' ৬. তাদের প্রধানরা প্রস্থান করল এই ব'লে যে, 'তোমরা চলে যাও আর অবিচলিত চিত্তে তোমাদের ইলাহদের পূজায় লেগে থাক। অবশ্যই এ ব্যাপারটির পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। ৭. এমন কথা তো আমাদের নিকট অতীতের মিল্লাতগুলো থেকে শুনিনি। এটা শ্রেফ একটা মন-গড়া কথা।' (সোয়াদ ৩৮ : ১-৭)

শোকের বছর

আবু ত্বালীবের মৃত্যু

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবূ ত্বালীবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুওয়ত ১০ম বর্ষের রজব মাসে।[1]

এ ব্যাপারে অন্য একটি মত হচ্ছে তিনি খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

সহীর বুখারীতে মুসাইইব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবূ জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)

'চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইইল্লাল্লাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।''

আবূ জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবূ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবূ ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।' নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْـهُ)

‘‘আমি যতক্ষণ বাধা প্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।’ এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَن يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِي قُرْبٰى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ) [التوبة:113]

‘‘নাবী ও মু’মিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।’ (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয়:

(إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص: 56]

‘‘তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।’ (আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)
এখানে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। মক্কার অনাচারী মুশরিকগণের আক্রমণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতই তিনি ছিলেন দূর্গ স্বরূপ। কিন্তু আল্লাহর নাবী (ﷺ) এবং ইসলামের জন্য এত করেও যেহেতু তিনি বংশপম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বহুত্ববাদের প্রভাব কাটিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না, সেহেতু দোরগোড়ায় আগত কামিয়াবি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। যেমন সহীহুল বুখারী শরীফে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি তোমার চাচার কি উপকারে আসবে? ‘কারণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।
রাসূলুল্লাহ বললেন,

(هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِن نَّارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ)

‘‘তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করেছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তা হলে তিনি জাহান্নামের অতল ডুবে যেতেন।[2]
আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাঁর চাচা আবূ ত্বালীবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু’পায়ের গিঁট পৌঁছবে।

হযরত খাদীজা (রাঃ) মৃত্যু

আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর দু’মাস পর (মতান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উম্মুল মো'মেনীন খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবনের ৫০তম বছর।[1]
রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনে খাদীজাহ (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ তা‘আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নাবী (ﷺ)-কে সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে ইসলাম বীজের অংকুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাবী কারীম (ﷺ) বলেছেন,

(آمَنَتْ بِىْ حِيْنَ كَفَرَ بِىْ النَّاسُ، وَصَدَقَتْنِىْ حِيْنَ كَذَبَنِيْ النَّاسُ، وَأَشْرَكَتْنِىْ فِيْ مَالِهَا حِيْنَ حَرَّمَنِىْ النَّاسُ، وَرَزَقَنِىْ اللهُ وَلَدَهَا وَحَرَّمَ وَلَدَ غَيْرِهَا)

যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি নিটোল বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে দান করলেন, আর লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।

সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইনি খাদীজাহ (রাঃ) আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না।

দুঃখের উপর দুঃখ

প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ ত্বালীবের মৃত্যু এবং প্রাণাধিকা প্রিয়া ও সহধর্মিনী উম্মুল মো'মিনীন খাদীজাহ (রাঃ)-এর মুত্যু এ দুটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ দুটি মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নাবী (ﷺ)-এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুণ শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে। পিতৃব্যের মৃত্যুর ফলে মুশরিকগণের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নাবী (ﷺ) ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যমে তারা শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। একেত প্রিয় পরিজনদের বিয়োগ ব্যথা, অন্যদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা নির্যাতন পর্বতসম ধৈর্য্যের অধিকারী হয়েও নাবী (ﷺ)-এর জীবন হয়ে উঠে বিষাদময় ও বিপর্যস্ত, হয়ে উঠে নৈরাশ্যে ভরপুর। নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আশায় বুক বেঁধে অগ্রসর হন তিনি ত্বায়িফের পথে যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কিন্তু সেখানে দাওয়াত কবুল, আশ্রয় কিংবা, সাহায্য প্রদান কোন কিছু তো নয়ই, বরং তাঁর সঙ্গে এতই নির্মম আচরণ করা হল এবং এতই দৈহিক নির্যাতন চালানো হল যে, তা অতীত নির্যাতনের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে গেল (এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আরও পরে)।

এ দিকে মক্কার মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের উপর ইতোপূর্বে যেভাবে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল এখনো

অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যেতে থাকল। শুধু তাই নয়, বরং নির্যাতনের মাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, আবূ বাকর (রাঃ) -এর মতো অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে মক্কা ছেড়ে হাবশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে 'বারকে গিমাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে ইবনে দাগানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁকে নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ আশ্রয়ে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে।

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবূ ত্বালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এত কষ্ট দেন যা আবূ ত্বালীবের জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনার উল্লে-খ করা হল। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য বললেন,

(لَا تَبْكِىْ يَابُنَيَّةُ، فَإِنَّ اللهَ مَانِعٌ أَبَاكَ)

''পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাজতকারী।''

ঐ সময় তিনি এ কথাও বলেন যে,

(مَا نَالَتْ مِنِّىْ قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتّٰى مَاتَ أَبُوْ طَالِبٍ)

''যতদিন আমার চাচা আবূ ত্বালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিল।''[2]

এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে নাবী কারীম (ﷺ) সেই বছরটির নাম রাখেন 'আমুল হুযন' অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

নাবী (সাঃ) এর তায়েফ গমন

আবু তালিব মারা যাওয়ার পর কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করল যা তার চাচা আবু তালিব বেঁচে থাকতে তারা করতে পারেনি। তাই তিনি কুরাইশদের অত্যাচার প্রতিরোধে সাহায্য ও সহযোগিতার লাভের আশায় তায়েফে বনু সাকিফ গোত্রের কাছে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে, একাকী তিনি সেখানে গেলেন।

পৌঁছে তিনি বনু সাকিফ গোত্রের সবচেয়ে গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলেন। তারা তিন ভাই আবদ ইয়ালিল ,মাসুউদ ও হাবিব। এদের পিতার নাম আমুর ইবনে উমাইর। তাদের একজন কুরাইশ গোত্রের বনু জমাহ্ উপগোত্রের বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিল। তাদের কাছে বসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম প্রচারে সহায়তা করার অনুরোধ জানালেন। তিনি তাদেরকে কুরাইশদের বিরোধিতার মুখে তাকে সমর্থন করার আবেদন জানালেন। তাদের একজন বললো ,"আল্লাহ যদি তোমাকে রসূল করে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কাবা শরীফের গেলাফ খুলে ফেলুন ",আর একজন বললো,আল্লাহ কি রাসূল বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না? দ্বিতীয় জন বললো,তোমার সাথে আমি কোন কথাই বলবো না তুমি যদি তোমার দাবি অনুসারে সত্যি হয়ে থাকো তাহলে তো তোমার কথার প্রতিবাদ করতে যাওয়া বিপদজনক। আর তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমার সাথে আমার কথা বলাই অনুচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কথা না বলে সেখান থেকে উঠে আসলেন। বিদায় হবার আগে তাদেরকে অনুরোধ করলেন যে, তোমরা যখন আমার দাওয়াত গ্রহণ করলে না তখন আমার কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করোনা। ওরা অন্যদের কাছে তার কথা প্রচার করে তার বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি এরূপ অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারা সে অনুরোধ রক্ষা করল না। তারা বরং গোত্রের মূর্খ, নির্বোধ, ও দাস শ্রেণীর লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে গালাগালি দিতে দিতে ও ও হইহুল্লা করতে করতে চারদিক থেকে ছুটে এলো। বিপুল সংখ্যক লোক তাকে ঘিরে ধরল তিনি বাধ্য হয়ে উতবা ও শাইবা ইবনে রাবীয়া নামক দুই ভাইয়ের দেয়াল ঘেরা ফলের বাগানে আশ্রয় নিলেন। তারা দুই ভাই সে সময় বাগানে ছিল। সাকীফ গোত্রের যেসব লোক তার পিছু নিয়েছিল তারা তখন ফিরে চলে গেল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আঙ্গুর ঝোপের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। উতবা ও শাইবা তার উপর তায়েফবাসীর অবর্ণনীয় অত্যাচার এতক্ষণ নীরবে প্রত্যক্ষ করছিল। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কুরাইশ উপগোত্রের সেই মহিলাটির সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাকে বললেন," তোমার দেবররা আমার সাথে কি আচরণ করল দেখলে তো?"

নাবী (ﷺ) তায়েফ থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মক্কায় ফেরত আসলেন। ফেরার পথে তিনি আল্লাহর দরবারে এই প্রসিদ্ধ দু'আটি করলেন-

اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِى، وَقِلَّةَ حِيلَتِى وهَوَانى عَلَى النَّاس يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وأَنْتَ رَبَّى إِلَى مَنْ تَكِلَنِى إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى؟ أوْ إلى عَدوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِى، إنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلاَ أُبَالِى، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِى أَوْسَعُ لى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَنْ يَحِلَّ عَلَىَّ غَضَبُكَ أَوْ أَنْ يَنْزِلَ بى سَخَطُك، لك العُتبى حَتَّى تَرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلا بِكَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্বীয় দুর্বলতা, (মানুষকে বুঝাতে) আমার কলা-কৌশলের স্বল্পতা এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু! তুমি দুর্বলদের প্রভু, আমারও প্রভু। তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছ? তুমি কি আমাকে দূরের এমন অচেনা কারও হাতে ন্যস্ত করছ, যে আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবে? নাকি কোন শত্রুর হাতে সোপর্দ করছ, যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছ? তুমি যদি আমার উপর রসূান্বিত না হও তাহলে আমি কোন কিছুই পরওয়া করিনা। তবে নিঃসন্দেহে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সর্বাধিক প্রশস্ত ও প্রসারিত। আমি তোমার সেই চেহারার আলোর আশ্রয় চাই, যা দ্বারা অন্ধকার দূরিভূত হয়ে যায় এবং যা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সংশোধন হয়। এই কথার মাধ্যমে আমার উপর তোমার ক্রোধা নেমে আসা হতে অথবা আমার উপর তোমার অসন্তুষ্টি নাযিল হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমার সকল প্রচেষ্টা। তোমার সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এবং তোমার তাওফীক ও শক্তি ছাড়া তোমার আনুগত্য করা অসম্ভব"

ফেরার পথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তা প্রেরণ করলেন। ফিরিস্তা তাঁর কাছে তায়েফবাসীদের উপর মক্কার বড় দু'টি পাহাড় নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। উত্তরে নাবী (ﷺ) বললেন বরং

আমি চাই আল্লাহ তাদের বংশধর হতে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। 'ওয়াদীয়ে নাখলা' নামক জায়গায় এসে কয়েক দিন অতিবাহিত করলেন। তিনি রাত্রে সেখানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তখন আল্লাহ রাববুল আলামীন জিনদের একটি দল তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তারা নাবী (ﷺ) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনল। কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি তাদের আগমণ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

''স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমি তোমার প্রতি প্রেরণ করেছিলাম একদল জিনকে। যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হলো, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল- চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল ওরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল, এক একজন সতর্ককারীরূপে''। (সূরা আহকাফ- ৪৬:২৯-৩১) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

''বলোঃ আমার প্রতি এই মর্মে অহী প্রেরিত হয়েছে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি''।[2] 'নাখলা' নামক জায়গায় কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর যায়েদ তাঁকে বললেন- মক্কার কুরাইশরা আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আপনি কিভাবে সেখানে প্রবেশ করবেন? তিনি বললেন- হে যায়েদ! তুমি যেই মসীবত প্রত্যক্ষ করছ, আল্লাহ্ তা'আলা তা অবশ্যই বিদূরিত করবেন, তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং তাঁর নাবীকে সাহায্য করবেন।

মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তিনি খোযা'আ গোত্রের একজন লোকের মাধ্যমে মুতইম বিন আদীর কাছে আশ্রয় চাইলেন। তিনি মুতইমকে বললেন- আমি তোমার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে চাই। সে রাজী হল এবং ঘোষণা দিল যে, আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিচ্ছি। সে তার ছেলেদেরকে ডেকে বলল- তোমরা অস্ত্র হাতে নাও এবং কাবার

চারপাশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিচ্ছি। যায়েদকে সাথে নিয়ে তিনি মুতইম বিন আদীর আশ্রয়ে কাবায় প্রবেশ করলেন। মুতইম বিন আদী স্বীয় বাহনের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছি। সুতরাং কেউ যেন তাঁর উপর আক্রমন না করে।

অতঃপর নাবী (ﷺ) হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তাতে চুম্বন করলেন এবং দু'রাকাত সলাত আদায় করলেন। মুতইম বিন আদী এবং তার ছেলেরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাবী (ﷺ) কে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন

ইসরা বা রাত্রি কালীন সফর

ইসরা' প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

''পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।''

একদিন রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় অর্থাৎ বায়তুল মজলিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় কুরাইশ গোত্রের মধ্যে এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজনের মধ্যে ইসলাম বেশ প্রসার লাভ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলতেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বোরাক আনা হয়। একটি চতুষ্পদ জন্তু। পূর্বতন নবীদেরকেও এই জন্তুর পিঠের সাওয়ার করানো হতো। এটি এত দ্রুতগামী যে, সে দৃষ্টির শেষ সীমায় পা ফেলতো। তিনি সেই জন্তুতে সাওয়ার হলেন। তার সঙ্গী জিব্রিল তাকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন। আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য নিদর্শন দেখতে দেখতে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে চলতে চলতে বায়তুল মাগদিস গিয়ে থামলেন। সেখানে নবীদের এক বিরাট সমাবেশ দেখতে পেলেন। তাদের সবাইকে নিয়ে এক জামাতে নামাজ পড়লেন। তারপর তার কাছে তিনটা পাত্র আনা হলো। একটিতে পানি, একটিতে মদ, একটিতে দুধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই তিনটি পাত্র আমার

সামনে রাখার পর শুনতে পেলাম কে যেন বলছে: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি পানি ভরা পাত্র গ্রহণ করেন তাহলে তিনিও ডুববেন এবং তার উম্মাত ও ডুববে। আর যদি মদের পাত্র গ্রহণ করেন তাহলে তিনি বিপথগামী হবেন এবং তার উন্মাদ ও বিপদগামী হবে ।আর তিনি যদি দুধের পাত্র গ্রহণ করেন তাহলে তিনিও হেদায়েত লাভ করবেন এবং তার উম্মত হেদায়েত লাভ করবে। এ কথা শুনে আমি দুধের পাত্রটা নিলাম এবং তা থেকে দুধ পান করলাম ।তখন জিবরীল আলাইহিস সাল্লাম আমাকে বললেন হে মুহাম্মদ আপনি হয়েছেন আর আপনার উম্মতও।

মি'রাজের ঘটনা

মি’রাজ’’ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

‘‘সে (মুহাম্মাদ (ﷺ)) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্বয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা‘ওয়া। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, বাইতুল মাকদাসের অনুষ্ঠাবলী সমাপ্ত হলে আমার সামনে উর্ধ্ব আকাশে আরোহণের সিঁড়ি হাজির করা হলো। এমন সুন্দর কোন জিনিস আমি আর কখনো দেখিনি। তোর সময় হলে মানুষ এই সিঁড়ি দেখতে পায় এবং এর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গী জিব্রাইল আমাকে ওই সিঁড়িতে আরোহন করালেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় গিয়ে থামলেন। দরজা কে বাবুল হাফাযাহ বা রক্ষকদের দরজা বলা হয়। এখানে ইসমাইল নামক একজন ফেরেশতা কর্তব্যরত রয়েছেন। অধীনে রয়েছে ১২ হাজার ফেরেশতা এবং এইসব

ফেরেশতা প্রত্যেকের অধীনেও আবার ১২০০০ করে ফেরেশতা রয়েছে। হাদিস বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

وَماَ يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ اِلاَّ هُوَ

"তোমার প্রভুর শূন্য সমান্তের সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না" (সূরা আল মুদ্দাসিসর)

"অতঃপ্র যখন আমাকে নিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন ওই ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে জিবরীল তিনি কে? তিনি বললেন, ইনি মুহাম্মদ। ফেরেশতা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কি নবী? জিব্রিল বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আমার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন।

প্রথম আকাশে প্রবেশের পর আমি দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি বসে আছেন। তার কাছে সকল মৃত হাজির হচ্ছে। কোন কোনটা হাজির হলে তিনি খুব খুশি হচ্ছেন এবং প্রশংসা করে বলছেন, এটি একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ থেকে নির্গত হয়েছে। আবার কোন কোনটা হাজির হলে তিনি চেহারায় বিরক্ত প্রকাশ করে বলছেন,আহ! এটি একটি অপবিত্র আত্মা যা একটি পাপিষ্ঠ দেহ থেকে নির্গত হয়েছে। আমি জিব্রাইল কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাইল, ইনি কে? জিব্রাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম আলাইহিস সালাম। তার কাছে তার সন্তানদের আত্মা হাজির করা হয়। কোন মুমিনের আত্মা দেখলে তিনি আনন্দিত হয়ে বলেন, এটি একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ থেকে বেরিয়েছে। আর কোন কাফেরের আত্মা দেখলে তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন তাকে অপছন্দ করেন এবং তার প্রতি বিরক্ত হয়ে বলেন এটি একটি অপবিত্র আত্মা যা একটি পাপিষ্ট শরীর থেকে নির্গত হয়েছে।

অতঃপর কতগুলো লোক দেখলাম। তাদের ঠোট উটের ঠোঁটের মতো এবং তাদের হাতের মুঠোর দগ্ধকে জলন্ত ছোট ছোট পাথর টুকরো রয়েছে। সেগুলো তারা মুখে পুরছে। আর পরক্ষণেই তা মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিব্রিল,এরা কারা?' তিনি বললেন এরা ইয়াতিম এর সম্পদ আত্মসাত কারী'।

ওর আরো কিছু সংখ্যক লোক দেখলাম। তাদের পেটের মতো বীভৎস আকৃতির পেট আর কখনো দেখিনি। দেখলাম, ফেরাউনের সহযোগীদের যে পথ দিয়ে দোজখে নেয়া হচ্ছে, সেই পথের উপর তারা অবস্থান করছে।তারা পিপাসা -কাতর উটের মত ছটফট

করছে। আর ফেরাউনের দোযখগামী অনুসারীরা তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট সে তথাপি সেখান থেকে একটু সরে বসবার ক্ষমতাও তাদের নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রিল, এরা কার? 'এরা সুদখোর'।

অতঃপর আরো একদল লোক দেখলাম তাদের সামনে উৎকৃষ্ট মানের পুষ্ঠ গোশত রয়েছে। আর তার পাশেই রয়েছে উৎকট দুর্গন্ধ যুক্ত খারাপ গোশত।। ভালো গোশত বাদ দিয়ে খারাপ গোশত খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রিল, এরা কারা? 'তিনি বললেন এরা সেইসব লোক যারা বৈধ স্ত্রী থাকতে নিষিদ্ধ স্ত্রী লোকের কাছে যায়'।

অতঃপর কিছু সংখ্যক নারীকে দেখলাম তাদের স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ।আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রিল ,এরা কারা? তিনি বললেন, 'এরা সেই সব নারী যারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্যের ঔরসজাত সন্তান স্বামীর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়'।

এরপর তিনি দ্বিতীয় আকাশে আরোহন করালেন। সেখানে দুইজন নবীর সাথে দেখা হলেন একজন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)আর ও ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া(আঃ) সাক্ষাত পেলাম।

অতঃপর জিব্রিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দ্বিতীয় আকাশে আরোহন করালেন সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। আমি বললাম, হে জিবরাইল, ইনি কে? তিনি বললেন,' ইনি হযরত ইয়াকুব (আঃ)এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ')।

অতঃপর চতুর্থ আকাশে আরোহন করে সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। জিব্রাইল জানালেন, 'ইনি হযরত ইদ্রিস (আঃ) । অতঃপর পঞ্চম আকাশে আরোহন করলাম। সেখানে দেখলাম, সাদা চুল ও দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী এক বৃদ্ধ। এত সুন্দর বৃদ্ধ লোক আমি আর কখনো দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম,হে জিব্রিল, ইনি কে? তিনি বললেন তিনি স্বজাতির কাছে প্রিয় হারুন ইবনে ইমরান (আঃ)অতঃপর ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছলাম সেখানে দেখলাম বাদামী রঙের লম্বা নাক বিশিষ্ট একি পুরুষ যেন শানুয়া গোত্রের কোন লোক। আমি বললাম,হে জিবরাইল, ইনি কে?'তিনি আপনার ভাই হযরত মুসা ইবনে ইমরান(আঃ)'।

পর আমাকে সপ্তম আকাশে আরোহন করালেন। সেখানে দেখলাম বায়তুল মামুরের দরজার কাছে একটি চেয়ারে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। বাইতুল

মামুদের প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে এবং তারা আর ফিরে আসে না এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রিল,ইনি কে? তিনি বললেন,'তিনি আপনার পিতা ইব্রাহিম(আঃ)'।

অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঈষৎ কালো ঠোঁট বিশিষ্ট একটা পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কার জন্য সে বলল জাহিদ ইবনে হারিসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম জায়েদ ইবনে হারিসাকে এই সংবাদটি জানিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন এরপর আমি ফিরে এলাম আসার পথে মুসা ইবনে ইমরান আলি সালামের সাথে দেখা হল বস্তু তিনি তোমাদের একজন উত্তম বন্ধু তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার উপর কয় ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে আমি বললাম প্রতিদিন 50 ওয়াক্ত নামাজ বড় কঠিন কাজ আর তোমার উম্মত খুবই দুর্বল তুমি আল্লাহর কাছে ফিরে যাও এবং তোমার ও তোমার উম্মাতের জন্য দায়িত্ব আরো হালকা করে দিতে বলো আমি আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম এবং আমার ও আমার উম্মাতে দায়িত্ব হালকা করে দিতে অনুরোধ করলাম আল্লাহ ১০ ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে দিলেন অতঃপর ফিরে আসলাম মুসার সাথে আবার দেখা হল তিনি আবার আগের মত বললেন আমি আবার গিয়ে আল্লাহকে নামাজ কমিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালাম আল্লাহ আরো 10 ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে দিলেন এভাবে তিনি ক্রমাগত আমাকে পরামর্শ দিতে লাগলেন যখনই তার কাছে ফিরে যাই তিনি বলেন যাও আরো কমিয়ে নিয়ে আসো এভাবে কমাতে কমাতে দিনে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাকি রইল। এবারও মুসার কাছে ফিরে এলে তিনি আরো কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন আমি বললাম বহুবার আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়েছি এবং কমিয়ে দিতে বলেছি আমি লজ্জাবোধ করছি তাই আর ফিরে যেতে পারবো না অতএব যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঈমান ও সতর্কতার সাথে পড়বে, সে ৫০ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সওয়াব পাবে।

মি’রাজের শিক্ষা

১) ঈমানী পরীক্ষাঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে এসে সকালে মানুষের কাছে তা বলতে শুরু করলেন। এ ঘটনা শুনে কতিপয় দুর্বল ঈমানদার মুরতাদ হয়ে

গেল। মুশরিকদের কিছু লোক দৌড়িয়ে আবূ বকর (রাঃ) এর নিকট গিয়ে বললঃ তোমার বন্ধুর খবর শুনবে কি? সে বলছে, আজ রাতের ভিতরেই সে নাকি বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে চলে এসেছে। তিনি বললেনঃ আসলেই কি মুহাম্মাদ তা বলছে? তারা এক বাক্যে বললঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ যদি বলেই থাকে, তাহলে সত্য বলেছেন। তারা আবার বললঃ তুমি কি বিশ্বাস কর যে, সে এক রাতের ভিতরে বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে সকাল হওয়ার পূর্বেই আবার মক্কায় চলে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি এর চেয়েও দূরের সংবাদকে বিশ্বাস করি। তাঁর কাছে সকাল-বিকাল আকাশ থেকে সংবাদ আসে। আমি তা বিশ্বাস করি। সে দিনই আবূ বকর (রাঃ) কে পরম সত্যবাদী তথা সিদ্দীক উপাধীতে ভূষিত করা হয়। (হাকেম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৮১, হা/ ৩১৮২, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২) দাঈদের জন্য শিক্ষাঃ

মিরাজের ঘটনায় দ্বীনের দাঈদের জন্য এক বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। তিনি প্রচারক মিরাজ থেকে ফেরত এসে মানুষের কাছে ঘটনা খুলে বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, লোকেরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তাদের কাছে ঘটনা খুলে বলবো। আমাকে তারা মিথ্যাবাদী বললেও। সুতরাং দ্বীনের দাঈগণের উচিত, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করবে না এবং মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে কি করবে না- এ ধরণের কোন চিন্তা-ভাবনা করবে না; বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে মানুষের সামনে সত্যকে তুলে ধরবে।

৩) আল্লাহ্ তা‘আলা যে আরশে আযীমে সমুন্নত মিরাজের ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা আরশে এবং আসমানে না হলে উপরের দিকে মিরাজ হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

৪)সকল ইবাদতের মধ্যে সলাত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যান্য ইবাদত যমীনে ফরয করেছেন। আর সলাত ফরজ করেছেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে কাছে ডেকে নিয়ে সাত আসমানের উপরে। এতে সলাতের গুরুত্বের কথাটি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

৫) সলাত পরিত্যাগ করা কঠিন অপরাধ। তাই বেসলাতীর শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর।

৬) ব্যভিচার একটি ঘৃণিত কাজ। এর শাস্তিও অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

৭)সুদখোরের ভয়াবহ পরিণতি।

নাবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

নাবী (ﷺ) এর মদ্বীনায় হিজরত এমন একটি ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। এর মাধ্যমেই তাঁর দ্বীনকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন- মুহাম্মাদ বিন সালেহ আসেম বিন উমার ও ইয়াযিদ বিন রুমান এবং অন্যান্য রাবীর মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রসূল (ﷺ) মক্কাতে নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর গোপনে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। চতুর্থ বছর প্রকাশ্যে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর থেকে দশ বছর পর্যন্ত মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে হাজীদের তাঁবুতে গমণ করতেন। এমনি উকায, মাজিন্নাহ এবং যুল মাজাযের বাজারে ও বিভিন্ন মেলার মৌসুমেও লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তাঁকে হেফাজত করার আবেদন করতেন। যাতে তিনি আল্লাহর পয়গাম নির্ভিগ্নে পৌঁছাতে পারেন। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। কিন্তু তিনি কোন সাহায্যকারী ও সাড়াদানকারী পেলেন না। পরিশেষে তিনি প্রত্যেক কবীলার (গোত্রের) কাছে এবং তাদের বাসস্থানে যেতে লাগলেন। তিনি বলতেন- হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। তাহলেই তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে তোমরা আরবদের শাসক হতে পারবে। অনারবরা তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। আর মৃত্যুর পর তোমরা জান্নাতে রাজকীয় জীবন যাপন করতে পারবে। আবু লাহাব তাঁর পিছনে পিছনে চলত এবং লোকদেরকে বলতঃ তোমরা এর অনুসরণ করোনা। সে বেদ্বীন ও মিথ্যুক। ফলে লোকেরা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কথা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। লোকেরা বলতঃ তোমার গোত্রের লোকেরাই তোমার সম্পর্কে অধিক অবগত। তারা তো তোমার অনুসরণ করেনি। তারপরও তিনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন এবং বলতেন- হে আল্লাহ্! তুমি চাইলে এরূপ হতনা। বর্ণনাকারী বলেন- তিনি যে সমস্ত গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে বনী আমের বিন সা'সাআ, বনী মুহারিব বিন খাসফাহ, বনী ফাযারাহ, বনী গাস্সান, বনী মুর্রা, বনী হানীফাহ, বনী সুলাইম, বনী আব্স, বনী নযর, বনী আল-বুকা, বনী কেনদাহ, বনী

কালব, বনী হারিছ, বনী উযরাহ এবং বনী হাযারেমাহ অন্যতম। কিন্তু এ সমস্ত গোত্রের কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয় নি।

তবে খুশীর সংবাদ হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীর জন্য যা আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছিলেন, তা হচ্ছে মদ্বীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মদ্বীনার ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে দীর্ঘ দিন যাবৎ শুনে আসছিল যে, অচিরেই একজন নাবী আসবেন। ইহুদীরা বলতঃ আমরা সেই নাবীর অনুসরণ করব এবং তার সাথে যোগ দিয়ে আমরা আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় তোমাদেরকে (আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে) অকাতরে হত্যা করব। মদ্বীনার আনসারগণ[1] আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় কা'বা ঘরের হাজ্জ করত। তবে ইহুদীরা তা করতনা। হজ্জের মৌসুমে আনসারগণ যখন দেখলেন আল্লাহর রসূল (ﷺ) মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করছেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করল এবং পরস্পর প্রশ্ন করল- আল্লাহর কসম! হে লোক সকল! তোমরা কি জান এই ব্যক্তিই কি তিনি যার মাধ্যমে ইহুদীরা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে? এ রকম যেন না হয় যে, তারা তোমাদের পূর্বেই তাঁর অনুসারী হয়ে যায়।

আওস গোত্রের সুয়ায়েদ ইবনুস সামেত নামক একজন লোক মক্কায় আগমণ করেছিল। রসূল (ﷺ) তাঁকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম কবুল করেনি এবং সরসূরি তা প্রত্যাখ্যানও করে নি। ইতিমধ্যেই আনাস বিন রাফে আবুল হাইস বিন আব্দুল আশহাল গোত্রের একদল যুবকসহ কোন একটি বিষয়ে চুক্তি করার জন্য আগমণ করল। নাবী (ﷺ) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। তখন তাদের মধ্যকার ইয়াস বিন মুআয নামক এক যুবক ব্যক্তি বলতে লাগল- হে আমার গোত্রীয় লোক সকল! আল্লাহর শপথ! আমরা যেই উদ্দেশ্যে আগমণ করেছি তার চেয়ে এটিই (ইসলাম কবুলই) আমাদের জন্য অনেক উত্তম। এ কথা শুনে আনাস তাকে প্রহার করল এবং ধমকাল। এতে সে চুপ হয়ে গেল। অতঃপর তারা সন্ধি চুক্তি পরিপূর্ণ না করেই মদ্বীনায় ফেরত গেল।

আকাবার প্রথম বায়আত

অতঃপর নাবী (ﷺ) হজ্জের মৌসুমে মিনার 'আকাবায়' (গিরি পথে) মদ্বীনার আনসার গোত্রের ছয় জন লোকের সাথে মিলিত হলেন। তাদের সকলেই ছিলেন খাযরাজ

গোত্রের। তারা হচ্ছেন আসআদ বিন যুরারা, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্, আওফ বিন হারিছ, রাফে বিন মালিক, কুতবা বিন আমের এবং উকবা বিন আমের। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মদ্বীনায় ফেরত গিয়ে তারাও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করল। মদ্বীনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রতিটি ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করল। পরের বছর মদ্বীনা থেকে ১২ জন লোক আসল। জাবের (রাঃ) ব্যতীত আগের বছরের সকলেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সাথে আওফের ভাই মুআয বিন হারিছ, যাকওয়ান বিন আবদে কাইসও ছিল। যাকওয়ান মদ্বীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কাতেই ছিল। এই জন্যই তাকে একই সাথে আনসারী মুহাজেরী বলা হয়। তাদের মধ্যে আরও ছিল উবাদা বিন সামিত, ইয়াযিদ বিন ছা'লাবাহ, আবুল হাইছাম ইবনুত তাইহান এবং উয়াইমির বিন সায়েদাহ।

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করে আবুয যুবাইর বলেন- মক্কায় অবস্থানকালে নাবী (ﷺ) নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেয়ার পর একটানা দশ বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে তিনি মাজিন্নাহ ও উকায মেলায় গিয়ে বলতেন- এমন কেউ আছে কি যে আমাকে আশ্রয় দিবে? এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে আল্লাহর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করবে? বিনিময় স্বরূপ সে জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু তিনি কোন সাহায্যকারী বা আশ্রয় দানকারী পান নি। পরিস্থিতি এই পর্যন্ত গিয়ে গড়াল যে, লোকেরা মিশর ও ইয়ামান থেকে মক্কায় তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে আসত। কুরাইশরা এই নবাগত লোকদের কাছে গিয়ে বলতঃ আমাদের এই যুবক লোকটি (মুহাম্মাদ) থেকে সাবধান! সে যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে। তারপরও তিনি তাদের কাছে যেতেন এবং আল্লাহর দিকে আহবান জানাতেন। কুরাইশরা রসূল (ﷺ) এর দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে লোকদেরকে দেখিয়ে দিত এবং তাঁর দাওয়াত থেকে বিরত রাখত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াছরিব (মদ্বীনা) হতে আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। আমাদের কেউ তাঁর কাছে গিয়ে ঈমান আনয়ন করত। তিনি কুরআন পড়ে শুনাতেন। সে তার পরিবারের লোকদের নিকট (মদ্বীনায়) ফেরত আসত। তার পরিবারের লোকেরাও তার মতই মুসলমান হয়ে যেত। এক পর্যায়ে অবস্থা এ রকম হল যে, আনসারদের সব ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করল। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিল।

জাবের (রাঃ) বলেন- অতঃপর আমরা একত্রিত হয়ে বললামঃ আর কত দিন এভাবে আল্লাহর রসূলকে মক্কায় ফেলে রাখব? তিনি মক্কার পাহাড়ি ভূমিতে নির্যাতিত হবেন

এবং ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবেন! সুতরাং আমরা হজ্জের মৌসুমে মক্কায় গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের সাথে আকাবায় মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলেন।

আকাবার দ্বিতীয় বায়আত

আমরা নির্দিষ্ট সময়ে মিনার আকাবায় তাঁর সাথে মিলিত হলাম। সেখানে রসূল (ﷺ) এর চাচা আববাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন- হে ভাতিজা! তোমার কাছে আগত এই লোকগুলো কারা? ইয়াছরিব তথা মদ্বীনাবাসীদের সাথে আমার পরিচয় রয়েছে। একজন দুইজন করে আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। এই সময় আববাস আমাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন- এদেরকে তো আমি চিনি না। এরা সকলেই যুবক। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিসের উপর আপনার হাতে বাইআত করব? তিনি বললেন- খুশীতে অখুশীতে আমার কথা শুনবে ও মানবে, স্বচ্ছলতায় অস্বচ্ছলতায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আল্লাহর হক আদায় করবে, এ ব্যাপারে কোন সমালোচকের সমালোচনায় ও নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবেনা, আমি তোমাদের কাছে চলে গেলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং তোমরা যেভাবে নিজেদেরকে, স্ত্রী-সন্তানদেরকে হেফাজত কর, সেভাবেই তোমরা আমাকে হেফাজত করবে। এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আমরা বায়আত করার জন্য দাঁড়ালাম। তখন আসআদ বিন যুরারা তাঁর হাত ধরে বললেন- হে মদ্বীনাবাসী! একটু থাম। আমরা এ কথা জেনেই উটের উপর আরোহন করে তাঁর কাছেই এসেছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের কাছে চলে আসার অর্থই হচ্ছে সমগ্র আরবের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ, তোমাদের সম্মানী ব্যক্তিগণ অকাতরে নিহত হবে এবং তলোয়ার তোমাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করবে। সুতরাং তোমরা যদি তারপরও সবুর করতে পার, তাহলে তাঁকে তোমাদের কাছে নিয়ে চল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিনিময় দিবেন। আর তোমরা যদি তোমাদের জানের ভয় কর তাহলে তাঁকে এখনই বর্জন কর। এতে তোমরা আল্লাহর কাছে দুর্বলতার ওযূহাত পেশ করতে পারবে। তারা বললেন- হে আসআদ! তোমার হাত সরাও। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই এই অঙ্গিকার ভঙ্গ করবনা এবং বায়আত ফেরতও দিবনা। সুতরাং আমরা একজন একজন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আল্লাহর রসূল আমাদের থেকে উপরোক্ত বিষয়ে বায়আত নিলেন এবং তার বিনিময়ে আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে থাকলেন।

অতঃপর লোকেরা মদ্বীনায় ফেরত গেল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এবং মুসআব বিন উমাইরকে পাঠালেন। তারা মদ্বীনার লোকদেরকে কুরআন পড়াতে লাগলেন এবং আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করতে থাকলেন। তারা উভয়ে আসআদ বিন যুরারার নিকট অবতরণ করলেন। মুসআব সলাতে মুসলিমদের ইমামতি করতেন। তাদের সংখ্যা চল্লিশে পরিণত হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে জুমআর সলাতও শুরু করলেন। মুসআব বিন উমায়ের ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের দাওয়াতে উসাইরাম ব্যতীত বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। তিনি বিলম্ব করে উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন। কালেমা পাঠ করেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। রসূল (ﷺ) তাঁর ব্যাপারেই বলেছেন- সে অল্প আমল করেছে এবং বিরাট পুরস্কার অর্জন করেছে।
মদ্বীনায় দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল এবং ইসলামের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে লাগল। অতঃপর মুসআব মক্কায় ফেরত গেলেন।
এই বৎসর হজ্জের মৌসুমে মুসলিম অমুসলিম মিলে মদ্বীনার আনসারদের থেকে প্রচুর সংখ্যক লোক মক্কায় আগমণ করল। তাদের দলনেতা ছিলেন বারা বিন মারুর।
তারা রাতের অন্ধকারে পূর্ব নির্ধারিত সময় মোতাবেক রসূল (ﷺ) এর সাথে গোপনে মিলিত হলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। এবার আকাবার (দ্বিতীয়) বাইআত সংঘটিত হল। বারা বিন মা'রুর সর্বপ্রথম বাইআত করলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম বাইআত করার ফযীলতটি তিনিই অর্জন করলেন। সেই রাত্রে নাবী (ﷺ) তাদের থেকে ১২ জন নকীব (অধিনায়ক) নিযুক্ত করলেন। বায়আত শেষে তারা তলোয়ার হাতে নিয়ে মিনায় বসবাসকারী মুশরিকদের উপর হামলা করার জন্য রসূল (ﷺ) এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। কিন্তু তিনি তাদেরকে সেই অনুমতি দেননি।

শয়তান তথ্য ফাঁস করে দিল

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর শয়তান উঁচু একটি টিলার উপর উঠে চিৎকার করে বলল- হে মীনাবাসী! মুহাম্মাদ এবং বে-দ্বীন লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একত্রিত হয়েছে। তোমরা কি তা অবগত আছ? আওয়াজ শুনে নাবী (ﷺ) বললেন- এটা হচ্ছে এই ঘাঁটির শয়তান। ওরে আল্লাহর দুশমন অচিরেই আমি তোর জন্যে সময় পাবো। অতঃপর তিনি লোকদেরকে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যেতে বললেন।

পরদিন সকাল হতে না হতেই কুরাইশদের একদল বিশিষ্ট লোক মদ্বীনাবাসীদের তাঁবুর কাছে গিয়ে বলল- আমাদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, গতরাতে তোমরা আমাদের এই লোকটির সাথে সাক্ষাত করেছ এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছ। আল্লাহর শপথ! আরবের যে কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য অধিক অপছন্দনীয়। অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে মোটেই প্রস্তুত নই। যেহেতু খাযরাজ গোত্রের মুশরিক লোকেরা এই বায়আতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিলনা তাই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে লাগল- এ রকম কিছুই হয়নি। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানিনা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফেকও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলতে লাগল- এটি বানোয়াট খবর। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে না জানিয়ে এমন কিছু করতে পারেনা। আর আমি যদি মদ্বীনাতেও থাকতাম তারপর তারা আমার সাথে পরামর্শ না করে এ রকম কোন সিদ্বান্ত নিতনা। (মুসলমানগণ একজন অন্যজনের দিকে আড়চোখে তাকালেন এবং তারা ছিলেন চুপচাপ। কাফেরদের কথা তারা সমর্থনও করলেন না এবং প্রত্যাখ্যানও করলেন না) কুরাইশরা মদ্বীনার মুশরিকদের কথায় বিশ্বাস করে ফেরত চলে গেল। এভাবেই শান্তিপূর্ণভাবে আকাবার দ্বিতীয় বায়আত সমাপ্ত হলো।

বারা বিন মারুর স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে মদ্বীনার উদ্দেশ্যে ইয়াজিজ উপত্যকার দিকে রওয়ানা দিলেন। তাদের রওয়ানা দেয়ার পর বায়আতের খবর কুরাইশদের নিকট সত্য বলে প্রমাণিত হল। কুরাইশরা তাদের সন্ধানে বের হল। তারা ধাওয়া করে সা'দ বিন উবাদাকে পাকড়াও করে ফেলল এবং প্রহার করতে করতে মক্কায় নিয়ে গেল। মুতইম বিন আদী এবং হারিছ বিন হারব এসে তাকে উদ্ধার করে মদ্বীনার পথে ছেড়ে দিল। ঐদিকে সা'দকে না পেয়ে পিছনে ফেরত আসার ব্যাপারে পরামর্শ করল। এমন সময় সা'দ এসে তাদের সাথে যোগ দিলেন। এবার তারা সকলেই মিলে মদ্বীনার পথে যাত্রা করলেন।

নাবী (সাঃ) এবং মুসলিমদের মদীনায় হিজরত

আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুসলমানদেরকে মদ্বীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। মুসলিমগণ দ্রুত মদ্বীনায় হিজরত করতে লাগলেন। আবু সালামা এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা সর্বপ্রথম মদ্বীনার পথে বের হলেন। কিন্তু আবু সালামার শ্বশুর গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে সালামাকে এবং শিশু সন্তান সালামাকে আটকিয়ে দিল। ঐ দিকে আবু সালামার গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে সালামার কাছ থেকে নিজেদের গোত্রের সন্তান দাবী করে তারাও সালামাকে ছিনিয়ে নিল। আবু সালামা কঠিন ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং স্ত্রী-সন্তান ফেলে একাই মদ্বীনায় চলে গেলেন। এক বছর পর উম্মে সালামা তার শিশু সন্তান নিয়ে মদ্বীনায় হিজরত করলেন। উছমান বিন আবু তালহা তাকে মদ্বীনায় পৌঁছিয়ে দিলেন।

আবু সালামার পথ ধরে লোকেরা একের পর এক মদ্বীনায় হিজরত করতে থাকল। এক পর্যায়ে মক্কাতে রসূল (ﷺ), আবু বকর এবং আলী (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন মুসলিম অবশিষ্ট রইলনা। আবু বকর ও আলী রসূল (ﷺ)-এর আদেশেই মক্কায় রয়ে গেলেন। এ ছাড়া যে সমস্ত মুসলিমকে কুরাইশরা আটকিয়ে রেখেছিল তারাও রয়ে গেলেন। রসূল (ﷺ) হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। আবু বকরও প্রস্তুত ছিলেন।

মুশরিকরা যখন দেখল রসূল (ﷺ) এর সাথীগণ বের হয়ে যাচ্ছেন এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ নিয়ে মদ্বীনায় পাড়ি জমাচ্ছেন তখন তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিল, মুসলিমগণ অচিরেই মদ্বীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। তারা জানত যে, মদ্বীনা সুরক্ষিত একটি দেশ এবং তার অধিবাসীরা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। অচিরেই মদ্বীনায় মুসলিমগণ শক্তিশালী হয়ে যাবে। তাই তারা আশঙ্কা করল যে, রসূল (ﷺ) ও মদ্বীনায় চলে যাবেন। সুতরাং বিষয়টি তাদের কাছে খুব বড় হয়ে দেখা দিল। তারা এ ব্যাপারে সিদ্বান্ত নেওয়ার জন্য দারুন্ নাদওয়ায় একত্রিত হল। তাদের বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকদের কেউ অনুপস্থিত রইলনা। তাদের বন্ধু ও মুরববী ইবলীসও একজন নজদী শাইখের বেশ ধরে এবং শরীরে লম্বা চাদর জড়িয়ে বৈঠকে যথাসময়ে উপস্থিত হল। তারা রসূল (ﷺ) এর ব্যাপারে পরামর্শ শুরু করল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু ইবলীস কোন রায়কেই পছন্দ করছিলনা। পরিশেষে আবু জাহেল বলল- আমি মনে করি প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী যুবককে আমরা বেছে নিব। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধাঁরালো তলোয়ার থাকবে। তারা সকলে মিলে

এক সাথে এক আঘাতেই মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলবে। এতে সকল গোত্রের মধ্যে তার রক্ত ভাগ হয়ে যাবে। তারপর আব্দে মানাফ গোত্রের (মুহাম্মাদেও গোত্রের) লোকেরা এ ব্যাপারে কোন সিদ্বান্ত নিতে পারবেনা। তাদের পক্ষে সকল গোত্রের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আর দিয়ত দেয়ার প্রয়োজন হলে আমরা সকলে মিলেই তা পরিশোধ করে দিব।

এই প্রস্তাব শুনে শয়তান বলল- আল্লাহর শপথ! এটিই হচেছ সঠিক প্রস্তাব। সুতরাং তারা সকলে এই প্রস্তাবের উপরেই একমত হয়ে মজলিস ত্যাগ করল। ঐ দিকে জিবরীল ফিরিস্তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে অহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের কথা রসূল (ﷺ) কে জানিয়ে দিলেন এবং সেই রাত্রে তাকে নিজ বিছানায় শয়ন করতে নিষেধ করলেন।

পরের দিন রসূল (ﷺ) স্বীয় চেহারা মুবারক আবৃত করে দিবসের মধ্যভাগে আবু বকরের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অথচ তিনি এ রকম সময়ে ইতিপূর্বে কখনই আবু বকরের বাড়িতে আসতেন না। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন- তোমার কাছে যারা আছে তাদের সকলকে বের করে দাও। আবু বকর (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! এরা তো আপনারই পরিবার। তিনি তখন বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মদ্বীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমিও আপনার সাথে যেতে চাই। তিনি বললেন- হ্যাঁ, তাই হবে। আবু বকর বললেন- আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! এই দু'টি বাহনের যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন। রসূল (ﷺ) বললেন- হ্যাঁ, তবে মূল্য পরিশোধ করেই তা গ্রহণ করব। আলী (রাঃ) কে সেই রাত্রে তাঁর বিছানায় ঘুমাতে বললেন।

ঐ দিকে সন্ধ্যা নেমে আসতেই কুরাইশদের নির্বাচিত যুবকেরা একত্রিত হল। তারা রসূল (ﷺ) এর ঘরের দরজায় পাহারা দিতে লাগল এবং তিনি কখন ঘরে প্রবেশ করে নিদ্রা যাবেন সেই সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল। তারা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল যে, কোন্ বদ নসীব যুবকটি সর্বাগ্রে আক্রমণ করার ঘৃণিত কাজটি সম্পন্ন করবে।

রসূল (ﷺ) ঘর থেকে বের হয়ে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে নিয়ে কাফেরদের মাথায় নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তারা তাঁকে দেখতেই পায় নি। তিনি মাটি নিক্ষেপ করছিলেন আর কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেনঃ

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

“এবং আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখেনা”। (সূরা ইয়াসীন-৩৬:৯) তিনি আবু বকরের বাড়ির দিকে গেলেন। তারা উভয়েই রাতের অন্ধকারে ঘরের জানালা দিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তারা উভয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর এক লোক এসে দেখল- রসূল (ﷺ) এর ঘরের দরজায় লোকেরা অপেক্ষা করছে। সে জিজ্ঞেস করল- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলল- আমরা মুহাম্মাদের অপেক্ষা করছি। সে বলল- তোমরা ব্যর্থ হয়েছ ও তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার নয়। আল্লাহর শপথ! সে তোমাদের পাশ দিয়েই বের হয়ে গেছে। সে তোমাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেছে। তারা দাঁড়িয়ে নিজেদের মাথা হতে মাটি ঝেড়ে ফেলতে লাগল। সকাল হলে আলী (রাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তারা তাঁকে নাবী (ﷺ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।

অতঃপর তিনি এবং আবু বকর (রাঃ) গারে ছাওরের কাছে গিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর গুহার মুখে মাকড়শা জাল বুনিয়ে ফেলল।[1]

রসূল (ﷺ) এবং আবু বকর (রাঃ) মদ্বীনার রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ব হতেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীত লাইছীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। সে মদ্বীনার রাস্তা সম্পর্কে খুব পারদর্শী ছিল এবং সে তার গোত্রের ধর্মের উপরই ছিল। সে ছিল একজন বিশ্বস্ত লোক। তাই তার কাছে তাদের বাহন দু’টি সোপর্দ করলেন এবং তিন দিন পর গারে ছাওরের নিকট আসতে বললেন।

ঐদিকে কুরাইশরা তাদের সন্ধানে কোন প্রকার অলসতা করলনা। ‘কাফা’ তথা পদচিহ্ন দেখে যারা পথচারীর পরিচয় ও গতিপথ জানতে পারে তারা এমন লোককে সাথে নিয়েও অনুসন্ধান চালালো। অনুসন্ধান করতে করতে তারা একদম গুহার দরজায় এসে দাঁড়াল।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, আবু বকর (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টি একটু নীচু করে তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) বললেন- হে আবু বকর! চুপ থাক। সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ। তুমি চিন্তা করনা। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আবু বকর এবং রসূল (ﷺ) তাদের মাথার উপরে কাফেরদের কথা শুনছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। আমের বিন ফুহায়রা আবু বকরের ছাগল চরাত। আবু বকর ও রসূল (ﷺ) সম্পর্কে মক্কায় যা বলা হত সে তা শ্রবণ করত

এবং গুহায় এসে তাদের কাছে সেই খবর পৌঁছে দিত। কিন্তু শেষ রাতে সে মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীদের সাথেই রাত্রি যাপন করত এবং সকালে তাদের সাথেই ঘর থেকে বের হত।

তারা গুহায় তিন দিন অবস্থান করলেন। কুরাইশদের অনুসন্ধানের আগুন যখন নিভে গেল তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীত বাহন দু'টি নিয়ে গুহার নিকট এসে উপস্থিত হল। তারা মদ্বীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। আমের ইবনে ফুহায়রা আবু বকরের পিছনে আরোহন করলেন। পথপ্রদর্শক ছিল তাদের সামনে। আল্লাহর চোখ তাদেরকে পাহারা দিচ্ছিল, তাঁর সাহায্য তাদের সঙ্গী ছিল এবং আল্লাহর রহমত ও দয়ার ছায়ায় নাবীর কাফেলা মদ্বীনার পথে অগ্রসর হতে লাগল।

মক্কার মুশরিকরা যখন নিরাশ হল তখন তারা আবু বকর ও রসূল (ﷺ) কে গ্রেপ্তারের বিনিময়ে বিরাট পুরস্কারের ঘোষণা দিল। লোকেরা পুরস্কারের আশায় তাদের অনুসন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাই বিজয়ী হবে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কাফেলা যখন কুদাইদের উপর দিয়ে বনী মুদলাজ গোত্রের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন বস্তির একজন লোক তাদেরকে দেখে ফেলে। সে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল- আমি এই মাত্র সাগরের তীর বেয়ে একটি কাফেলাকে অতিক্রম করতে দেখেছি। আমার মনে হয় মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীরা এই কাফেলায় রয়েছে। কথাটি শুনেই সুরাকা বিন মালেক বুঝে ফেলল এবং নিজেই সেই পুরস্কারটি অর্জন করতে চাইল। অতীতে এ রকম অনেক পুরস্কারই সে পেয়েছে। সে অন্যদের থেকে বিষয়টি গোপন রাখার মানসে বলতে লাগল- তোমার এই কথা বাদ দাও তো, তারা হচ্ছে উমুক এবং উমুক। তারা তাদের প্রয়োজনে বের হয়েছে। এই বলে সে সামান্য সময় অবস্থান করল। অতঃপর সে তার তাঁবুতে প্রবেশ করে খাদেমকে বলল- তাঁবুর পিছন দিয়ে ঘোড়াটি নিয়ে বের হও। টিলার পিছনে একটু পরেই আমি তোমার সাথে মিলিত হব। অতঃপর সে বর্শা হাতে নিয়ে বর্শার উপরের অংশ মাটির সাথে লাগিয়ে তা দিয়ে দাগ টানতে টানতে অগ্রসর হতে লাগল। ঘোড়ার নিকট পৌঁছে তাতে লাফ দিয়ে আরোহন করল এবং দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে একদম তাদের কাছে চলে গেল এবং রসূল (ﷺ) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেল। তিনি ডানে বামে তাকাচ্ছিলেন না। আর আবু বকর (রাঃ) খুব বেশী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আবু বকর তখন রসূল (ﷺ) কে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! এই তো সুরাকা আমাদের কাছে এসে গেছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

তার ঘোড়ার সামনে পা দু'টি মাটিতে দেবে গেল। সুরাকা বলল- আমি অবশ্যই জানি, তোমাদের বদ দু'আর কারণেই এমনটি হয়েছে। আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ কর। আমি অঙ্গিকার করছি যে, যারা তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছে আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিব।

রসূল (ﷺ) তার জন্য দু'আ করলেন। ঘোড়ার পা উঠে গেল। এবার সুরাকা রসূল (ﷺ) এর কাছে একটি পত্র লিখে দেয়ার আবেদন করল। রসূল (ﷺ) এর আদেশে আবু বকর (রাঃ) এক খন্ড চামড়ার উপর (নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কে) কিছু লিখে দিলেন। পত্রটি মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত তার সাথেই ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সুরাকা পত্রটি নিয়ে আসলে রসূল (ﷺ) তার সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করলেন এবং বললেন- আজ ওয়াদা-অঙ্গিকার পূর্ণ করার দিন, আজ উত্তম আচরণের দিন। সুরাকা রসূল (ﷺ) এবং আবু বকরের জন্য পাথেয় এবং বাহন পেশ করলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তারা বললেন- আমাদের তালাশে যারা বের হয়েছে তুমি শুধু তাদেরকে দূরে রাখ এবং তাদের কাছে আমাদের খবর গোপন রাখ। সে বলল- অবশ্যই তা করব। সে ফেরত গিয়ে দেখল- অনেকেই তাদের সন্ধান করছে। সুরাকা তাদেরকে বলতে লাগল-। আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট খবর নিয়ে এসেছি। তারা এই দিকে নয়। সুরাকা দিনের প্রথমভাগে রসূলের শত্রু ছিল। আর দিবসের শেষভাগে তাঁর বন্ধু এবং রক্ষকে পরিণত হল।

তারা চলতে লাগলেন। চলার পথে উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। উম্মে মা'বাদ ছিল একজন সদাচরণকারী মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী লোকদেরকে সে পানাহার করাত। রসূল (ﷺ) এবং আবু বকর (রাঃ) তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? সে বলল- আল্লাহর শপথ! আমার কাছে খাবার কিছু থাকলে আমি আপনাদের মেহমানদারী করতে মোটেই কার্পণ্য করতামনা। সেটি ছিল অভাবের বছর। খাদ্যাভাবে উম্মে মা'বাদের বকরীগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। রসূল (ﷺ) তাঁবুর এক পার্শ্বে একটি বকরী দেখতে পেলেন। তিনি বললেন- ওহে উম্মে মা'বাদ! এই বকরীটি এখানে কেন? উম্মে মা'বাদ বলল- দুর্বলতার কারণে এটি অন্যান্য বকরীর সাথে চলতে পারেনা। তাই এটি পিছনে রয়ে গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন- বকরীটি কি দুধ দেয়? উম্মে মা'বাদ বলল- এটি দুর্বলতার কারণে চলতেই পারছেনা। দুধ আসবে কোথা হতে? তিনি বললেন- তুমি কি আমাকে এটি দোহন করার অনুমতি দিবে? সে বলল- আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি যদি তাতে কোন

দুধ দেখেন তাহলে দোহন করতে পারেন। রসূল (ﷺ) বকরীর স্তনে হাত লাগালেন, বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। দুধে বকরীর স্তন ভর্তি হয়ে গেল। তিনি পাত্র আনয়ন করতে বললেন। পাত্র আনয়ন করা হলে তাতে দুধ দোহন করলেন। পাত্র ভর্তি হয়ে দুধের ফেনা উপরে উঠতে লাগল।

রসূল (ﷺ) তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করলেন এবং তাঁর সাহাবীগণও পান করলেন। তিনি পুনরায় পান করলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি পাত্র ভর্তি করে দুধ দোহন করে উম্মে মা'বাদের তাঁবু ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ পর উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ বকরীগুলো চালিয়ে নিয়ে ফেরত আসল। তাঁবুতে দুধ দেখে আবু মা'বাদ আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল- তুমি দুধ কোথায় পেলে? বকরীগুলো খাদ্যাভাবে শুকিয়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন দুধেল ছাগলও নেই। সে বলল- আল্লাহর শপথ! আমাদের কাছ দিয়ে একজন বরকতময় লোক অতিক্রম করেছেন। তার ঘটনা ছিল এই এই। তার অবস্থা ছিল এ রকম এ রকম। আবু মা'বাদ বলল- আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা এই লোকটিকেই কুরাইশরা খুঁজছে। হে উম্মে মা'বাদ আমার কাছে তার গুণাগুণ বর্ণনা কর। সুতরাং উম্মে মাবাদ আবু মাবাদের কাছে অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দরভাবে এবং হৃদয়গ্রাহী করে রসূলের গুণাগুণ ও পরিচয় তুলে ধরল। সে বলল- উজ্জল রং, জ্বলজ্বলে মুখ, সুমধুর আচরণ এভাবে শেষ পর্যন্ত। উম্মে মা'বাদের কাছে রসূল (ﷺ) এর প্রশংসা ও গুণাবলী শুনে আবু মা'বাদ বলল- আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিই হচ্ছেন তিনি যার সম্পর্কে কুরাইশরা বলাবলি করছে এবং যাকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তাঁর সাথী হয়ে যাব। আমি যদি সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই তার সঙ্গী হব।

ঐদিকে মক্কায় উঁচু কণ্ঠে একটি কবিতা আবৃত্তির আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল, কিন্তু কে তা আবৃত্তি করছে, তাকে দেখা যাচ্ছিল না, যার প্রথম লাইন হচ্ছে,

جزى الله رب العرش خير جزائه + رفيقين حلا خيمتي أم معبد

"আরশের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দুইজন বন্ধুকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন, যারা উভয়েই উম্মে মাবাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন- আমরা জানতাম না যে রসূল (ﷺ) কোন দিকে গিয়েছেন। কিন্তু মক্কার নীচু ভূমিতে একটি জিন এসে কবিতার এই লাইনগুলো আবৃত্তি করতে

লাগল। লোকেরা সেই আওয়াজ শুনে পিছে পিছে চলা শুরু করল। তবে তারা সেই জিনকে দেখতে পাচ্ছিলনা। পরিশেষে জিন মক্কার উঁচু ভূমি দিয়ে বের হয়ে গেল। আসমা বলেন- এই কবিতা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) মদ্বীনার দিকে চলে গেছেন।

মদীনায় মুহাম্মাদ (সাঃ)

রসূল (ﷺ) মক্কা হতে মদ্বীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছেন, এ কথা আনসারগণ যথা সময়েই জানতে পেরেছেন। তারা প্রতিদিন সকালে মদ্বীনার বাইরে হাররায় তথা কালো কালো পাথর বিশিষ্ট ভূমিতে এসে দুপুর পর্যন্ত রসূল (ﷺ) এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্যের তাপ বেড়ে গেলে তারা ঘরবাড়িতে চলে যেত।

নবুওয়াতের **১৩**তম বর্ষে রবীউল আওয়াল মাসের সোমবারের দিন প্রতিদিনের অভ্যাস মোতাবেক আল্লাহর রসূলকে সম্মানিত মেহমানের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তারা মদ্বীনার বাইরে বের হলেন। এ দিনও রসূলের আগমণের অপেক্ষায় থেকে সূর্যের তাপ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তারা ফেরত গেলেন।

ঐদিকে একজন ইহুদী তার কোন প্রয়োজনে মদ্বীনার কোন একটি টিলার উপর উঠল। টিলার উপর উঠেই সে আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সাথীদেরকে আগমণ করতে দেখল। তাদের আলোকময় চেহারাগুলো চমকাচ্ছিল্ল এবং মরিচিকা তাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছিল। সেই ইহুদী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলঃ হে বনী কায়লা (আওস ও খাজরায গোত্রের লোকেরা)! এই তো তোমাদের নেতা চলে এসেছেন, যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। আনসারগণ দ্রুত অস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অগ্রসর হলেন। বনী আমর বিন আওফ গোত্রের দিক থেকে তাকবীর ধ্বনি শুনা গেল। রসূলের আগমণে মুসলিমগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকবীর পাঠ করলেন। তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য বের হয়ে পড়লেন, নবুওয়াতের মহা সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে সুন্দর সুন্দর বাক্যের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নাবীকে স্বাগত জানালেন। আনসারগণ চতুর্দিক থেকে তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন এবং তাঁর প্রতি স্বজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন। এ সময় প্রশান্তি ও স্বস্তির এক ছায়াঘন পরিবেশ তাঁকে ঢেকে রাখছিল। এ সময় তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল-

فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

‘‘(আর যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখো) আল্লাহ্‌, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফিরিস্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী’’। (সূরা তাহরীম-৬৬:৪)

অতঃপর রসূল (ﷺ) চলতে লাগলেন। কুবায় পৌঁছে তিনি বনী আমর বিন আওফ গোত্রে এসে কুলছুম বিন হাদমের নিকট অবতরণ করলেন। কেউ বলেছেন- তিনি সা’দ বিন খাইছামার বাড়িতে অবতরণ করেছিলেন। তিনি কুবাতে ১৪ দিন অবস্থান করলেন। তিনি সেখানে কুবা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন। নবুওয়াতের পর এটিই ছিল প্রথম মসজিদ। জুমআর দিন আল্লাহর অনুমতিক্রমে মদ্বীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বনী সালেম গোত্রের নিকট পৌঁছলে জুমআর সলাতের সময় হয়ে গেল। বনী সালেমের উপত্যকায় তিনি সাহাবীদের নিয়ে জুমআর সলাত আদায় করলেন। সলাতের পর তিনি আবার আরোহন করলেন। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে লোকেরা উটের লাগাম ধরে ধরে বলতে লাগল- আপনি আমাদের কাছে অবতরণ করুন। আমাদের কাছে রয়েছে সকল প্রকার প্রস্ত্ততি, রয়েছে অস্ত্র ও প্রতিরোধ ক্ষমতা। তিনি বললেন- উটনীকে যেতে দাও। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ প্রাপ্ত, তাকে ছেড়ে দাও, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করবে।

উটনীটি তাঁকে নিয়ে চলতেই থাকল। যখনই কোন আনসারীর বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখনই তারা এই কামনা করত যে, আল্লাহর রসূল তাদের কাছেই অবস্থান করুক। আর তিনি একই কথা বলতেন- উটনীকে যেতে দাও। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ প্রাপ্ত। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করবে।

উটনী চলতেই থাকল। অতঃপর আজ যেখানে রসূলের মসজিদ রয়েছে সেখানে এসে উটনী বসে পড়ল। নাবী (ﷺ) উটনীর উপরেই বসে রইলেন। উটনী পুনরায় দাঁড়াল এবং একটু অগ্রসর হল। অতঃপর আগের জায়গায় এসে পুনরায় বসে পড়ল। তিনি এবার উটনীর পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। এই স্থানেই ছিল রসূল (ﷺ) এর মামাদের বাসস্থান। আল্লাহ্‌ তা‘আলা উটনীকে সঠিক স্থান নির্ধারণের তাওফীক দিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ্‌ তা‘আলা চেয়েছিলেন যে, তাঁর রসূলের মেহমানদারীর সম্মানটি তাঁর মামাদের জন্যই অর্জিত হোক। সুতরাং তারা রসূল (ﷺ) কে তাদের বাসস্থানে অবতরণ করার আবেদন করতে লাগলেন। আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) দ্রুত সামনে এগিয়ে রসূল (ﷺ) এর ভ্রমণ সামগ্রী ও মালপত্র নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ফেললেন। রসূল (ﷺ) তখন বলতে লাগলেন- কোন লোক তাঁর সফর সামগ্রীর সাথেই চলে থাকে। ঐ দিকে

আসআদ বিন যুরারা রসূল (ﷺ) এর উটনীকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন। পরে সেটি তাঁর কাছেই ছিল।
মদ্বীনায় প্রিয় নাবীর আগমনে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। কবিতা ও ছন্দের মাধ্যমে তারা আনন্দ প্রকাশ করছিলেন।
আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন- নাবী (ﷺ) মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেছেন। অতঃপর তাঁকে হিজরত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তখন তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

"বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দাখিল কর সঠিক স্থানে এবং আমাকে বের কর সঠিক রূপে এবং দান কর আমাকে নিজের কাছ থেকে রাজকীয় সাহায্য"। (সূরা ইসরা-১৭:৮০)
বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে মক্কা থেকে মদ্বীনায় উত্তম স্থানে বের করলেন। আল্লাহর নাবী জানতেন যে, শক্তি ও সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর কাছে শক্তি ও সাহায্যকারী প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মক্কাতে অবস্থান কালেই দারুল হিজরত দেখালেন। তখন তিনি সাহাবীদেরকে বললেন- আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। তা হচ্ছে লবণাক্ত ভূমি, তাতে রয়েছে খেজুর গাছ, এবং কালো পাথর দিয়ে ঢাকা দু'টি ভূখন্ডের মাঝখানে তা অবস্থিত।
বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন- রসূল (ﷺ) এর সাহাবীদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে মুসআব বিন উমাইর এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম আগমণ করলেন। তারা উভয়েই লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে লাগলেন। অতঃপর আম্মার বিন ইয়াসির, বিলাল বিন রাবাহ এবং সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) আসলেন। তাদের পথ ধরেই ২০ জনের একটি কাফেলা নিয়ে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) আগমন করলেন। সকলের শেষে হিজরত করলেন রসূল (ﷺ)।
বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন- রসূলের আগমণে মদ্বীনাবাসীগণ যে রকম খুশী হয়েছিলেন অন্য কোন সময় তাদেরকে এত খুশী হতে দেখিনি। এমনকি নারী, শিশু

এবং দাস-দাসীদেরকেও বলতে শুনেছি, এই তো আল্লাহর রসূল আমাদের কাছে চলে এসেছেন।

আনাস (রাঃ) বলেন- রসূল (ﷺ) যেদিন মদ্বীনায় এসে পৌঁছলেন সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি যেদিন আমাদের কাছে মদ্বীনায় প্রবেশ করলেন সেদিনের চেয়ে অধিক আলোকিত ও সুন্দর দিন আর কখনও দেখিনি। আর আমি রসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর দিনও উপস্থিত ছিলাম। ঐদিনের চেয়ে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখের দিন আর কখনও দেখিনি।

অতঃপর তাঁর মসজিদ এবং বাসগৃহ নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকলেন। আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) এর বাড়িতে অবস্থান কালেই তিনি যায়েদ বিন হারেছা এবং আবু রাফে (রাঃ) কে দু'টি উটসহ এবং পাঁচশ দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তারা মক্কায় গিয়ে তাঁর কন্যা ফাতেমা, উম্মে কুলছুম, তাঁর স্ত্রী সাওদা, উসামা বিন যায়েদ এবং উসামার মাতা উম্মে আয়মান (রাঃ) কে মদ্বীনায় নিয়ে আসলেন। কিন্তু রসূল (ﷺ) এর আরেক কন্যা যায়নাব (রাঃ) আবুল আসের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সে তাঁকে আটকিয়ে রেখেছিল। ঐদিকে আবু বকর (রাঃ) এর ছেলে আব্দুল্লাহ্ আবু বকরের পরিবারের সকলকে নিয়ে বের হল। তাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) ও ছিলেন। তারা এসে হারেছা বিন নু'মানের বাড়িতে অবতরণ করলেন।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

ইমাম যুহরী বলেন- বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত সেখানে এসেই নাবী (ﷺ) এর উটনী বসে পড়েছিল। সেই স্থানেই তাঁর হিজরতের পূর্বে মুসলিমগণ সলাত আদায় করতেন। এই জায়গাটি ছিল আসআদ বিন যুরারার প্রতিপালনাধীন সাহল ও সুহাইল নামক দুইজন ইয়াতীম বালকের। তাতে সে সময় উট বাঁধা হত। নাবী (ﷺ) জায়গাটি খরীদ করে তাতে মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে কথা বললেন। বালক দু'টি বলল- বরং আমরা তা বিনা মূল্যে দান করতে চাই। কিন্তু নাবী (ﷺ) তা বিনা মূল্যে নিতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তিনি উহা দশ দ্বীনারের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন।

সে সময় মসজিদে নববীর চারটি দেয়াল ছিল। কোন ছাদ ছিলনা। কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিস। রসূল (ﷺ) এর মদ্বীনায় আগমনের পূর্বে আসআদ বিন যুরারা সেখানে মুসলিমদেরকে সলাত ও জুমআ পড়াতেন। সেখানে ছিল গারকাদ ও খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর। রসূল (ﷺ) এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলোকে উঠিয়ে ফেলা হয় এবং খেজুর ও অন্যান্য গাছগুলোকে কেটে কিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেয়া হয়। মসজিদটি কিবলার দিক থেকে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত একশ হাত লম্বা ছিল। বাকী দুই দিকেও অনুরূপ বা তার চেয়ে একটু কম ছিল। ভিত্তিমূল ছিল তিন হাত পরিমাণ। এর উপরই মুসলিমগণ তা কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী করেছেন। রসূল (ﷺ) ও তাদের সাথে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং পাথর ও ইট বহন করেছেন। এ সময় তিনি নিম্নের লাইনগুলো পাঠ করতেন-

اللَّهم لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرةْ + فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَةْ

"হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা কর"। তিনি আরও বলতেন-

هَذَا الحِمَالُ لا حِمَالُ خَيْبَر + هَـذَا أَبَـرُّ رَبَّـنَا وَأَطْهَرُ

"এগুলো খায়বার থেকে আগত খেজুর বা পণ্যের বোঝা নয়; বরং এগুলো ইটের বোঝা এবং এই কাজ আমাদের প্রভুর আনুগত্যের প্রতি ও পবিত্র জীবনের প্রতি উৎসাহ দানকারী"। সাহাবীগণও রসূল (ﷺ)-এর সাথে ইট বহন করতেন আর এই ধরণের ছন্দ পাঠ করতেন। তাদের কেউ কেউ বলতেন-

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالرَّسُولُ يَعْمل + لَـذَاكَ مِـنَّا العَمَلُ المُضَـلَّلُ

"আমরা যদি বসে থাকি, আর আল্লাহর রসূল কাজ করেন, তাহলে আমাদের জন্য হবে এটি মারাত্মক ভুল।

তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে মসজিদের কিবলা নির্ধারণ করেন। পিছনের দিকে তিনটি দরজা রাখেন। আরেকটি দরজা রাখেন, যার নাম ছিল বাবে রহমত। তৃতীয়

আরেকটি দরজা রাখেন, যা দিয়ে রসূল (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করতেন। খেজুরের কাঠ দিয়ে এর খুঁটি নির্মাণ করেন আর ছাদে খেজুর গাছের শাখা স্থাপন করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল- আপনি কি এর উপর ছাদ নির্মাণ করবেন না? তিনি বললেন- না, বরং এটি মুসা (আঃ) এর চালাঘরের ন্যায়ই থাকবে।

মসজিদে নববীর পাশেই তিনি তাঁর স্ত্রীদের ঘরও কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী করেন। খেজুরের শাখা ও কাঠ দিয়ে তার ছাদ নির্মাণ করেন। গৃহ নির্মাণ শেষে তিনি আয়িশা (রাঃ) এর সাথে সেই নব নির্মিত ঘরে বাসর করেন, যেটি তিনি মসজিদে নববীর পূর্ব প্রান্তে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সাওদার জন্য আরেকটি গৃহ নির্মাণ করেন।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা

অতঃপর নাবী (ﷺ) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৯০ জন। তাদের অর্ধেক ছিলেন মুহাজির ও বাকী অর্ধেক ছিলেন আনসার। পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও মৃত্যুর পরে তারা একে অন্যের সম্পদের ওয়ারিছ হতেন। বদরের যুদ্ধের ঘটনা পর্যন্ত এই নিয়ম বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল-

وَأُوْلُوْا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللهِ

‘‘বস্ত্ততঃ আত্মীয়দের কতক কতকের চেয়ে আল্লাহর বিধান মতে অধিক হকদার’’। (সূরা আনফাল-৮:৭৫) তখন থেকে মৃত্যুর পর ওয়ারিছ হওয়ার বিষয়টি শুধু আত্মীয়দের মাঝেই সীমিত হয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন- দ্বিতীয়বার তিনি শুধু মুহাজিরদের কতকের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেন। এইবার তিনি আলীকে নিজের ভাই বানিয়ে নিলেন। কিন্তু প্রথম বার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনার ঘটনাটিই প্রমাণিত। দ্বিতীয়বার তিনি যদি কাউকে ভাই বানাতেন তাহলে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু, হিজরতের ও গারে ছাওরের সাথী এবং সর্বোত্তম সাহাবী আবু বকরই তাঁর ভাই হওয়ার অধিক হকদার হতেন। তাঁর ব্যাপারে রসূল (ﷺ) বলেছেন-

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاتخَّذْتُ أَبَا بَكْر خَلِيلاً وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبِى

‘‘আমি যদি যমীনের কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম। কিন্তু সে আমার ভাই ও সাথী’’। এটি ইসলামের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব হলেও আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। যেমন ছিলেন তিনি সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। রসূল (ﷺ) বলেন- আমার আগ্রহ হয় যে আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন- তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাই হচ্ছে এমন ব্যক্তিগণ, যারা আমার পরে আসবে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। তারা এখনও আমাকে দেখেনি।

মুহাজির ভাইদের জন্য আনছারগণের সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যার মাধ্যমে বংশ, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা প্রভৃতি আরবের চিরাচরিত বন্ধন সমূহের উপরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক নবতর এক জাতীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়। যা পরবর্তীতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার ভিত্তিক ইসলামী খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তি। উপ্ত হয় প্রকৃত অর্থে এক অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক ইসলামী সমাজের বীজ।

‘আল্লাহর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান’- এই মহান সাম্যের বাণী ও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখে আজীবন মানুষের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ মযলূম জনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিগৃহীত ও শোষিত মানবতা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় সর্বোত্তমরূপে বিকশিত মানবতা মদীনার আদি বাসিন্দাদের চমকিত করল। যা তাদের স্বার্থান্ধ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নোংরা দুনিয়াপূজা হ’তে মুখ ফিরিয়ে আখেরাতমুখী মানুষের বিজয় মিছিল এগিয়ে চলল। কাফির-মুশরিক, ইহূদী-নাছারা ও মুনাফিকদের যাবতীয় অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফত। যা কয়েক বছরের মধ্যেই তৎকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তিকে দমিত করে অপরাজেয় বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভূত হ’ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

বস্তুতঃ আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যদি এইরূপ নিখাদ ভালবাসা ও ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি না হ’ত এবং স্থানীয় ও বহিরাগত দ্বন্দ্বের ফাটল দেখা দিত, তাহ’লে মদীনায় মুসলমানদের উঠতি শক্তি অংকুরেই বিনাশ হয়ে যেত। পরিণামে তাদেরকে চিরকাল ইহূদীদের শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হ’তে হ’ত। যেভাবে ইতিপূর্বে মক্কায় কুরায়েশ নেতাদের হাতে তারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

যুদ্ধের অনুমতি

কুরায়েশদের সন্ত্রাসমূলক অপতৎপরতা ও প্রকাশ্য হামলাসমূহ মুকাবিলার জন্য মুসলমানদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ইতিপূর্বে হিজরতকালে সূরা হজ্জ ৩৯ ও ৪০ আয়াত নাযিল হয়, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এটাই প্রথম আয়াত, যা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে হিজরতকালে নাযিল হয়।আর জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ থেকে যুলুম ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। যা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ তালূত কর্তৃক অত্যাচারী বাদশাহ জালূতের ধ্বংস প্রসঙ্গে বলেন,

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

'যদি আল্লাহ একজনকে আরেকজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই করুণাময়' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

যুদ্ধের অনুমতি দানের কারণ সমূহ

মদীনায় হিজরতের পর সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দানের কারণ ছিল তিনটি।-

(১) মুসলমানেরা ছিল মযলূম এবং হামলাকারীরা ছিল যালেম।

(২) মুহাজিরগণ ছিলেন নিজেদের জন্মস্থান ও আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত এবং তাদের মাল-সম্পদ ছিল লুণ্ঠিত। তারা ছিলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত, স্রেফ তাওহীদী আক্বীদার কারণে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে নয় *(হজ্জ ২২/৪০)*।

(৩) মদীনা ও আশপাশের গোত্রসমূহের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধি চুক্তি ছিল। যাতে পরস্পরের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। এক্ষণে মুসলমান হওয়ার কারণে অথবা মুসলমানদের সহযোগী হওয়ার কারণে যদি তাদের উপরে হামলা করা হয়, তাহ'লে সন্ধিচুক্তি রক্ষার স্বার্থে তাদের জান-মালের হেফাযতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে যালেমদের হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়াটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল।

জিহাদের অনুমতি লাভের পর ১ম হিজরীর রামাযান মাস থেকে কুরায়েশদের হামলা প্রতিরোধে মদীনার বাইরে নিয়মিত সশস্ত্র টহল অভিযান সমূহ প্রেরিত হ'তে থাকে। অতঃপর ২য় হিজরীর রজব মাসে নাখলা যুদ্ধের পর বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে নিয়মিতভাবে

জিহাদ ফরয করা হয় এবং উক্ত মর্মে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ এবং সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

অভিযান ও যুদ্ধ সমূহ

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের পর কুরায়েশ বাহিনীর মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী রাস্তাগুলিতে নিয়মিত টহল অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় বাইরের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর কৃত সন্ধি চুক্তিসমূহ খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। যার এলাকাসমূহ মদীনা হ'তে মক্কার দিকে তিন মনযিল অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব অভিযানের যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন, সেগুলিকে 'গাযওয়াহ' (غَزْوَةٌ) এবং যেগুলিতে নিজে যেতেন না, বরং অন্যদের পাঠাতেন, সেগুলিকে সারিইয়াহ (سَرِيَّةٌ) বলা হয়। এইসব অভিযানে যুদ্ধ প্রস্ততি নিয়ে বের হ'লেও বলতে গেলে কোনটাতেই যুদ্ধ হয়নি। তবে মক্কায় খবর হয়ে গিয়েছিল যে, কুরায়েশদের হুমকিতে মুহাজিরগণ ভীত নন, বরং তারা সদা প্রস্তুত।

উল্লেখ্য যে, সকল অভিযানেই পতাকা থাকতো সাদা রংয়ের এবং পতাকাবাহী সেনাপতি থাকতেন পৃথক ব্যক্তি। এক্ষণে এই সময়ের মধ্যে প্রেরিত অভিযান সমূহ বিবৃত হ'ল, যা নিম্নরূপ।-

১. সারিইয়া সায়ফুল বাহর (سرية سيف البحر) বা সমুদ্রোপকূলে প্রেরিত বাহিনী: ১ম হিজরী সনের রামাযান মাস (মার্চ ৬২৩ খৃ.)। হযরত হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয় সিরিয়া হ'তে আবু জাহলের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০০ সদস্যের কুরায়েশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। উভয় বাহিনী মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈছ' (العِيْص) নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদী বিন আমর, যিনি ছিলেন উভয় দলের মিত্র, তাঁর কারণে যুদ্ধ হয়নি। এ যুদ্ধে পতাকা বাহক ছিলেন আবু মারছাদ আল-গানাভী (রাঃ)।

২. সারিইয়া রাবেগ (سرية رابغ) : ১ম হিজরীর শাওয়াল মাস। ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ বিন মুত্ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। মদীনা থেকে দক্ষিণে এবং জেদ্দা থেকে ১৪০ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত 'রাবেগ' অঞ্চলটি বর্তমানে মক্কা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই অভিযানে রাবেগ উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০

জনের এক বাহিনীর মুখোমুখি হ’লে উভয় পক্ষে কিছু তীর নিক্ষেপ ব্যতীত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে মাক্কী বাহিনী থেকে দু’জন দল ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনীতে চলে আসেন। যারা গোপনে মুসলমান ছিলেন। যাদের একজন হ’লেন মিক্বদাদ বিন ‘আমর এবং অন্যজন হ’লেন উৎবাহ বিন গাযওয়ান। এই যুদ্ধে হযরত সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) কাফেরদের প্রতি সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। সেকারণ তিনি أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ الله ‘আরবদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপকারী’ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[2] রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো‘আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَه ‘হে আল্লাহ! তুমি তার তীরকে লক্ষ্যভেদী কর এবং তার দো‘আ কবুল কর’।[3] এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিসত্বাহ বিন আছাছাহ বিন মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

৩. সারিইয়া খাররার (سرية الخرّار) **:** ১ম হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাস। সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০ জনের এই মুহাজির দল প্রেরিত হয় কুরায়েশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তারা জুহফার নিকটবর্তী ‘খাররার’ উপত্যকা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। কেননা মক্কার কাফেলা এখান থেকে একদিন আগেই চলে গিয়েছিল। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিক্বদাদ বিন ‘আমর (রাঃ)।[5]

৪. গাযওয়া ওয়াদ্দান (غزوة ودّان أو الأبواء) **:** ২য় হিজরীর ছফর মাস (আগষ্ট ৬২৩ খৃঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম এই অভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দেন, যাতে ৭০ জন মুহাজির ছিলেন। মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণে এই অভিযানে তিনি ১৫ দিন মদীনার বাইরে ছিলেন এবং যাওয়ার সময় খাযরাজ নেতা সা‘দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলার পথ রোধ করা। কিন্তু বাস্তবে তাদের দেখা মেলেনি। তবে এই সফরে লাভ হয় এই যে, তিনি স্থানীয় বনু যামরাহ (بَنُو ضَمْرَةَ) গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন (ইবনু হিশাম ১/৫৯১)। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

৫. গাযওয়া বুওয়াত্ব (غزوة بواط) **:** ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস (সেপ্টেম্বর ৬২৩ খৃঃ)। ২০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এ অভিযানে বের হন। মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০ কি.মি. দূরে এটি অবস্থিত। উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে ১০০ জনের কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন সংঘর্ষ হয়নি। এই অভিযানে বের হওয়ার সময় তিনি আউস নেতা সা‘দ

বিন মু‘আয (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্কাছ (রাঃ)।[7]

৬. গাযওয়া সাফওয়ান(غزوة سفوان**) :** একই মাসে মক্কার নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী মদীনার চারণভূমি থেকে গবাদিপশু লুট করে নিয়ে গেলে ৭০ জন ছাহাবীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু লুটেরাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এই অভিযানকে অনেকে গাযওয়া বদরে ঊলা(غَزْوَةُ بَدْرٍ الْأُوْلَى) বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় মদীনার আমীর ছিলেন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল মদীনার উপকণ্ঠে কুরায়েশদের প্রথম হামলা। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রাঃ)।

৭. গাযওয়া যুল-‘উশাইরাহ (غزوة ذى العُشيرة**) :** ২য় হিজরীর জুমাদাল ঊলা ও আখেরাহ মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস। ১৫০ বা ২০০ ছাহাবীর একটি দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি মূল্যবান রসদবাহী কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধে বের হন। কিন্তু ইয়াম্বু‘-এর পার্শ্ববর্তী যুল-‘উশায়রা পর্যন্ত গিয়েও তাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এ সময় মদীনার আমীর ছিলেন আবু সালামাহ (রাঃ)। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এই কুরায়েশ কাফেলাটি বহাল তবিয়তে মক্কায় ফিরে যায় এবং এর ফলেই বদর যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হয়। এই অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্রদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।[9]

৮. সারিইয়া নাখলা (سرية نخلة**) :** ২য় হিজরীর রজব মাস (জানুয়ারী ৬২৪ খৃঃ)। আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে ৮ বা ১২ জন মুহাজির ছাহাবীর একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধে প্রেরণের সময় রাসূল (ছাঃ) তার হাতে একটি পত্র দেন এবং বলেন, দু’দিন পথ চলার আগ পর্যন্ত যেন পত্রটি না খোলা হয়। দু’দিন চলার পর তিনি পত্র খোলেন এবং পাঠ করার পর সবাইকে বলেন, আমাদেরকে ত্বায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী নাখলায় অবতরণ করতে বলা হয়েছে এবং সেখানে গিয়ে কুরায়েশ কাফেলার অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে। অতএব যিনি শহীদ হ’তে চান কেবল তিনিই আমার সাথে যাবেন। অথবা ইচ্ছা করলে ফিরে যাবেন। এ ব্যাপারে আমি কাউকে চাপ দিব না তবে আমি যেতে প্রস্তুত’। তখন সাথী মুহাজিরগণের সবাই তাঁর সঙ্গে থাকলেন, কেউই ফিরে আসলেন না। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্যে ছিলেন আমীর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ

ছাড়াও সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্কাছ, আবু হুযায়ফা বিন উৎবা বিন রাবী‘আহ, উক্কাশা বিন মিহছান, উৎবা বিন গাযওয়ান, ওয়াক্বিদ বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন বুকাইর ও সোহায়েল বিন বায়যা’ প্রমুখ (ইবনু হিশাম ১/৬০১-০২)।

অতঃপর তাঁরা নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে একটি কুরায়েশ কাফেলাকে আক্রমণ করেন ও তাদের নেতা আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করে দু’জন বন্দী সহ গণীমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গণীমত লাভ এবং প্রথম নিহত হওয়ার ঘটনা ও প্রথম দু’ব্যক্তি বন্দী হওয়ার ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে রজব মাসের শেষ দিনে। কেননা তারা দেখলেন যদি আমরা যুদ্ধ না করি, তাহ’লে শত্রু পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্দীদের মুক্তি দেন ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তমূল্য দেন। এ সময় মুসলমানেরা হারাম মাসের বিধান লংঘন করেছে বলে মুশরিকদের রটনার জবাবে সূরা বাক্বারাহ ২১৭ আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে বলা হয়,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

‘লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে নিষিদ্ধ মাস ও তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। তুমি বল, এ মাসে যুদ্ধ করা মহাপাপ। তবে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা ও তাঁর সাথে কুফরী করা এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া ও তার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকটে আরও বড় পাপ। আর ফিৎনা (কুফরী) করা যুদ্ধ করার চাইতে বড় পাপ। বস্ত্তঃ যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানেই চিরকাল থাকবে’ (বাক্বারাহ ২/২১৭)।[10] অর্থাৎ মুসলমানদের এই কাজের তুলনায় মুশরিকদের অপকর্মসমূহ ছিল বহু গুণ বেশী অপরাধজনক। এই যুদ্ধে নিহতের বদলা নিতেই আবু জাহল বদরে যুদ্ধ করতে এসেছিল। এই অভিযান শেষে শা‘বান

মাসে মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরয হয় (বাক্বারাহ ২/১৯০-৯৩; মুহাম্মাদ ৪৭/৪-৭, ২০)।

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা

মদ্বীনায় হিজরতের পর তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করেই সলাত আদায় করতেন। তিনি জিবরীল (আঃ) কে বলেছিলেন- আমার আশা, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার চেহারা ইহুদীদের কিবলা হতে ফিরিয়ে দেন। জিবরীল বললেন- আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। আপনি আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন এবং তাঁর কাছেই বিষয়টি বলুন। তিনি কিবলা পরিবর্তনের আশায় আকাশের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন।নাখলা অভিযান শেষ হবার পর ২য় হিজরীর শা'বান মাসে (ফেব্রুয়ারী ৬২৪ খৃ.) ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ সূচক আয়াতটি *নাযিল করলেন-*

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে তুমি পছন্দ কর। এখন তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকেই মুখ কর"। (সূরা বাকারা-২:১৪৪)

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা আগমনের ১৮ মাস পর শা'বান মাসে কিবলা পরিবর্তন হয়।

এই হুকুম নাযিলের মাধ্যমে কপট ইহূদীদের মুখোশ খুলে যায়। যারা মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়েছিল স্রেফ ফাটল ধরানো ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য। এখন তারা তাদের নিজস্ব অবস্থানে ফিরে গেল এবং মুসলমানেরাও তাদের কপটতা ও খেয়ানত থেকে বেঁচে গেল। একই সময়ে রামাযানের ছিয়াম ও যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়।

বদরের যুদ্ধ

বিগত অভিযানগুলির ন্যায় এ অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলাকে আটকানো। তাই অন্যান্য অভিযানের মতই এটাকে ভাবা হয়েছিল। ফলে কেউ যোগ দিয়েছিল, কেউ দেয়নি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে অভিযানে যেতে বাধ্য করেননি।

অবশেষে ৮ই রামাযান সোমবার অথবা ১২ই রামাযান শনিবার ৩১৩, ১৪ বা ১৭ জনের একটি কাফেলা নিয়ে সাধারণ প্রস্তুতি সহ তিনি রওয়ানা হ'লেন। যার মধ্যে ৮২, ৮৩ অথবা ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং বাকীগণ ছিলেন আনছার। আনছারগণের মধ্যে ৬১ জন ছিলেন আউস এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের।[1] বি'রে সুক্বইয়া নামক স্থানে এসে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ক্বায়েস বিন আবু ছা'ছা'আহকে সংখ্যা গণনা করতে বললেন। পরে সংখ্যা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, তালূতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল'।[2] তিন শতাধিক লোকের এই বাহিনীতে মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম ও মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদের এবং ৭০টি উট ছিল। যাতে দু'তিন জন করে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে চলতে হ'ত। রাসূল (ছাঃ), আলী ও আবু লুবাবাহ এবং পরবর্তীতে তার বদলে মারছাদ বিন আবু মারছাদ গানাভীর জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিল। যাতে পায়ে হাঁটার পালা আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজেও হাঁটতেন। এ সময় মদীনার আমীর নিযুক্ত হন অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)।

আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার নিরাপদে নিষ্ক্রমন এবং আবু জাহলের নেতৃত্বে মাক্কী বাহিনীর দ্রুত ধেয়ে আসা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাফরানে (ذَفِرَان) অবস্থানকালেই অবহিত হন। এই অনাকাংখিত পরিস্থিতি এবং অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মুকাবিলা কিভাবে করা যায়, এ নিয়ে তিনি মদীনা থেকে ৬৮ কি. মি. দক্ষিণে 'রাওহা' (الرَّوْحَاء)-তে অবতরণ করে উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শ বৈঠক আহবান করলেন' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ৭ আয়াত)*। কেননা তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা থেকে বের হননি।

মুহাজিরগণের মধ্যে হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করলেন। অতঃপর মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، امْضِ لِمَا أَرَاكَ اللهُ فَنَحْنُ مَعَكَ، واللهِ لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর দেখানো পথে আপনি এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে ঐরূপ বলব না, যেরূপ বনু ইস্রাঈল

তাদের নবী মূসাকে বলেছিল যে, ‘তুমি ও তোমার রব যাও গিয়ে যুদ্ধ কর! আমরা এখানে বসে রইলাম’ *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। বরং আমরা বলব,

اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُون َ

‘আপনি ও আপনার রব যান ও যুদ্ধ করুন, আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধরত থাকব’।

فَوَ الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بِرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَه ُ

‘সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে ‘বারকুল গিমাদ’[1] পর্যন্ত চলে যান, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাব’। মিক্বদাদের এই জোরালো বক্তব্য শুনে আললাহর রাসূল (ছাঃ) খুবই প্রীত হ’লেন এবং তার জন্য কল্যাণের দো‘আ করলেন’(دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ)।

সংখ্যালঘু মুহাজিরগণের উপরোক্ত তিন নেতার বক্তব্য শোনার পর সংখ্যাগুরু আনছারদের পরামর্শ চাইলে আউস গোত্রের নেতা সা‘দ বিন মু‘আয (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হয়ত আশংকা করছেন যে, আমাদের সঙ্গে আপনার চুক্তি অনুযায়ী আনছারগণ কেবল (মদীনা) শহরে অবস্থান করেই আপনাদের সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে। জেনে রাখুন, আমি আনছারদের পক্ষ থেকেই বলছি, যেখানে চান সেখানে আপনি আমাদের নিয়ে চলুন। যার সঙ্গে চান আপনি সন্ধি করুন বা ছিন্ন করুন- সর্বাবস্থায় আমরা আপনার সাথে আছি। যদি আপনি অগ্রসর হয়ে ‘বারকুল গিমাদ’ পর্যন্ত চলে যান, তবুও আমরা আপনার সাথেই থাকব। لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَك ‘যদি আমাদেরকে নিয়ে আপনি এই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব’। مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ الله ‘আমাদের একজন লোকও পিছিয়ে থাকবে না। অতএব আপনি আমাদের নিয়ে আল্লাহর নামে এগিয়ে চলুন’। সা‘দের উক্ত কথা শুনে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খুবই খুশী হ’লেন ও উদ্দীপিত হয়ে বললেন, سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ واللهِ لَكَأَنِّي الْآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْم ‘আল্লাহর রহমতের উপর তোমরা বেরিয়ে পড়ো এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা‘আলা আমাকে দু’টি

দলের কোন একটির বিজয় সম্পর্কে ওয়াদা দান করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি এখন ওদের বধ্যভূমিগুলো দেখতে পাচ্ছি'।
একথাটি কুরআনে এসেছে এভাবে,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ- (الأنفال ٨-٧)

'আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে। আর তোমরা কামনা করছিলে যে, যাতে কোনরূপ কণ্টক নেই, সেটাই তোমাদের ভাগে আসুক (অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে তোমরা জয়ী হও)। অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে (প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে) সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিতে'। 'যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপাচারীরা এটাকে অপছন্দ করে' *(আনফাল ৮/৭-৮)*।
পরামর্শ সভায় যুদ্ধে অগ্রগমনের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আবু লুবাবাহ ইবনু আব্দিল মুনযিরকে 'আমীর' নিযুক্ত করে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হয়। অতঃপর কাফেলার মূল পতাকা বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয় মদীনায় প্রথম দাঈ মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ)-কে। ইতিপূর্বেকার সকল পতাকার ন্যায় আজকের এ পতাকাও ছিল শ্বেত বর্ণের। ডান বাহুর সেনাপতি নিযুক্ত হন যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম এবং বাম বাহুর জন্য মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)। পুরা বাহিনীতে এ দু'জনেরই মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল। পশ্চাদ্ভাগের সেনাপতি নিযুক্ত হন ক্বায়েস বিন আবু ছা'ছা'আহ (রাঃ)। এতদ্ব্যতীত মুহাজিরগণের পতাকা বাহক হন আলী (রাঃ) এবং আনছারগণের সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) অথবা হুবাব ইবনুল মুনযির। উভয় পতাকাই ছিল কালো রংয়ের। আর সার্বিক কম্যান্ডের দায়িত্বে থাকেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

মাক্কী বাহিনীর অগ্রযাত্রা

আবু সুফিয়ানের প্রথম পত্র পেয়ে বাণিজ্য কাফেলা উদ্ধারের জন্য ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবু জাহলের নেতৃত্বে ১৩০০ মাক্কী ফৌজ রওয়ানা

হয়ে যায়। অতঃপর রাবেগ-এর পূর্ব দিকে জুহফা নামক স্থানে পৌঁছলে পত্রবাহকের মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে বাহিনীর সবাই মক্কায় ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু আবু জাহলের দম্ভের সামনে কারু মতামত গ্রাহ্য হ'ল না। তবু তার আদেশ অমান্য করে আখনাস বিন শারীক্ব আছ-ছাক্বাফী(الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيق الثَّقَفِي)-এর নেতৃত্বে বনু যোহরা(بَنُو زُهْرَةَ) গোত্রের ৩০০ লোক মক্কায় ফিরে গেল। আখনাস ছিলেন ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি ছিলেন বনু যোহরা গোত্রের মিত্র ও নেতা। তাঁর এই দূরদর্শিতার কারণে তিনি উক্ত গোত্রে আজীবন সম্মানিত নেতা হিসাবে বরিত ছিলেন। বনু হাশেমও ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু মুহাম্মাদ-এর স্বগোত্র হওয়ায় তাদের উপরে আবু জাহলের কঠোরতা ছিল অন্যদের চেয়ে বেশী। ফলে তারা ক্ষান্ত হন।

উল্লেখ্য যে, আলী (রাঃ)-এর বড় ভাই ত্বালিব বিন আবু ত্বালিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও জনৈক কুরায়েশ নেতার সাথে বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে মক্কায় ফিরে যান *(ইবনু হিশাম ১/৬১৯)*।

অতঃপর আবু জাহল বদর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং দর্পভরে বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা বদরে যাব ও সেখানে তিনদিন থাকব ও আমোদ-ফূর্তি করে পান ভোজন করব। এর ফলে সমগ্র আরব জাতির উপরে আমাদের শক্তি প্রকাশিত হবে ও সকলে ভীত হবে। এই সময় সব মিলিয়ে মাক্কী বাহিনীতে এক হাযার ফৌজ ছিল। তন্মধ্যে দু'শো অশ্বারোহী, ছয়শো লৌহবর্ম ধারী এবং গায়িকা বাঁদী দল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদি সহ ছিল। প্রতি মনযিলে খাদ্যের জন্য তারা ৯টি বা ১০টি করে উট যবেহ করত।

উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলায় সকল গোত্রের লোকদের মালামাল ছিল। তাছাড়া মাক্কী বাহিনীতে বনু 'আদী ব্যতীত কুরায়েশদের সকল গোত্রের লোক বা তাদের প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। অথবা যোগদানে বাধ্য করা হয়েছিল। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আববাস, হযরত আলীর দু'ভাই ত্বালেব ও 'আক্বীল। রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা আবুল 'আছ সহ বনু হাশেমের লোকেরা। তারা আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। নেতাদের মধ্যে কেবল আবু লাহাব যাননি। তিনি তার বদলে তার কাছে ঋণগ্রস্ত একজন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন।

আবু জাহল মক্কা থেকে রওয়ানার সময় দলবল নিয়ে কা'বাগৃহের গেলাফ ধরে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিল,

اللَّهُمَّ انْصُرْ أَقْرَانَا لِلضَّيْفِ وَأَوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ وَأَفَكَّنَا لِلْعَانِيْ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَى حَقٍّ فَانْصُرْهُ وَإِنْ كُنَّا عَلَى حَقٍّ فَانْصُرْنَا، وَرُوِيَ اَنَّهُمْ قَالُوْا : اللهُمَّ انْصُرْ أَعْلَى الْجُنْدَيْنِ وَأَهْدَى الْفِئَتَيْنِ وَاَكْرَمَ الْحِزْبَيْنِ

'হে আল্লাহ! তুমি সাহায্য কর আমাদের মধ্যেকার সর্বাধিক অতিথি আপ্যায়নকারী, সর্বাধিক আত্মীয়তা রক্ষাকারী ও বন্দী মুক্তি দানকারী দলকে'। 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ যদি সত্যের উপরে থাকে, তবে তুমি তাকে সাহায্য কর। আর যদি আমরা সত্যের উপর থাকি, তবে আমাদেরকে সাহায্য কর'। 'হে আল্লাহ! তুমি সাহায্য কর আমাদের দু'দলের মধ্যকার সেরা সেনাদলকে, সেরা হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সেরা সম্মানিত দলকে'।
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবু জাহল আল্লাহকে সর্বশক্তিমান হিসাবে বিশ্বাস করত। যাকে 'তওহীদে রুবূবিয়াত' বলা হয়। এর ফলে কেউ মুসলমান হ'তে পারে না। কেননা মুসলিম হওয়ার জন্য 'তওহীদে ইবাদত'-এর উপর ঈমান আনা যরূরী। যার মাধ্যমে মানুষ সার্বিক জীবনে আল্লাহর দাসত্ব করতে স্বীকৃত হয়। সেই সাথে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান ও তাঁর আনীত শরী'আতের বিধানসমূহ পালন করা অপরিহার্য। অতঃপর রওয়ানা হওয়ার সময় তাদের মনে পড়ল বনু বকর গোত্রের কথা। যাদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা ছিল। পথিমধ্যে তারা হামলা করতে পারে। ফলে মাক্কী বাহিনী দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় গর্বোদ্ধত হয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের ঘর (মক্কা) থেকে বের হয়েছিল দর্পভরে ও লোক দেখিয়ে এবং যারা আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বাধা দিত। অথচ আল্লাহ তাদের সকল কাজ পরিবেষ্টন করে আছেন' *(আনফাল ৮/৪৭)*। এভাবে শয়তান মানুষের অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করে। যাতে তার স্বাভাবিক বোধশক্তি লুপ্ত হয় এবং সে পথভ্রষ্ট হয়। যেমন বদরের যুদ্ধে শয়তানের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَاب

‘আর যখন শয়তান (বদরের দিন) কাফেরদের নিকট তাদের কাজগুলিকে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল আজ লোকদের মধ্যে তোমাদের উপর বিজয়ী হবার মত কেউ নেই। আর আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন দু’দল মুখোমুখী হ’ল, তখন সে পিছন ফিরে পালালো এবং বলল, আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখোনি। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা’ *(আনফাল ৮/৪৮)*।

শয়তানের দোসর মুনাফিকদের সম্পর্কেও আল্লাহ অনুরূপ বলেন, إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيم ‘যেদিন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলেছিল, এদের দ্বীন এদেরকে (মুসলমানদেরকে) প্রতারিত করেছে (অর্থাৎ ধর্মান্ধ করেছে)। অথচ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে (আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট)। কেননা আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(আনফাল ৮/৪৯)*। অতঃপর মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের চিরন্তন রীতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

‘(মুনাফিকরা) শয়তানের মত। যে মানুষকে কাফের হ’তে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি’। ‘অতঃপর উভয়ের পরিণতি হয় এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আর এটাই হ’ল যালেমদের শাস্তি’ *(হাশর ৫৯/১৬-১৭)*।[2] বস্ত্ততঃ আবু জাহল শয়তানের ধোঁকায় পড়েই রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিল। অতঃপর কুরায়েশ বাহিনী যথারীতি দ্রুতবেগে এসে বদর উপত্যকার শেষপ্রান্তে টিলার অপর পার্শ্বে শিবির সন্নিবেশ করে।

মুসলিম বাহিনী সারিবদ্ধ হ’ল

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের বাহিনীকে দ্রুত প্রস্ত্তত ও সারিবদ্ধ করে ফেললেন। এরি মধ্যে জনৈক সাউয়াদ ইবনু গাযিইয়াহ(سَوَّادُ بنُ غَزِيَّةَ) সারি থেকে কিছুটা আগে বেড়ে এল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পেটে তীর দিয়ে টোকা মেরে পিছিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, اسْتَوِ يَا سَوَّاد ‘সমান হয়ে যাও হে সাউয়াদ!’ সাথে সাথে সে বলে উঠলো, হে

আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বদলা দিন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন নিজের পেট আলগা করে দেন ও বদলা নিতে বলেন। তখন সে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে পেটে চুমু খেতে লাগলো'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, কিজন্য তুমি এরূপ করলে? সে বলল, আমাদের সামনে যে অবস্থা আসছে তাতো আপনি দেখছেন। সেজন্য আমি চেয়েছিলাম যে, আপনার সাথে আমার শেষ আদান-প্রদান যেন এটাই হয় যে, আমার দেহচর্ম আপনার দেহচর্মকে স্পর্শ করুক'। তার এ মর্মস্পর্শী কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন(دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ)।[1] রাসূল (ছাঃ)-এর এ কাজের মধ্যে মানবিক সাম্যের এক উত্তম নমুনা রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে এক ঈর্ষণীয় বিষয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, চূড়ান্ত নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না। ব্যাপকহারে তীরবৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কেউ তীর ছুঁড়বে না এবং তোমাদের উপরে তরবারি ছেয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তরবারি চালাবে না'। তিনি আরও বলেন, বনু হাশেমকে জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। তাদের সাথে আমাদের কোন যুদ্ধ নয়। অতএব তাদের কোন ব্যক্তি সামনে পড়ে গেলে তাকে যেন কেউ আঘাত না করে। আববাসকে যেন হত্যা না করা হয়। অনুরূপভাবে আবুল বাখতারী বিন হেশামকেও হত্যা করো না। কেননা এরা মক্কায় আমাদের কোনরূপ কষ্ট দিত না। বরং সাহায্যকারী ছিল।

উল্লেখ্য যে, বনু হাশিমের বিরুদ্ধে কুরায়েশদের বয়কটনামা যারা ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাদের একজন ছিলেন আবুল বাখতারী। কিন্তু যুদ্ধে আবুল বাখতারী নিহত হয়েছিলেন তার নিজস্ব হঠকারিতার জন্য। তিনি তার সঙ্গী কাফের বন্ধুকে ছাড়তে চাননি। ফলে যুদ্ধে তারা উভয়ে নিহত হয়।[2] অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) টিলার উপরে সামিয়ানার নীচে নিজ স্থানে চলে যান।

যুদ্ধ শুরু

২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার সকালে যুদ্ধ শুরু হয় (*ইবনু হিশাম ১/৬২৬*)। ইতিমধ্যে কুরায়েশ পক্ষের জনৈক হঠকারী আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ আল-মাখযূমী দৌড়ে এসে বলল, আমি এই হাউয থেকে পানি পান করব অথবা একে ভেঙ্গে ফেলব অথবা এখানেই মরব'। তখন হামযা (রাঃ) এসে তার পায়ে আঘাত করলেন।

এমতাবস্থায় সে পা ঘেঁষতে ঘেঁষতে হাউযের দিকে এগোতে লাগল। হামযা তাকে দ্বিতীয় বার আঘাত করলে সে হাউযেই মরে পড়ল ও তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ’ল। এরপর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী কুরায়েশ পক্ষ মুসলিম পক্ষের বীর যোদ্ধাদের দ্বৈতযুদ্ধে আহবান করল। তাদের একই পরিবারের তিনজন সেরা অশ্বারোহী বীর উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী‘আহ এবং অলীদ বিন উৎবা এগিয়ে এল। জবাবে মুসলিম পক্ষ হ’তে মু‘আয ও মু‘আবিবয বিন ‘আফরা কিশোর দুই ভাই এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাসহ তিনজন আনছার তরুণ বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কুরায়েশ পক্ষ বলে উঠলো হে মুহাম্মাদ! আমাদের স্বগোত্রীয় সমকক্ষদের পাঠাও’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে ওবায়দাহ, হে হামযাহ, হে আলী তোমরা যাও। অতঃপর আলী তার প্রতিপক্ষ অলীদ বিন উৎবাহকে, হামযাহ তার প্রতিপক্ষ শায়বাহ বিন রাবী‘আহকে এক নিমিষেই খতম করে ফেললেন। ওদিকে বৃদ্ধ ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ তার প্রতিপক্ষ উৎবা বিন রাবী‘আহর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হ’লেন। তখন আলী ও হামযাহ তার সাহায্যে এগিয়ে এসে উৎবাহকে শেষ করে দেন ও ওবায়দাহকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় ফেরার পথে ৪র্থ বা ৫ম দিন ওবায়দাহ শাহাদাত বরণ করেন।[1]

প্রথম আঘাতেই সেরা তিনজন বীর যোদ্ধা ও গোত্র নেতাকে হারিয়ে কুরায়েশ পক্ষ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় রাসূল (ছাঃ) শত্রুদের যথাসম্ভব দূরে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُم ‘যখন তারা তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর এবং এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা কর’ *(বুখারী হা/৩৯৮৪)*। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালু হাতে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, شَاهَتْ الْوُجُوه ‘চেহারাগুলো বিকৃত হৌক’। ফলে শত্রুবাহিনীর মুশরিকদের এমন কেউ থাকলো না, যার চোখে ঐ বালু প্রবেশ করেনি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য। তাই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى ‘তুমি যখন বালু নিক্ষেপ করেছিলে, প্রকৃতপক্ষে তা তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন’।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর একটি মু‘জেযা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা তিনি হোনায়েন যুদ্ধেও করেছিলেন।[3] ফারসী কবি বলেন,

محمد عربی کابروئے ہر دو سراست
کسے کہ خاك درش نیست خاك برسرأو

‘মুহাম্মাদ আরাবী হ’লেন দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদার উৎস। কেউ যদি তার পায়ের ধূলা হ’তে না পারে, তার মাথা ধূলি ধূসরিত হৌক!’

মুসলিম নামধারী একদল মুশরিক মা‘রেফতী পীর-ফকীর এই ঘটনা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে এবং তারা নিজেদেরকে ‘আল্লাহর অংশ’ বলে থাকে। তাদের দাবী, ‘যত কল্লা তত আল্লা’। তারা সূতায় অথবা পাতায় ফুঁক দিলে এবং তা দেহে বাঁধলে বা পকেটে রাখলে শত্রু তাকে দেখতে পাবে না বলে মিথ্যা ধারণা প্রচার করে। এভাবে তারা সরলমনা ও ভক্ত জনগণের ঈমান নষ্ট করে ও সেই সাথে ভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের পকেট ছাফ করে।

বালু নিক্ষেপের পর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বাহিনীকে নির্দেশ দেন, قُوْمُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض ‘তোমরা এগিয়ে চলো জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত’ *(মুসলিম হা/১৯০১)*। রাসূল (ছাঃ)-এর এই আহবান মুসলমানদের দেহমনে ঈমানী বিদ্যুতের চমক এনে দিল। অতঃপর তিনি বললেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

‘যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি আজকে দৃঢ়পদে নেকীর উদ্দেশ্যে লড়াই করবে, পিছপা হবে না, সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হবে, অতঃপর যদি সে নিহত হয়, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’।

যুদ্ধের প্রতীক চিহ্ন

বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতেন। যেমন (১) বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন ছিল, أَحَدٌ أَحَد (আহাদ, আহাদ)।[1] (২) ওহোদ যুদ্ধে ও সারিইয়া গালিব বিন লায়ছীর প্রতীক চিহ্ন ছিল, أَمِتْ، أَمِت (মেরে ফেল, মেরে ফেল)।[2] (৩) খন্দক ও বনু কুরায়যা যুদ্ধে ছিল, حم، لاَ يُنْصَرُون (হা-মীম। তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না’)।[3] (৪) বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে প্রতীক চিহ্ন ছিল, يَا مَنْصُورُ، أَمِتْ أَمِت (হে বিজয়ী! মেরে ফেল, মেরে ফেল’)।[4] (৫) মক্কা বিজয়, হোনায়েন এবং ত্বায়েফ যুদ্ধে মুহাজিরদের প্রতীক ছিল يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَن ‘হে বনু আব্দুর রহমান’!

খাযরাজদের প্রতীক ছিলﷲ يَا بَنِي عَبْدِ ‘হে বনু আব্দুল্লাহ’! এবং আউসদের প্রতীক ছিলﷲ يَا بَنِي عُبَيْدِ ‘হে বনু ওবায়দুল্লাহ’!

জান্নাত পাগল মুমিন মৃত্যুকে পায়ে দলে শতগুণ শক্তি নিয়ে সম্মুখে আগুয়ান হ’ল ও তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এমন সময় জনৈক আনছার ছাহাবী উমায়ের বিন হোমাম(عُمَيْرُ بْنُ حُمَام) ‘বাখ বাখ’(بَخْ بَخ) বলে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জান্নাতবাসী হ’তে চাই’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন,فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ‘নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী’। একথা শুনে ছাহাবী থলি হ’তে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু দ্রুত তিনি বলে উঠলেন, لَئِنْ أَنَا حَيِّيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ ‘যদি আমি এই খেজুরগুলি খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে সেটাতো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে’ বলেই সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন’।[6]

এ সময় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নিকটে আকুলভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন,

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ... اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا-

‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা জানাচ্ছি। ... হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ’লে আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত করার মত কেউ যমীনে আর থাকবে না’। তিনি প্রার্থনায় এমন আত্মভোলা ও বিনয়ী হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন যে, তার স্কন্ধ হ’তে চাদর পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর ছুটে এসে চাদর উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّك ‘যথেষ্ট হয়েছে হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পালনকর্তার নিকটে আপনি চূড়ান্ত প্রার্থনা করেছেন’।

ফেরেশতাগণের অবতরণ

এ সময় আয়াত নাযিল হ’ল - إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ

الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ 'যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কাতর প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের দো'আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে, যারা ধারাবাহিকভাবে অবতরণ করবে' *(আনফাল ৮/৯)*।[1] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা যোগদান করেননি *(ইবনু কাছীর)*। উল্লেখ্য যে, সূরা আনফাল ৯ আয়াতে 'এক হাযার', আলে ইমরান ১২৪ ও ১২৫ আয়াতে যথাক্রমে 'তিন হাযার' ও 'পাঁচ হাযার' ফেরেশতা অবতরণের কথা বলা হয়েছে'। এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এক হাযার' সংখ্যাটি তিন হাযার বা তার অধিক সংখ্যাকে নিষেধ করে না। কেননা উক্ত আয়াতের শেষে مُرْدِفِيْنَ শব্দ এসেছে। যার অর্থ 'ধারাবাহিকভাবে আগত'। অতএব আল্লাহর হুকুমে যত হাযার প্রয়োজন, তত হাযার ফেরেশতা নাযিল হবে'।[2] বস্তুতঃ সংখ্যায় বেশী বলার উদ্দেশ্য মুসলিম বাহিনীকে অধিক উৎসাহিত করা এবং বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি জেগে উঠে বললেন, أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ، هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আবুবকর! তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই যে জিব্রীল, তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে আসছেন'।[3]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ 'ঐ যে জিব্রীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন'। অতঃপর তিনি তাঁবুর বাইরে এসে বললেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ('সত্বর দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে'-ক্বামার ৫৪/৪৫)।[4] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বাইরে এসে আঙ্গুলের ইশারা করে করে বলেন, هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ 'এটি অমুকের বধ্যভূমি'। এটি অমুকের, ওটি অমুকের'। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, তাদের কেউ ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারেনি, যেখানে যেখানে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ইশারা করেছিলেন।

মাক্কী বাহিনীর পলায়ন

মুসলিম বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমণে পর্যুদস্ত মুশরিক বাহিনী প্রাণভয়ে পালাতে থাকল। এ দৃশ্য দেখে তাদের ধরে রাখার জন্য আবু জাহল তার লোকদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষণ দিয়ে বলেন, সোরাক্বার পলায়নে তোমরা ভেঙ্গে পড়ো না। সে আগে থেকেই মুহাম্মাদের চর ছিল। ওৎবা, শায়বা ও অলীদের মৃত্যুতেও ভীত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তাড়াহুড়োর মধ্যে তারা মারা পড়েছেন। লাত ও 'উযযার শপথ করে বলছি, ওদেরকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। অতএব তোমরা ওদেরকে মেরো না। বরং ধরো এবং বেঁধে ফেল'।

কিন্তু আবু জাহলের এই তর্জন-গর্জন অসার প্রমাণিত হ'ল। বর্ষিয়ান ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে আনছারদের বনু সালামাহ গোত্রের কিশোর দু'ভাই মু'আয ও মু'আউভিয বিন 'আফরা পৃথকভাবে এসে জিজ্ঞেস করল يَا عَمِّ أَرِنِى أَبَا جَهْلٍ! أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'চাচাজী! আবু জাহল-কে দেখিয়ে দিন। সে নাকি আমাদের রাসূলকে গালি দেয়'? তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে গোপনে এসে চাচাজীর কানে কানে একই কথা বলল। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ বলেন, আমি ওদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। ফলে বাধ্য হয়ে দেখিয়ে দিলাম। তখন ওরা দু'জন তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় তার কাঁধে ইকরিমা বিন আবু জাহলের তরবারির আঘাতে মু'আযের একটি হাত কেটে ঝুলতে থাকলে সে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে হেঁচকা টানে সেটাকে নিজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ছোট ভাই মু'আউভিযের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হ'লে তারা উভয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে গর্বভরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু জাহলকে আমি হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ কি? তারা বলল, না। তারপর উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كِلاَكُمَا قَتَلَهُ 'তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ'।[1] অবশ্য এই যুদ্ধে মু'আউভিয বিন 'আফরা পরে শহীদ হন এবং মু'আয বিন 'আফরা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল (২৩-৩৫ হি.) পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

পরে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ গিয়ে দেখেন যে, আবু জাহলের তখনও নিঃশ্বাস চলছে। তিনি তার দাড়ি ধরে মাথা কেটে নেবার জন্য ঘাড়ে পা রাখলে সে বলে ওঠে, وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ 'তোমরা কি এই ব্যক্তির চাইতে বড় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে

পেরেছ?’فَلَوْ غَيْرَ أَكَّارٍ قَتَلَنِي ‘ওহ্! আমাকে যদি (মদীনার) ঐ চাষাদের বদলে অন্য কেউ হত্যা করতো’![3] উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মক্কায় ওক্কবা বিন আবু মু‘আইত্বের বকরীর রাখাল ছিলেন *(আল-বিদায়াহ ৬/১০২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইবনু মাসঊদ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,أَخْزَاكَ اللهُ يَا عَدُوَّ اللهِ ‘আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুন রে আল্লাহর দুশমন!’ জবাবে আবু জাহল বলে ওঠে, وَبِمَاذَا أَخْزَانِي؟ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوه ‘কেন তিনি আমাকে লাঞ্ছিত করবেন? আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করেছ কি?’[4] এখন বল, لِمَنِ الدَّائِرَةُ الْيَوْم ‘আজ কারা জিতলো’। ইবনু মাসঊদ বললেন, لِلَّه وَلِرَسُولِه ‘আজকের জয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর জন্য’। বলেই তার মাথাটা কেটে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাযির হ’লেন এবং বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللهِ أَبِي جَهْل ‘হে আল্লাহর রাসূল! এটা হ’ল আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের মাথা। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন, اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُه ‘আল্লাহর কসম? যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’। আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’। অতঃপর আমি তাঁর সামনে মাথাটি রেখে দিলাম তখন তিনি ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললেন।[5] এভাবে মক্কার বড় ত্বাগূতটা শেষ হয়।

জয়-পরাজয়

এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার মোট ১৪জন শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হন। তাদের বড় বড় ২৪ জন নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূয়ায় (القَلِيب) নিক্ষেপ করা হয়।[1] যাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহলসহ ১৪জন নেতার ১১ জন ছিল। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান (মৃ. মদীনায় ৩০ অথবা ৩৪ হি.), জুবায়ের বিন মুত্ব‘ইম (মৃ. ৫৭ হি.) ও হাকীম বিন হেযাম (মৃ. ৫৪ হি.) মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন এবং তাদের ইসলাম আমৃত্যু সুন্দর ছিল।

উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুত্ব‘ইম ও আবু লাহাব বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। আবু লাহাব বদর যুদ্ধের সপ্তাহকাল পরে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শুহাদায়ে বদর

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যে ১৪ জন শহীদ হয়েছিলেন, তন্মধ্যে মুহাজির ছয় জন হ'লেন, (১) মিহজা' (مِهْجَعٌ), যিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের মুক্তদাস ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর প্রথম শহীদ। (২) বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব থেকে উবায়দাহ ইবনুল হারিছ বিন মুত্ত্বালিব। শত্রু পক্ষের নেতা উৎবাহ বিন রাবী'আহ তাঁর পা কেটে দেন। পরে 'ছাফরা' গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (৩) বনু যোহরা থেকে উমায়ের বিন আবু ওয়াকক্কাছ। যিনি সা'দ বিন আবু ওয়াকক্কাছের ভাই ছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সের তরুণ হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাকে ফিরে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কাঁদতে থাকেন। ফলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে যান *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬০৬১)*। (৪) মুহাজিরগণের মিত্র যুশ-শিমালাইন বিন 'আব্দে আমর আল-খুযাঈ। (৫) বনু 'আদীর মিত্র 'আক্বেল বিন বুকায়ের। (৬) বনুল হারেছ বিন ফিহর থেকে ছাফওয়ান বিন বায়যা।

অতঃপর আনছারদের মধ্যেকার আট জন হ'লেন, (১) বনু নাজ্জার থেকে হারিছাহ বিন সুরাক্বাহ। (২-৩) বনু গানাম থেকে 'আফরার দুই পুত্র 'আওফ ও মু'আউভিয। (৪) বনুল হারেছ বিন খাযরাজ থেকে ইয়াযীদ বিন হারেছ। (৫) বনু সালামাহ থেকে উমায়ের বিন হুমাম। (৬) বনু হাবীব থেকে রাফে' বিন মু'আল্লা। (৭) বনু 'আমর বিন 'আওফ থেকে সা'দ বিন খায়ছামা এবং (৮) মুবাশশির বিন আব্দুল মুনযির *(ইবনু হিশাম ১/৭০৬-০৮)*।

বদর যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

(১) বদর যুদ্ধে যাত্রা পথে দু'তিন জন করে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে চলতে হ'ত। রাসূল (ছাঃ), আলী ও আবু লুবাবা ইবনুল মুনযির এবং পরবর্তীতে তার বদলে মারছাদ বিন আবু মারছাদ গানাভীর জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিল। যাতে পায়ে হাঁটার পালা আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজেও হাঁটতেন। এসময় সাথীগণ নিজেরা হেঁটে তাঁকে উটে সওয়ার থাকার অনুরোধ করেন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّى وَلاَ أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمَا 'তোমরা দু'জন আমার চাইতে শক্তিশালী নও এবং আমিও নেকী পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে কম মুখাপেক্ষী নই'।[1]

(২) বেলাল (রাঃ)-কে নির্যাতনকারী মনিব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারী নরাধম উমাইয়া বিন খালাফ-এর সাথে আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ)-এর জাহেলী যুগে চুক্তি ছিল যে, তিনি মক্কায় তার লোকদের রক্ষা করবেন এবং আব্দুর রহমান মদীনায় উমাইয়ার লোকদের রক্ষা করবেন। সেকারণ যুদ্ধ শেষে তিনি উমাইয়া ও তার ছেলেকে পাহাড়ের একটি গুহায় লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু যেভাবেই হোক সেটি বেলালের নযরে পড়ে যায়। ফলে তিনি একদল আনছারের সামনে গিয়ে চীৎকার দিয়ে বলে উঠেন, ওহে আল্লাহর সাহায্যকারীগণ! শীর্ষ কাফের উমাইয়া এখানে। হয় আমি থাকব, নয় সে থাকবে’। তার ডাকের সাথে সাথে চারদিক থেকে সবাই এসে তাকে ঘিরে ফেলল। আব্দুর রহমান শত চেষ্টা করেও তাকে রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে পিতা-পুত্র দু’জনেই সেখানে নিহত হ’ল। এতে আব্দুর রহমান-এর পা যখমী হয়।[2]

(৩) তিনদিন অবস্থানের পর বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার মৃত নেতাদের উদ্দেশ্যে কূয়ার পাশে দাঁড়িয়ে একে একে পিতা সহ তাদের নাম ধরে ডেকে বলেন,

يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم – وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا

হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে তোমরা আজ খুশী হ’তে? নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে (বিজয়ের) ওয়াদা দিয়েছিলেন, আমরা তা সত্যরূপে পেয়েছি। তোমরা কি তা সত্যরূপে পেয়েছ যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে (আযাবের) ওয়াদা করেছিলেন? এ সময় ওমর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন দেহগুলির সাথে কথা বলছেন, যাদের মধ্যে রূহ নাই। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা তাদের চাইতে অধিক শ্রবণকারী নও, যা আমি বলছি’।

এর ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে (সাময়িকভাবে) জীবিত করেন, যাতে তারা নবীর ধিক্কারবাণীগুলি শুনতে পায় ও লজ্জিত হয়’ *(বুখারী হা/৩৯৭৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا

‘ওরা কিভাবে শুনবে এবং ওরা কিভাবে জওয়াব দিবে। অথচ ওরা মরে পচে গেছে’। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা ওদের চাইতে অধিক শ্রবণকারী নও, যা আমি বলছি’। কিন্তু ওরা জওয়াব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না’।[3] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

يَا رَسُولَ اللهِ أَتُنَادِيهِمْ بَعْدَ ثَلاَثٍ وَهَلْ يَسْمَعُونَ؟ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى). فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا

‘হে আল্লাহর রাসূল! তিন দিন পরে আপনি ওদের ডাকছেন। ওরা কি শুনতে পাবে? অথচ আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃতকে’ *(নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২)*। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা তাদের চাইতে অধিক শ্রবণকারী নও, যা আমি বলছি’। কিন্তু ওরা জওয়াব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না’ *(আহমাদ হা/১৪০৯৬, সনদ ছহীহ)*।

৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, হারেছাহ বিন সুরাক্বা আনছারী তরুণ বয়সে বদর যুদ্ধে নিহত হন। তার মা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে হারেছার অবস্থান সম্পর্কে বলবেন কি? যদি সে জান্নাতে থাকে, তাহ’লে আমি ছবর করব এবং ছবরের বিনিময়ে ছওয়াব কামনা করব। আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহ’লে বলুন আমি কি করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কি বলছ তুমি? জান্নাত কি কেবল একটা? বহু জান্নাত রয়েছে। আর তোমার সন্তান রয়েছে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদৌসে’ *(বুখারী হা/২৮০৯, ৩৯৮২)*।

বদর যুদ্ধ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

(১) মক্কায় সামাজিক পরিবেশ প্রতিকূলে থাকায় সেখানে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে মদীনায় পরিবেশ অনুকূলে থাকায় এবং এখানে সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় রাসূল (ছাঃ)-কে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি

দেওয়া হয়। এতে বুঝা যায় যে, বিজয়ের সম্ভাবনা ও পরিবেশ না থাকলে যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে ছবর করতে হবে। যেমনটি মাক্কী জীবনে করা হয়েছিল।

(২) বদরের যুদ্ধ ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। আবূ জাহলকে বদরে মুকাবিলা না করলে সে সরাসরি মদীনায় হামলা করার দুঃসাহস দেখাত। যা ইতিপূর্বে তাদের একজন নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী সরাসরি মদীনার উপকণ্ঠে হামলা করে গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জানিয়ে গিয়েছিল। এতে বুঝা যায় যে, আত্মরক্ষা এবং ইসলামের স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি নেই।

(৩) সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের আধিক্য বিজয়ের মাপকাঠি নয়। বরং দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর উপরে একান্ত নির্ভরশীলতাই হ'ল বিজয়ের মূল হাতিয়ার। পরামর্শ সভায় কয়েকজন ছাহাবী বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলে আল্লাহ ধমক দিয়ে আয়াত নাযিল করেন *(আনফাল ৮/৫-৬)*। এতে বুঝা যায়, আল্লাহর গায়েবী মদদ লাভই হ'ল বড় বিষয়।

(৪) যুদ্ধের উদ্দেশ্য হ'তে হবে জান্নাত লাভ। যেটা যুদ্ধ শুরুর প্রথম নির্দেশেই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। অতএব চিন্তাক্ষেত্রের যুদ্ধ হৌক বা ময়দানের সশস্ত্র মুকাবিলা হৌক ইসলামের সৈনিকদের একমাত্র লক্ষ্য থাকতে হবে আখেরাত। কোন অবস্থাতেই দুনিয়া হাছিলের জন্য মুসলমানের চিন্তাশক্তি বা অস্ত্রশক্তি ব্যয়িত হবে না।

(৫) স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নামলে আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতামন্ডলী পাঠিয়ে সাহায্য করে থাকেন। যেমন বদর যুদ্ধে করা হয়েছিল *(আনফাল ৮/৯)*।

(৬) যুদ্ধে গণীমত লাভের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জিত হ'লেও তা কখনোই মুখ্য হবে না। বরং সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমীরের অনুগত থাকতে হবে। বদর যুদ্ধে গণীমত বণ্টন নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'লেও তা সাথে সাথে নিষ্পত্তি হয়ে যায় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে *(আনফাল ৮/১)*।

(৭) কাফিররা মূলতঃ মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকে ভয় পায়। এ কারণেই পরবর্তী ওহোদের যুদ্ধে তারা মহিলাদের সাথে করে এনেছিল। যাতে পুরুষেরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে না যায়।

(৮) বদর যুদ্ধের বড় শিক্ষা এই যে, কুফর ও ইসলামের মুকাবিলায় মুসলমান নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে আল্লাহর উপরে ভরসা করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর এভাবেই চিরকাল

ঈমানদার সংখ্যালঘু শক্তি বেঈমান সংখ্যাগুরু শক্তির উপরে বিজয়ী হয়ে থাকে *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*। এ ধারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে *ইনশাআল্লাহ*।

বদর পরবর্তী অভিযানসমূহ

১০. সারিইয়া ওমায়ের বিন 'আদী আল-খিত্বমী (سرية عمير بن عدي الخطمي**) :** ২য় হিজরীর ২৫শে রামাযান। একাকী স্বীয় সম্পর্কিত বোন 'আছমা (عَصْمَاء) বিনতে মারোয়ান খিত্বমিয়াকে হত্যা করেন। কেননা মহিলাটি সর্বদা তার গোত্রকে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিত। সে ইসলাম ও ইসলামের নবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলত। ওমায়ের ছিলেন তার গোত্রের প্রধান এবং সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী। তার পিতা 'আদী বিন খারশাহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি। ওমায়ের অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাত্রির অন্ধকারে একাকী ঐ মহিলার বাড়ীতে গিয়ে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এক আঘাতে শেষ করে দেন। ফিরে এসে ফজরের ছালাত শেষে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে উক্ত খবর দেন। তিনি তার জন্য দো'আ করেন ও 'আল-বাছীর' বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর থেকে ওমায়ের 'আয-যারীর'-এর বদলে 'আল-বাছীর' নামে প্রসিদ্ধ হন। আয-যারীর (الضرير) অর্থ অন্ধ এবং আল-বাছীর (البصير) অর্থ দৃষ্টি সম্পন্ন।[1]

১১. সারিইয়া সালেম বিন ওমায়ের আনছারী (سرية سالم بن عمير**) :** ২য় হিজরীর শাওয়াল মাস। তিনি একাকী ১২০ বছরের বৃদ্ধ ইহূদী কবি আবু 'আফাক(أبو عَفَك)-কে হত্যা করেন। কারণ সে সর্বদা ইহূদীদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের উস্কানী দিত। সালেম বিন ওমায়ের (রাঃ) তাকে হত্যা করার মানত করেন। তিনি বদর, ওহোদ ও খন্দকসহ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এছাড়া তাবূক যুদ্ধে যানবাহনের অভাবে যেতে না পারায় 'ক্রন্দনকারীদের' (وَهُوَ أحدُ الْبَكَّاءِين) অন্যতম ছিলেন। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন।[2]

১২. গাযওয়া বনু সুলায়েম(غزوة بني سليم**) :** ২য় হিজরীর শাওয়াল মাস। বদর যুদ্ধ হ'তে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাতদিন পরে এটি সংঘটিত হয়। বনু গাত্বফান গোত্রের শাখা বনু সুলায়েম মদীনায় হামলার প্রস্ত্ততি নিচ্ছে জানতে পেরে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং ২০০ উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথে 'কুদ্র' (الْكُدْر) নামক ঝর্ণাধারার নিকটে পৌঁছে তাদের উপরে আকস্মিক হামলা চালান। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ৫০০ উট

রেখে পালিয়ে যায়। ইয়াসার (يسار) নামে একটি গোলাম আটক হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন। এই সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন সিবা‘ বিন উরফুত্বাহ আল-গিফারী অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)।

১৩. সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী(سرية غالب بن عبد الله الليثي**) :** ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে আগ্রাসী বনু সুলায়েম বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে তিন দিন অবস্থান শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন। পরে শত্রুরা পুনরায় সংগঠিত হয়েছিল। তখন তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়। যাতে শত্রুপক্ষের কয়েকজন এবং মুসলিম পক্ষের তিন জন মারা যায়।[4]

১৪. গাযওয়া বনু ক্বায়নুক্বা(غزوة بني قينقاع**) :** ২য় হিজরীর **১৫**ই শাওয়াল শনিবার থেকে **১৫** দিন অবরোধ করে রাখার পর এই বিশ্বাসঘাতক ও সমৃদ্ধিশালী ইহূদী গোত্রটি **১**লা যিলক্বা‘দ আত্মসমর্পণ করে। এরা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। ফলে মাত্র একমাস পূর্বে ইসলাম কবুলকারী খাযরাজ গোত্রভুক্ত মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের একান্ত অনুরোধে ও পীড়াপীড়িতে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রাণদন্ড মওকুফ করে মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে ৭০০ জন ছিল সশস্ত্র যোদ্ধা এবং মদীনার সেরা ইহূদী বীর। এরা সবকিছু ফেলে সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ সেখানে মৃত্যুবরণ করে। মানছূরপুরী বলেন, তারা খায়বরে যেয়ে বসতি স্থাপন করে।[5]

১৫. গাযওয়া সাভীক্ব(غزوة سويق**) :** ২য় হিজরীর ৫ই যিলহাজ্জ রবিবার। বদর যুদ্ধে লজ্জাকর পরাজয়ে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান শপথ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার মস্তক নাপাকীর গোসলের পানি স্পর্শ করবে না। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তিনি ২০০ উষ্ট্রারোহী নিয়ে রাতের বেলায় গোপনে মদীনায় এসে ইহূদী গোত্র বনু নাযীর নেতা ও তাদের কোষাধ্যক্ষ সাল্লাম বিন মিশকামের সঙ্গে শলা পরামর্শ শেষে রাতেই মক্কায় রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু যাওয়ার আগে একটি দল পাঠিয়ে দেন। যারা মদীনার উপকণ্ঠে ‘উরাইয’ (العُرَيض) নামক স্থানে একটি খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয় এবং সেখানে দায়িত্বরত একজন আনছার ও তার এক মিত্রকে হত্যা করে ফিরে যায়।

এখবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত গতিতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। আবু সুফিয়ান ভয়ে এত দ্রুত পলায়ন করেন যে, বোঝা হালকা করার জন্য তাদের বহু রসদ

সম্ভার এবং ছাতুর বস্তা রাস্তার পাশে ফেলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বারক্বারাতুল কুদর(قَرْقَرَةُ الْكُدْر) পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরবার পথে তাদের ফেলে যাওয়া পাথেয় ও ছাতুর বস্তাগুলো নিয়ে আসেন। ছাতুকে আরবীতে 'সাভীক্ব' (السَّوِيق) বলা হয়। সেজন্য এই অভিযানটি 'গাযওয়া সাভীক্ব' বা ছাতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছে। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু লুবাবাহ বাশীর বিন মুনযির (রাঃ)।[6]

১৬. গাযওয়া যী আমর(غزوة ذي أمر) : ৩য় হিজরীর ছফর মাস। উদ্দেশ্য নাজদের বনু গাত্বফান গোত্র। তাদের বনু ছা'লাবাহ ও বনু মুহারিব গোত্রদ্বয় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমন করবে মর্মে খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাড়ে চারশ' সৈন্য নিয়ে মুহাররম মাসেই তাদের মুকাবিলায় বের হন। পথিমধ্যে বনু ছা'লাবাহ গোত্রের জাববার (جَبَّار) নামক জনৈক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনীর পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ঘাঁটি এলাকায় পৌঁছে যী আমর(ذي أمر) নামক ঝর্ণাধারার পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে পুরা ছফর মাস বা তার কাছাকাছি সময় অতিবাহিত করেন। যাতে মুসলিম শক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি শত্রুদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন হযরত ওছমান বিন 'আফফান (রাঃ)।[7]

১৭. সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ(سرية محمد بن مسلمة فى قتل كعب بن الأشرف**) (কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকান্ড);** হিজরতের ২৫ মাস পরে ৩য় হিজরীর ১৪ই রবীউল আউয়াল) **:**

মদীনার নামকরা ইহূদী পুঁজিপতি ও কবি কা'ব বিন আশরাফ সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহূদীদেরকে যুদ্ধে প্ররোচনা দিত। তার পিতা ছিল বনু ত্বাঈ গোত্রের এবং মা ছিল মদীনার ইহূদী বনু নাযীর গোত্রের। বদর যুদ্ধে পরাজয়ের পর সে মক্কায় গিয়ে কুরায়েশ নেতাদের পুনরায় যুদ্ধে উস্কে দেয়। তারপর মদীনায় ফিরে এসে ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলতে থাকে। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সেমতে আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল ১৪ই রবীউল আউয়াল চাঁদনী রাতে তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে হত্যা করে।[8] এই ঘটনার পর ইহূদীরা সম্পূর্ণরূপে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করে *(আবুদাঊদ হা/৩০০০)*। এর ফলে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা হ’তে মুক্ত হন এবং বহিরাক্রমণ মুকাবিলার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

কা‘ব বিন আশরাফ ছিল একজন খ্যাতনামা ইহূদী পুঁজিপতি, কবি ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তার দুর্গটি ছিল মদীনার পূর্ব-দক্ষিণে দু’মাইল দূরে বনু নাযীর গোত্রের পশ্চাদভূমিতে। বদর যুদ্ধে কুরায়েশ নেতাদের চরম পরাজয়ে সে রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও কুরায়েশ নেতাদের প্রশংসা করে সে কবিতা বলতে থাকে। কিন্তু তাতে তার ক্ষোভের আগুন প্রশমিত না হওয়ায় সে মক্কায় চলে যায় এবং কুরায়েশ নেতাদের কবিতার মাধ্যমে উত্তেজিত করতে থাকে। সে যুগে কবিতাই ছিল সাহিত্যের বাহন এবং কারু প্রশংসা বা ব্যঙ্গ করার প্রধান হাতিয়ার। কোন বংশে কোন কবি জন্মগ্রহণ করলে সে বংশ তাকে নিয়ে গর্ব করত এবং তাকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হ’ত। আবু সুফিয়ান এবং মক্কার নেতারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, أَدِينُنَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَمْ دِينُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَهْدَى سَبِيلاً? ‘আমাদের দ্বীন আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয় না মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের দ্বীন? আর এ দু’টি দলের মধ্যে কোন দলটি অধিক সুপথপ্রাপ্ত? সে বলল, أَنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُمْ سَبِيلاً ‘তোমরাই তাদের চাইতে অধিক সুপথপ্রাপ্ত’।

জাবের (রাঃ) হ’তে)। কা‘ব বিন মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) আউস নেতা সা‘দ বিন মু‘আযকে তার বিরুদ্ধে একদল লোক পাঠাতে বললেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে। তখন তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহকে পাঠালেন *(আবুদাউদ হা/৩০০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বাকী‘ গারক্বাদ পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং বলেন, انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنْهُم ‘তোমরা আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। হে আল্লাহ তুমি এদের সাহায্য কর’

দুধভাই আবু নায়েলাহ কা‘বের দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে ডাক দিল। এ সময় কা‘বের নববধূ তাকে বাধা দিয়ে বলল, أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّم ‘আমি এমন এক ডাক শুনলাম, মনে হ’ল তা থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে’। কিন্তু কা‘ব কোনরূপ সন্দেহ না করে বলল, এরা তো আমার ভাই। তাছাড়া إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لأَجَاب ‘সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিতে যদি তরবারির দিকেও আহূত হন, তথাপি তিনি তাতে সাড়া দিয়ে থাকেন’। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ অপর দু’জনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন

তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা অাঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করবে।

অতঃপর কা‘ব চাদর গায়ে দিয়ে নীচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ বললেন, আজকের মতো এত উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। উত্তরে কা‘ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা আছে। তখন মুহাম্মাদ বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দিবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, ‘আমাকে আর একবার শুঁকবার অনুমতি দিবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ফেলে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা একে হত্যা করো। তারা তাকে হত্যা করলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দিলেন’।[10] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ সময় রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে দো‘আ করে বলেন, أَفْلَحَتِ الوجوه ‘তোমাদের চেহারাগুলি সফল থাকুক’ *(হাকেম হা/৫৮৪০, সনদ ছহীহ)*।

কা‘ব বিন আশরাফকে গোপনে হত্যা করায় প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের স্বার্থে এরূপ দুশমনকে গুপ্তহত্যা করা চলে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী ও অপপ্রচারকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড *(তাওবাহ ৯/৬৫-৬৬)*। মুসলিম মহিলাদের ইয্যত নিয়ে কুৎসা রটনাকারীদের জন্য একই শাস্তি নির্ধারিত। এই ধরনের দুশমন নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন বোধে যেকোন কৌশলের আশ্রয় নেয়া যাবে। তবে এর জন্য সর্বোচ্চ সরকারী নির্দেশ আবশ্যিক হবে। এককভাবে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য এরূপ করা সিদ্ধ নয়। কেননা এখানে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সর্বোচ্চ নির্দেশদাতা।

উহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আবু জাহেলসহ কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করলেন তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করল। দায়িত্ব পেয়ে রসূল (ﷺ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রসমূহকে একত্রিত করতে লাগল। প্রচুর অস্ত্র ও জনবলসহ সে মদ্বীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উহুদ পাহাড়ের নিকট তাবু স্থাপন করল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে মদ্বীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের যুবকরাও এবার নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য পেশ করে। যারা বয়সে ছোট ছিল তাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন ছাবেত এবং আরাবা বিন আওয়াস। আর যাদেরকে জিহাদ করতে সক্ষম মনে করেছেন, তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সামুরা বিন জুন্দুব এবং রাফে বিন খাদীজ। এদের বয়স ছিল তখন ১৫ বছর। কেউ কেউ বলেছেন- যাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন ১৫ বছর বয়স হওয়ার কারণে তাদেরকে বালেগ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। আর যাদের বয়স এর কম ছিল নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

অন্য একদল আলেম বলেন- ১৫ বছর বয়স বা বালেগ হওয়ার কারণে নয়; বরং যাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মত শক্তি দেখেছেন তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন শক্তি না থাকার কারণেই তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) এর হাদীছের কতক শব্দে এসেছে যে, রসূল (ﷺ) যখন আমাকে শক্তিশালী দেখলেন তখন জিহাদের অনুমতি দিলেন।

যাই হোক নাবী (ﷺ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি মদ্বীনা থেকে বের হয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবেলা করবেন? না মদ্বীনায় থেকেই যুদ্ধ করবেন? রসূল (ﷺ)-এর রায় ছিল যে, মুসলমানেরা মদ্বীনা থেকে বের হবেনা; বরং মদ্বীনার ভিতরেই থাকবে। কাফেররা যদি মদ্বীনায় প্রবেশের সাহসিকতা প্রদর্শন করে তাহলে মুসলমানেরা মদ্বীনার প্রবেশ পথে যুদ্ধ করবে এবং মহিলারাও ঘরের ছাদ থেকে কাফেরদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এই মতকেই সমর্থন করল। আর এটিই ছিল সঠিক রায়। কিন্তু যে সমস্ত সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা মদ্বীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। তারা এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে পড়লেন। যারা বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল এবার তাদের দৃঢ়তায় ভাটা পড়ল। তখন তারা বলল- আমরা আল্লাহর রসূলকে বের হতে বাধ্য করলাম! তারা আরও বলল- হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি মদ্বীনায় অবস্থান করতে চান তাহলে তাই করুন। রসূল (ﷺ) তখন বললেন- যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর কোন নাবীর জন্য এটা জায়েয

নয় যে, তাঁর মাঝে এবং শত্রুর মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলবে।

তাই নাবী (ﷺ) এক হাজার সাহাবী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদ্বীনায় অবশিষ্ট মুসলমানদের ইমাম নিযুক্ত করলেন। এর আগে মদ্বীনায় থাকার সময় রসূল (ﷺ) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর তলোয়ারটি সামান্য ভেঙ্গে গেছে, একটি গাভী যবেহ করা হচ্ছে এবং তিনি একটি সুরক্ষিত দূর্গে স্বীয় হাত ঢুকাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন- তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার পরিবারের একজন লোক আক্রান্ত হবেন, গাভী যবেহ করার ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিহত হবেন আর সুরক্ষিত দূর্গ হচ্ছে মদ্বীনা।

তিনি পবিত্র জুআর দিন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মদ্বীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী স্থানে এসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ লোকসহ ফিরে গেল।

অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে অবস্থান করলেন। মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন যে, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ শুরু না করেন। শনিবারের দিন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি ৫০ জন তীরন্দাজ বাহীনির উপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরকে আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে আমীরের আনুগত্য করার আদেশ দিলেন। এমন কি তারা যদি দেখে পাখীরা অন্যান্য সৈনিকদেরকে ছিড়ে খাচ্ছে তাতেও যেন তারা স্থান ত্যাগ না করেন। এই বাহিনীকে পিছনে নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে মুশরিকরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিহত করা যায়।

ঐ দিকে কুরাইশরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। তারা সংখ্যায় ছিল তিন হাজার। তাদের মধ্যে ছিল দুইশত অশ্বারোহী যোদ্ধা।

দিবসের প্রথম ভাগে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন মুসলিমদের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হল। আল্লাহর দুশমনেরা পরাজিত হল। তারা পরাজিত হয়ে তাদের মহিলাদের নিকট আশ্রয় নিতে লাগল।

ঐ দিকে রসূল (ﷺ) কর্তৃক নিয়োজিত ৫০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী যখন কাফেরদের পরাজয় দেখল তখন তারা রসূল (ﷺ) এর আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করতে লাগল এবং গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগল।

তাদের আমীর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রসূল (ﷺ) এর আদেশের কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলনা। তাদের ধারণা ছিল মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সুতরাং রসূল (ﷺ) এর আদেশের কার্যকরিতা শেষ হয়ে গেছে। তাই তারা স্থান ত্যাগ করে গণীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঐ দিকে মুশরিকদের অশ্বারোহীরা পিছন দিক খালি পেয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। এক পর্যায়ে তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল। এখানে ৭০জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। বাকীরা পলায়ন করলে মুশরিকরা রসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুশরিকরা তাঁর চেহারা মোবারকে আঘাত করল, সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলল। পরিশেষে কুরাইশদের আঘাতে তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন।

এ সময় শয়তান উচ্চস্বরে চিৎকার করল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। এই কথা শুনে মুসলিমগণ নিরুৎসাহী হয়ে পড়ল এবং তাদের অধিকাংশই পলায়ন করল। আনাস বিন নযর তখন মুসলিমদের একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন- তিনি নিহত হয়ে থাকলে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?। তোমরা উঠ এবং তিনি যেই জন্য শহীদ হয়েছেন তোমরাও সে পথে মৃত্যু বরণ কর। অতঃপর তিনি লোকদের দিকে অগ্রসর হয়ে সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এর দেখা পেলেন। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন- হে সা'দ! আমি উহুদ পাহাড়ের পিছন দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পর রসূল (ﷺ) মুসলমানদের সামনে আগমণ করলেন। কাব বিন মালেকই সর্বপ্রথম তাঁকে হিলমেটের নীচ থেকে চিনে ফেললেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, হে মুসলিমগণ! এই তো আল্লাহর রসূল এসে গেছেন। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। রসূল (ﷺ) ইংগিতের মাধ্যমে তাঁকে চুপ থাকতে বললেন। মুসলমানেরা তাঁর চতুর্পাশে এসে একত্রিত হল। সেখানে আবু বকর, উমার এবং আলী (রাঃ) ও ছিলেন।

উহুদ যুদ্ধে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে

- যুদ্ধ শুরু করার পর তা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করবে এবং মাঠে নেমে যাবে তার জন্য যুদ্ধ থেকে সরে আসা বৈধ নয়।
- মুসলিম দেশে শত্রু আগমণ করে হামলা করলে মুসলমানদের জন্য নগর ফটকের বাইরে গিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করা আবশ্যক নয়।
- যে সমস্ত শিশু যুদ্ধের ক্ষমতা রাখেনা তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হবেনা।
- জিহাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারাও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে পড়া জায়েয আছে। যেমনটি করেছিলেন আনাস বিন নযর (রাঃ)।
- ইমাম যদি আহত হয়ে যান আর তিনি যদি বসে সলাতের ইমামতি করেন, তাহলে পিছনের লোকেরাও বসে সলাত পড়বে।
- আল্লাহর কাছে শাহাদাতের তামান্না (আশা) করা এবং দু'আ করা দোষের কিছু নয়। যেমন আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ শাহাদাত কামনা করেছিলেন।
- কোন মুসলিম যদি আত্মহত্যা করে তাহলে সে জাহান্নামী হবে। কাযমান যখন উহুদ যুদ্ধে আহত হলেন তখন সে জখমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্ম হত্যা করল। নাবী (ﷺ) তা জানতে পেরে বললেন- সে জাহান্নামী।
- যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শহীদ হবে তাদেরকে গোসল দেয়া হবেনা এবং তাদের জানাযা পড়া হবেনা। যে পোষাকে তারা নিহত হবেন সেই পোষাকেই তাদেরকে দাফন করা হবে। তবে শত্রুরা যদি তার পোশাক ছিনিয়ে নেয় তাহলে অন্য পোষাকে কাফন পরাতে হবে। আর কেউ যদি স্ত্রী সহবাস জনিত কারণে নাপাক থাকে তাহলে গোসল দেয়া হবে। যেমন হানযালা (রাঃ) কে ফিরিস্তারা গোসল দিয়েছিলেন। শহীদদের পরিহিত পোষাকেই দাফন করা মুস্তাহাব না ওয়াজিব? এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে সঠিক কথা হচ্ছে তা ওয়াজিব।
- যুদ্ধের শহীদদেরকে যুদ্ধের ময়দানেই দাফন করতে হবে। কেননা উহুদের যে সমস্ত শহীদকে মদ্বীনায় বহন করে নেওয়া হয়েছিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম তাদেরকে উহুদের মাঠে ফেরত নিয়ে তথায় দাফন করতে আদেশ দিয়েছেন।
- এক কবরে দুইজন বা তিনজন মৃতকে দাফন করা জায়েয আছে।

- বিকলাঙ্গ বা অন্য কোন উযর (ওযূহাত) থাকার কারণে যাদের জন্য জিহাদে বের না হওয়ার অনুমতি আছে, ইচ্ছা করলে তারাও জিহাদে বের হতে পারে। যেমন নাবী (ﷺ) একজন লেংড়া সাহাবীকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন।
- কোন মুসলিম যদি যুদ্ধের ময়দানে ভুলক্রমে অন্য কোন মুসলিমকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে বাইতুল মাল থেকে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। কেননা রসূল (ﷺ) হুযায়ফা বিন ইয়ামানের পিতার দিয়ত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযায়ফা (রাঃ) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের বিনিময়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অফুরন্ত নিয়ামাত প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেই নিয়ামাতগুলোর তুলনায় উহুদ যুদ্ধের মসীবত খুবই সামান্য। নিয়ামাতগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করলে উহুদ যুদ্ধে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের কষ্টের অসিত্মত্বই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সেই নেয়ামতগুলোর অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য হতেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত শিক্ষা দেন এবং গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হিদায়াতের (আলোর) দিকে বের করেন। এই বিরাট কল্যাণের পর সকল বালা-মসীবত খুবই নগণ্য। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন যে, এই মসীবতের কারণ স্বয়ং মুসলিমরাই। যাতে তারা আগামীতে সংশোধন হয়ে যায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করে। আর তাদের এই পরাজয় পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ীই হয়েছিল। সুতরাং তাদের উচিৎ সবসময় এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা। আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের হিকমতগুলো এই জন্যই বলে দিয়েছেন, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমতের উপর ইয়াকীন রাখে এবং আল্লাহর উপর কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকে। সেই সাথে যাতে করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা ও সিফাতে কামালিয়াতের মারেফতও হাসিল হয়ে যায়।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিষ দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যা বিজয় ও গণীমতের চেয়ে অনেক বড়। আর তা হচ্ছে শাহাদাতের মর্যাদা। এভাবে শান্তনা দেয়ার কারণ হচ্ছে, যাতে

তারা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয় এবং যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্য চিন্তিত না হয়। সুতরাং এর জন্য আমরা আল্লাহর সেরকমই প্রশংসা করছি, যেমন প্রশংসা তিনি পাওয়ার হকদার।

রাযী'র ঘটনা

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'আযাল' এবং 'ক্বারাহ' গোত্রের কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করে যে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু ইসলামের চর্চা রয়েছে। কাজেই, কুরআন ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য তাদের সঙ্গে কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-কে পাঠালে ভাল হয়। সে মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্বের মতে ছয় জন এবং সহীহুল বুখারীর বর্ণনা মতে দশ জন সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। ইবনে ইসহাক্বের মতে মুরশেদ বিন আবূ মুরশেদ গানাভীকে এবং সহীহুল বুখারীর বর্ণনা মতে 'আসিম বিন উমার বিন খাত্তাবের নানা 'আসিম বিন সাবেতকে এ দলের নেতৃত্বে প্রদান করা হয়। এরা যখন রাবেগ এবং জেদ্দাহর মধ্যবর্তী স্থানের হোযাইল গোত্রের 'রাযী' নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছান তখন আযাল এবং ক্বারাহর উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ হুযাইল গোত্রের শাখা বানু লাহয়ানকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়।

এ গোত্রের একশত তীরন্দাজ তাঁদের অনুসন্ধান করতে থাকে। পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে গিয়ে নাগালের মধ্যে তাদের পেয়ে যায়। সাহাবাগণ একটি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় বনু লাহয়ান তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার পর বলতে থাকে, 'তোমাদের সঙ্গে এ মর্মে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে তোমরা যদি নীচে নেমে আস তাহলে আমরা কাউকেও হত্যা করব না। 'আসিম তাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের অবিরাম তীর বর্ষণের ফলে ৭ জন শাহাদতবরণ করেন। জীবত রইলেন ৩ জন। তারা হচ্ছেন খুবাইব (রাঃ), যায়দ বিন দাসিন্নাহ (রাঃ) এবং আরও একজন। আবারও বনু লাহয়ান তাদের ওয়াদা পুনর্ব্যক্ত করলে তাঁরা নীচে নেমে আসেন।

কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়েই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে ধনুকের ছিলা দ্বারা তাঁদের বেঁধে ফেলে। অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃতীয় সাহাবী তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। তারা তাঁকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু না পেরে

শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে। এদিকে খুবাইব (রাঃ) এবং যায়দ বিন দাসিন্নাহকে (রাঃ) মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে দেয়। এ সাহাবীদ্বয় বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন।

খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় মক্কাবাসীদের নিকট থাকেন। অতঃপর মক্কাবাসীগণ তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যায়। তাঁকে শূলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, 'দু' রাকআত সালাত পড়ার জন্য সময় ও সুযোগ আমাকে দেয়া হোক।' তাঁকে সময় দেয়া হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে সালাম ফেরানোর পর তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের এ বলার ভয় না থাকত যে আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরও দীর্ঘ সময় যাবৎ এ সালাত আদায় করতাম।'

এরপর তিনি বলেন,

(اللهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا)

'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।

এ কথার পর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

অর্থ: আমার শত্রুগণ তাদের দলবল ও তাদের গোত্রসমূহকে আমার চারদিকে একত্রিত করেছে এবং তাদের সকলেই এক স্থানে একত্রিত হয়েছে।

তারা আমার হত্যার দৃশ্য অবলোকন করার জন্য তাদের সন্তান-সন্ততি এবং নারীদেরকেও একত্রিত করেছে। আর আমাকে হত্যা করার জন্য প্রকান্ড ও সুদৃঢ় এক খেজুর বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হয়েছে।

অর্থঃ হে আরশের মালিক (আল্লাহ)! আমাকে হত্যার ব্যাপারে আমার সঙ্গে তারা যা করতে চায় তুমি আমাকে তাতে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দান কর। কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আমার মাংসগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার নিরসন ঘটাবে।

আমাকে হত্যার পূর্বে কুফরী গ্রহণ করা কিংবা মৃত্যুবরণ করা এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ তারা দিয়েছিল, কিন্তু কুফরী গ্রহণ না করে ধর্মের পথে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছি। তখন আমার নয়ন যুগল বিনা অস্থিরতায় অশ্রু প্রবাহিত করেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে আমি অস্থির হই নি, বরং তাদের অন্যায় আচরণ ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ক্ষোভে দুঃখে আমার নয়ন যুগল অশ্রু-সিক্ত হয়েছে।

لَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلٰى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلٰى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

আমি যখন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর পথে কাফিরদের হাতে নিহত হচ্ছি তখন আমার হত্যা যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন, আমি কোন কিছুকে ভয় করি না।
আমি জানি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমার মৃত্যু হচ্ছে। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার শরীরের বিখন্ডীকৃত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই বরকত দান করতে পারেন।'
এরপর খুবাইব (রাঃ)-কে আবূ সুফইয়ান বলল, 'তোমার নিকট এটা কি পছন্দনীয় যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আমাদের এখানে পেয়ে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে আর তুমি নিজ আত্মীয় স্বজনসহ জীবিত থাকবে?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এটাই তো সহনীয় নয় যে, আমি আপন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেঁচে থাকি এবং তার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে যেখানে তিনি অবস্থান করছেন একটি কাঁটার আঘাত লেগে যায় এবং সে আঘাতে তিনি ব্যথিত হন।'
এরপর মুশরিকরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করল এবং তাঁর লাশ দেখানোর জন্য লোক নিযুক্ত করে দিল। কিন্তু 'আমির বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) তথায় আগমন করলেন এবং রাত্রিবেলা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাফন-দাফন করলেন। খুবাইব (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল উক্কবাহ বিন হারিস। খুবাইব (রাঃ) তার পিতা হারিসকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন।
সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, খুবাইব (রাঃ) সর্বপ্রথম সম্মানিত ব্যক্তি যিনি হত্যার মুহূর্তে দু' রাক'আত সালাত আদায় করার প্রথা চালু করেছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল, অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না।
দ্বিতীয় সাহাবী যাকে এ ঘটনায় ধরা হয়েছিল তিনি ছিলেন যায়দ বিন দাসিন্নাহ। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে ক্রয় করে নিয়ে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।
কুরাইশগণ 'আসিম (রাঃ)-এর দেহের অংশ বিশেষ আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে সনাক্ত করা। কারণ বদর যুদ্ধে তিনি বিশিষ্ট কোন এক কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন এক ভীমরুলের ঝাঁক প্রেরণ করলেন যারা কুরাইশ লোকজনদের দুরভিসন্ধি থেকে এ লাশ হেফাজত

করল। কুরাইশদের পক্ষে লাশের কোন অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হল না। ‘আসিম আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। উমার যখন এ ঘটনা অবগত হলেন তখন বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন বান্দাকে তাঁর মৃত্যুর পরেও হেফাজত করেন যেমনটি করেন জীবিত অবস্থায়।

বি’রে মাউনাহর মর্মান্তিক ঘটনা

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসেই বি’রে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নজদ অঞ্চল থেকে আবু বারা নামক একজন মুশরিক নাবী (ﷺ) এর নিকট আগমণ করলে তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে ইসলাম গ্রহণও করে নি, প্রত্যাখ্যানও করে নি। বরং সে বলল- আপনি যদি নজদ এলাকার লোকদের কাছে আপনার কয়েকজন সাহাবী পাঠাতেন এবং তারা লোকদেরকে আপনার দ্বীনের প্রতি আহবান করত, তাহলে আমার ধারণা তারা তাদের আহবানে সাড়া দিবে।

রসূল (ﷺ) বললেন- আমার আশঙ্কা, নজদবাসীরা তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। আবু বারা তখন বলল- আমি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি। ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন- রসূল (ﷺ) তার সাথে ৪০ জন লোক পাঠিয়ে দিলেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় ৭০ জনের কথা এসেছে। এক্ষেত্রে সহীহ বুখারীর বর্ণনাই সঠিক। এই ৭০ জনের আমীর ছিলেন, মুনযির বিন আমর। এই ৭০ জন ছিল মুসলমানদের খুব সম্মানী, নেতৃস্থানীয় এবং কুরআন পাঠ ও পাঠদানে পারদর্শী। ‘বিরে মাউনা’ নামক স্থানে পৌঁছে উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম বিন মিলহানকে তারা নজদ অঞ্চলের আমের বিন তুফাইলের কাছে রসূল (ﷺ)-এর চিঠিসহ প্রেরণ করলেন। আল্লাহর এই দুশমন চিঠির প্রতি তাকিয়েই দেখেনি। বরং সে হারাম বিন মিলহানের উপর আক্রমণের আদেশ দিলে এক ব্যক্তি পিছন দিক থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল। হারাম স্বীয় শরীর থেকে রক্ত বের হতে দেখে বললেন- কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফল হয়েছি (শাহাদাত বরণ করেছি)। অতঃপর আল্লাহর শত্রু তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বনী আমেরের লোকদেরকে আহবান জানাল। কিন্তু আবু বারা নিরাপত্তা দেয়ার কারণে বনী আমেরের লোকেরা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। তারপর সে বনী সুলাইমের

লোকদেরকে ডাকল। এরা তার আহবানে সাড়া দিল এবং সাহবীদেরকে ঘেরাও করে সকলকেই হত্যা করে ফেলল। এই ছিল বিরে মাউনার সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

গাযওয়ায়ে বনু মুছত্বালিক্ব এবং ইফ্কের (অপবাদের) ঘটনা

বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের সর্দার হারেছ বিন আবু যিরার(الحارث بنُ أبي ضِرَار) রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজ গোত্র এবং সমমনা অন্যান্য আরব বেদুঈনদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। বুরাইদা আসলামীকে পাঠিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) উক্ত খবরের সত্যতা যাচাই করলেন। তিনি সরাসরি গোত্রনেতা হারেছ-এর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে উক্ত বিষয়ে অবহিত করেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ৩রা শা‘বান তারিখে মদীনা হ’তে সসৈন্যে রওয়ানা হন। সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে ওহোদ যুদ্ধ থেকে পিছু হটার পর এ যুদ্ধেই প্রথম মুনাফিকদের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করে। এ সময় মদীনার দায়িত্ব যায়েদ বিন হারেছাহ অথবা আবু যার গেফারী অথবা নামীলাহ বিন আব্দুল্লাহ লায়ছীর উপরে অর্পণ করা হয়।

যাত্রা পথে গোত্রনেতা হারেছ প্রেরিত একজন গুপ্তচর আটক হয় ও নিহত হয়। এ খবর জানতে পেরে হারেছ বাহিনীতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তার সঙ্গে থাকা আরব বেদুঈনরা সব পালিয়ে যায়। ফলে বনু মুছত্বালিকের সাথে কুদাইদ(قُدَيْد) এর সন্নিকটে সাগর তীরবর্তী মুরাইসী‘ নামক ঝর্ণার পার্শ্বে মুকাবিলা হয় এবং তাতে সহজ বিজয় অর্জিত হয়।

উক্ত যুদ্ধ সম্পর্কে জীবনীকারগণের বক্তব্য উক্ত রূপ। তবে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন যে, উক্ত বর্ণনা ভ্রমাত্মক (وَهْم)। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে বনু মুছত্বালিকের সাথে মুসলিম বাহিনীর কোন যুদ্ধই হয়নি। বরং মুসলিম বাহিনী তাদের উপরে আকস্মিক হামলা চালালে তারা সব পালিয়ে যায় ও তাদের নারী-শিশুসহ বহু লোক বন্দী হয়।[1] বনদীদের মধ্যে গোত্রনেতা হারেছ বিন যিরারের কন্যা জুওয়াইরিয়া (جُوَيْرِيَة) ছিলেন। যিনি ছাবেত বিন ক্বায়েস-এর ভাগে পড়েন। ছাবেত তাকে ‘মুকাতিব’ হিসাবে চুক্তিবদ্ধ করেন। মুকাতিব ঐ দাস বা দাসীকে বলা হ’ত, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বীয় মনিবকে দেয়ার শর্তে চুক্তি সম্পাদন করে এবং উক্ত অর্থ পরিশোধ করার পর সে স্বাধীন হয়ে যায়। নবী করীম (ছাঃ) তার পক্ষ থেকে চুক্তি পরিমাণ অর্থ প্রদান পূর্বক তাকে মুক্ত

করেন এবং গোত্র নেতার কন্যা হিসাবে তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। এই বিবাহের ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ বনু মুছত্বালিক গোত্রের বন্দী একশত পরিবারের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। এর ফলে তারা 'রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্রের লোক'(أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) বলে পরিচিতি পায়' (আবুদাউদ হা/৩৯৩১, সনদ হাসান)।

বনী মুসতালেকের যুদ্ধেই আয়িশা (রাঃ) এর গলার হার হারিয়ে যায়। কারণ এই সফরে নাবী (ﷺ) এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) শরীক ছিলেন। ফেরার পথে এক স্থানে যখন কাফেলা যাত্রা বিরতি করল তখন তিনি ইসেত্মনজা করার জন্য মাঠের দিকে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন গলার হার হারিয়ে গেছে। তা অনুসন্ধান করার জন্য তিনি পুনরায় মাঠের দিকে ফেরত গেলেন। এই সময় কাফেলার লোকেরা যাত্রা করল। লোকেরা আয়িশা (রাঃ) এর হাওদাজ (পালকী) দ্রুত উটের উপর উঠিয়ে বেঁধে দিল। তারা মনে করল আয়িশা (রাঃ) এর ভিতরেই আছেন। কারণ উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) ছিলেন তখন খুব হালকা-পাতলা। তাই লোকেরা অনুভব করতে পারেনি।
এই সময় সাফওয়ান বিন মুআত্তাল কাফেলার পিছনে চলতেন। কোন জিনিষ পড়ে থাকলে তা উঠিয়ে নিতেন। সেখানে আয়িশা (রাঃ) কে দেখে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন পাঠ করলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সাফওয়ান পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আয়িশা (রাঃ) কে একবার দেখেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে সহজেই চিনতে পেলেন। ইন্না লিল্লাহ ব্যতীত সাফওয়ান একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। অতঃপর তিনি আদবের সাথে উট নিকটবর্তী করলেন। আয়িশা (রাঃ) উটের উপর আরোহন করলেন। সাফওয়ান উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। পরিশেষে আয়িশা (রাঃ) কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। লোকেরা এই দৃশ্য দেখে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা ও মন্তব্য করতে লাগল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন বিষয়টি জানতে পারল তখন কোন প্রকার বিলম্ব না করেই সাফওয়ানের সাথে ব্যভিচারের তুহমত (অপবাদ) লাগিয়ে দিল। কথাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।
নাবী (ﷺ) এ ব্যাপারে প্রথমে সম্পূর্ণ নিরবতা পালন করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। আলী (রাঃ) তালাক দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কেননা বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। আর সন্দেহযুক্ত কোন বিষয়ে সন্দেহ পরিহার করে নিশ্চিত বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়াই অধিক উপযুক্ত। আলী (রাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল, এতে

করে নাবী (ﷺ) লোকদের বলাবলি শুনে যে পেরেশানীতে পড়েছিলেন, তা থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন।

কিন্তু উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) তালাক দেয়ার বিরোধীতা করলেন। কেননা তিনি জানতেন যে, রসূল (ﷺ) আয়িশা এবং তাঁর পিতা আবু বকর (রাঃ) এর সাথে অপরিসীম ভালবাসা রাখেন ও আয়িশা (রাঃ) এর পূর্ণ পবিত্রতা এবং দ্বীনদারী সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর রসূলের প্রিয় জীবন সঙ্গিনীকে এ ধরণের অপরাধে জড়ানো হবে- এটা কখনই হতে পারেনা। এই বুনিয়াদ তথা আয়িশা (রাঃ) এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই উসামা (রাঃ) কথা বলেছিলেন এবং আল্লাহর রসূল থেকে টেনশন দূর করার জন্যই আলী (রাঃ) উপরোক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন। আয়িশা (রাঃ) এর পবিত্রতার ব্যাপারে তাঁর কোন প্রকার সন্দেহ থেকে তিনি কথাটি বলেন নি। মুনাফেকরা যেই রকম ধারণা করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের জন্য সেই রকম মানের একজন সঙ্গিনী নির্ধারণ করবেন- তা হতেই পারেনা।

মূলতঃ সকল সাহাবীর পূর্ণ ইয়াকীন এটিই ছিল যে, আয়িশা (রাঃ) এর চরিত্র সম্পূর্ণ পবিত্র এবং সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত। নাবীয়ে আকরাম (ﷺ) এর জীবন সঙ্গিনীর ক্ষেত্রে এ ধরণের কল্পনা তাদের মনে আসতেই পারেনা। এ জন্যই আবু আইয়্যুব আনসারী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ কথাটি শুনার সাথে সাথেই বলেছিলেন-

مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

"এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিৎ নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ"।

এই ঘটনার পর পূর্ণ একমাস অহী আসা বন্ধ ছিল। পরিশেষে যখন আয়িশা (রাঃ) এর পবিত্রতায় কুরআন নাযিল হল এবং নাবী (ﷺ) তা পাঠ করলেন তখন আবু বকর (রাঃ) খুশীতে আত্মহারা হলেন। তিনি তাঁর কন্যা আয়িশাকে বলতে লাগলেনঃ উঠ! রসূল (ﷺ) এর শুকরিয়া আদায় কর। এই কথা শুনে আয়িশা (রাঃ) যেই সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং যেই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেনঃ মুসলিম জাতি তা চিরদিন স্মরণ রাখবে। তিনি বলেছিলেন- আল্লাহর শপথ! আমি এ ব্যাপারে কখনই তাঁর শুকরিয়া আদায় করবনা। আমি শুধু সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব, যিনি আমার পবিত্রতায় কুরআন নাযিল করেছেন। এই কথায় তাঁর নির্মল চরিত্র, সৎসাহস এবং ঈমানী দৃঢ়তার বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

অহীর মাধ্যমে যখন আয়িশা (রাঃ) এর পবিত্রতা ছাবেত (প্রমাণিত) হয়ে গেল তখন তিনি অপবাদ প্রদানকারীদের প্রত্যেককেই আশিটি করে বেত্রাঘাত করলেন। কেননা তাদের মিথ্যাচারিতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল

খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ হল, ইহুদীরা যখন দেখল যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা জয়লাভ করেছে ও মুসলিমগণ পরাজিত হয়েছে এবং তারা শুনতে পেল যে, আগামী বছর আবু সুফিয়ান বদর প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করবে, তখন তাদের সাহস বেড়ে গেল। সুতরাং ইহুদী নেতারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গমণ করল। তারা মক্কায় গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল এবং রসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে তারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করল। ইহুদীদের আগ্রহ দেখে কুরাইশদের হিম্মত ও সাহস বেড়ে গেল। ইহুদীদের পরামর্শ মুতাবেক তারা রণপ্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এ লক্ষ্যে তারা গাতফান এবং অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট গমণ করল। তারা তাদেরকে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানাল। তারা সেই ডাকে সাড়া প্রদান করল।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন আরব গোত্রের ১০ হাজার স্বশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গেল। এদের মধ্যে কিছু ইহুদীও ছিল। আবু সুফিয়ান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। পূর্ণ প্রস্তুতি সহ তারা মদ্বীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

সংবাদ পেয়ে নাবী (ﷺ) সালমান ফারসীর পরামর্শে মদ্বীনার চার পার্শে খন্দক তথা পরীখা খননের পর তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদ্বীনার মূল শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় ইহুদী গোত্রগুলোও চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলিত হল এবং মুনাফেকদের নিফাকীও প্রকাশিত হয়ে গেল। এতে মুসলিমদের উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ল এবং অনেক লোকই ভীত হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যেই কুরাইশ বাহিনী মদ্বীনার নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং চতুর্দিক থেকে মদ্বীনাকে ঘেরাও করে ফেলল। পূর্ণ একমাস তারা কঠোরভাবে মদ্বীনাকে অবরোধ করে রাখল। মুশরিক ও মুসলিম শিবিরের মাঝখানে খন্দক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর কারণে কোন প্রকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। পরিশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফেরদের উপর বিরাট এক

বাতাস প্রেরণ করলেন। প্রচন্ড বাতাসে তাদের তাবুগুলো উল্টে গেল। এতে করে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি প্রবেশ করল। তারা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নিয়ে ফেরত গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৈনিকদেরকে বিজয় দান করলেন এবং দুশমনদেরকে একাই পরাজিত করলেন।

মুশরিকরা চলে যাওয়ার পর রসূল (ﷺ) ও মদ্বীনায় প্রবেশ করে যুদ্ধের হাতিয়ার খোলা শুরু করলেন। তখন জিরীল ফিরিস্তা এসে বললেন- আপনারা অস্ত্র ছেড়ে দিচ্ছেন? অথচ আল্লাহর ফিরিস্তাগণ এখনও যুদ্ধের পোশাক খুলেন নি। মোটকথা তিনি জানতে পারলেন যে, বনী কুরায়যার ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তিনি সাথে সাথে ঘোষণা করে দিলেন যে, বনী কুরায়যার যমীনে পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সলাত না পড়ে। এই ঘোষণা শুনে মুসলিমগণ দ্রুত বের হয়ে পড়লেন। নাবী (ﷺ) ও বের হয়ে পড়লেন। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছার পর ইহুদীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হল। যার ভাগ্যে হত্যা নির্ধারিত ছিল সে নিহত হল। বাকীরা অপমানিত হয়ে মুসলিমদের হাতে বন্ধী হল। খন্দক ও বনী কুরায়যার যুদ্ধে মুসলিমদের মোট দশজন লোক শহীদ হল।

উরায়নার ঘটনা

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন- একদা উরায়না কিংবা উক্ল গোত্রের কিছু লোক নাবী (ﷺ) এর কাছে আগমণ করল। মদ্বীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থের অনুকুল না হওয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে গেল। নাবী (ﷺ) তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যেতে আদেশ করলেন এবং বললেন- তোমরা উটের দুধ এবং পেশাব পান কর। তারা তথায় চলে গেল। কিছু দিন পর সুস্থ হয়ে তারা নাবী (ﷺ) এর রাখালকে হত্যা করল এবং পশুগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। দিবসের প্রথম ভাগে যখন নাবী (ﷺ) এর নিকট এ সংবাদ আসল, তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য একদল সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। দ্বিপ্রহরের সময় তাদেরকে পাকড়াও করে রসূল (ﷺ) এর দরবারে নিয়ে আসা হল। নাবী (ﷺ) এর আদেশে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল এবং লোহার কাঠি গরম করে তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দেয়া হল। তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর উপর ফেলে রাখা হল। তারা পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলেও তাদেরকে পানি দেয়া হল না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন- এই ঘটনা থেকে জানা গেল, (১) উটের পেশাব পান করা জায়েয।

(২) যে সমস্ত পশুর মাংস খাওয়া হালাল সে সমস্ত পশুর পেশাব পবিত্র।

(৩) আরও জানা গেল, যারা সন্ত্রাসী তাদেরকে হাত-পা কর্তন করসূহ হত্যা করা জায়েয।

(৪) সন্ত্রাসী কোন মানুষকে যেভাবে হত্যা করবে, তাকে সেভাবেই হত্যা করতে হবে। তারা নাবী (ﷺ) এর রাখালের চোখে গরম কাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাই কিসাস স্বরূপ তাদেরকে সেভাবেই শাস্তি দেয়া হয়েছে। এই ঘটনা থেকে একটি স্বতন্ত্র বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। আর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হুদুদ তথা দন্ডবিধির হুকুম-আহকাম নাযিল হওয়ার পূর্বে। তবে হুদুদের আহকাম নাযিল হওয়ার পর এই বিধান রহিত হয়ে যায়নি; বরং তাকে বহাল রেখেছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির বর্ণনা

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, নাবী (ﷺ) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রথমে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য একজন গোয়েন্দা মক্কায় পাঠালেন। উসফান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাকে কাবার কাছেই পৌঁছতে দিবেনা এবং তাঁর সাথে তারা প্রচন্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। নাবী (ﷺ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। আবু বকর (রাঃ) এর পরামর্শ ছিল, কুরাইশদেরকে কোন প্রকার ছাড় দেয়া যাবেনা। তারা যদি রাস্তায় আটকিয়ে দেয়, তাহলে প্রয়োজনে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। রসূল (ﷺ) আবু বকরের এই মতকেই পছন্দ করলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে নাবী (ﷺ) উছমান (রাঃ) কে এই খবর দেয়ার জন্য মক্কায় পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসছিনা। উমরাহ পালন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু কুরাইশরা এই কথার মোটেই মূল্যায়ন করলনা। তারা বলল- আমরা তোমার কথা শুনলাম। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। এক পর্যায়ে সন্ধির পরিবর্তে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। উভয় পক্ষের লোকেরা পরস্পর তীর ও পাথর নিক্ষেপে লিপ্ত হল। এই পর্যায়ে নাবী

(ﷺ) এর কাছে খবর পৌঁছল যে, কুরাইশরা উছমান (রাঃ) কে হত্যা করে ফেলেছে। মুসলমানেরা এই খবর শুনে রসাূন্বিত হলেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তারা একটি গাছের নীচে একত্রিত হয়ে রসূল (ﷺ) এর হাতে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং কোনক্রমেই এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ না নিয়ে মদ্বীনায় ফেরত যাবেন না। কিন্তু একটু পরেই সহীহ-সালামতে উছমান (রাঃ) মক্কা হতে ফেরত আসলেন। উছমান (রাঃ) এর আগমণে পরিস্থিতি শান্ত হল। পুনরায় নতুন করে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে নিম্নে বর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি রচিত হল। ইসলামের ইতিহাসে এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ

সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তগুলো ছিল এই-

- মদ্বীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
- এই বছর মুসলমানেরা উমরাহ না করেই মদ্বীনায় ফেরত যাবেন।
- আগামী বছর তারা মক্কায় আগমণ করতে পারবেন। এ সময় তারা সাথে তীর ও বর্শা আনতে পারবেন না। আত্মরক্ষার জন্য শুধু কোষবদ্ধ তলোয়ার সাথে রাখতে পারবে।
- মক্কায় তারা কেবল তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। তিন দিন পার হওয়ার সাথে সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে চলে যেতে হবে।
- এই দশ বছরের মধ্যে মক্কার কোন লোক যদি মুসলমান হয়ে মদ্বীনায় আশ্রয় নেয় তাহলে মদ্বীনাবাসীগণ তাকে আশ্রয় দিবে না। পক্ষান্তরে মদ্বীনার কোন লোক যদি মক্কায় চলে আসে তাহলে মক্কাবাসীগণ তাকে মদ্বীনায় ফেরত দিবে না।

চুক্তির এই শেষ শর্তটি মেনে নেওয়া মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ছিল। তারা নাবী (ﷺ) এর কাছে বলতে লাগলেনঃ হে আল্লাহর নাবী! আমরা কি এই শর্তটিও মেনে নিব? নাবী (ﷺ) বললেন- তাদের যে লোক মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে,

আমরা তাকে তাদের নিকট ফেরত দিব। আল্লাহ তা‘আলা তার কোন না কোন ব্যবস্থা করবেন।

চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নাবী (ﷺ) মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, কুরবানী করে ফেল এবং মাথা কামিয়ে ফেল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

- এই সন্ধির পর মক্কার খোযাআ গোত্র নাবী (ﷺ) এর সাথে যোগ দিল আর বনী বকর কুরাইশদের পক্ষ নিল।
- হুদায়বিয়ার বছর এই হুকুম নাযিল হল যে, ইহরাম অবস্থায় কেউ যদি অসুবিধার কারণে মাথা কামাতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে ফিদইয়া স্বরূপ তিন দিন সিয়াম রাখতে হবে, অথবা সাদকাহ করতে হবে অথবা একটি কোরবানী করতে হবে। বিধানটি নাযিল হয়েছিল কা’ব বিন উজরাকে কেন্দ্র করে।
- এই সন্ধির ঘটনায় নাবী (ﷺ) মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল খাটোকারীদের জন্য একবার দু’আ করেছেন।
- এই ঘটনার সময় দশ জনের পক্ষ হতে একটি উট এবং সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কোরবানী বৈধ হওয়ার বিধান জানা যায়।
- এই ঘটনায় সূরা ফাতাহ নাযিল হয়।
- রসূল (ﷺ) যখন মদ্বীনায় ফেরত আসলেন, তখন একদল মু’মিন মহিলা আগমণ করলেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে নিষেধ করলেন। এর মাধ্যমে মহিলাদেরকে ফেরত পাঠানোর বিধান মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়। আবার কেউ বলেছেন- এ বিষয়ে কুরআনের মাধ্যমে সুন্নাতকে খাস করা হয়েছে। এ মতটি খুব শক্তিশালী। আবার কেউ কেউ বলেছেন- শুধু পুরুষদেরকেই ফেরত দেয়ার ব্যাপারে চুক্তি হয়েছিল। তবে মুশরিকরা উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রেই শর্তটি কার্যকর রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বাদশাহ ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদায়বিয়াহ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ ও সমাজপতিদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) প্রস্তাবিত পত্রসমূহ লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর নিকট এ বলে আরয করা হল যে, বাদশাহগণ সে অবস্থায় প্রত্র গ্রহণ করবেন যখন তার উপর সীলমোহর অংকিত থাকবে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি রূপোর আংটি করিয়ে নিলেন যার উপর মুদ্রিত বা খোদিত ছিল মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ মুদ্রণ ছিল তিন পংক্তি বিশিষ্ট এক পংক্তিতে মুহাম্মাদুন, অন্য এক পংক্তিতে ‘রাসূলুন’ এবং তৃতীয় পংক্তিতে ‘আল্লাহ’ শব্দটি মুদ্রিত ছিল।
এ মুদ্রনের আকৃতি ছিল ঠিক এরূপ : [1]

الله
رسول
محمد

অতঃপর বিচক্ষণ, সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহাবীগণণকে (রাঃ) বার্তাবাহক মনোনীত করে তাঁদের মাধ্যমে বাদশাহ ও সমাজপতিগণের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। আল্লামা মানসুরপুরী দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর খায়বার যাত্রার কয়েক দিন পূর্বে ১লা মুহররম ৭ম হিজরীতে এ বার্তা বাহকগণকে প্রেরণ করেছিলেন।[2] পরবর্তী পংক্তিগুলোতে ঐ সকল পত্র ও তার পরিপ্রেক্ষিত এবং কার্যকর প্রভাবসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপন করা হল।

খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা

মুসা বিন উকবা বলেন- হুদায়বিয়া থেকে ফেরত এসে নাবী (ﷺ) ২০ দিন বা এর চেয়ে কম সময় মদ্বীনায় অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় তিনি সিবা বিন উরফুযাকে মদ্বীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। এ সময় আবু হুরায়রা (রাঃ) মদ্বীনায় আগমণ করে ফজরের সলাতে সিবা বিন উরফুযার সাথে সাক্ষাত করলেন। সিবা বিন উরফুযাকে তিনি প্রথম রাকআতে كهيعص তথা সূরা মারইয়াম এবং দ্বিতীয় রাকআতে ويل للمطففين তথা সূরা মুতাফফিফীন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি সলাতেই বলতে শুরু করলেন। উমুক ব্যক্তির জন্য সর্বনাশ হোক! তার নিকট রয়েছে দু’টি দাঁড়িপাল্লা। সে যখন মানুষকে কোন কিছু মেপে দেয়,

তখন ছোট পাল্লা দিয়ে মেপে দেয়। আর যখন মেপে নেয় তখন বড়টি দিয়ে নেয়। সলাত শেষে তিনি সিবা-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) খায়বারে গিয়ে নাবী (ﷺ)এর সাথে মিলিত হলেন। নাবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলায় তারা আবু হুরায়রা ও তাঁর সাথীদেরকে মালে গণীমতের অংশ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনিও গণীমতের অংশ পেলেন।

নাবী (ﷺ) খায়বারে গিয়ে ফজরের সলাত পড়লেন। সলাতের পর মুসলমানগণ আরোহন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নাবী (ﷺ) এর আক্রমণের খবর যেহেতু তাদের জানা ছিল না, তাই তারা সকাল বেলা তাদের চাষাবাদের জমির দিকে বের হচ্ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে দেখে বলল- আল্লাহর শপথ! এই তো মুহাম্মাদ এবং তাঁর বাহিনী এসে গেছে। এই বলে তারা নিজেদের দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। নাবী (ﷺ) তখন বললেন- আল্লাহু আকবার! খায়বার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন সকাল বেলা কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।

অতঃপর নাবী (ﷺ) আলীকে যুদ্ধের পতাকা দিলেন। হাদীছের কিতাবসমূহে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর লেখক মারহাব নামক ইহুদীর সাথে আলী (রাঃ) এর লড়াইয়ের বর্ণনা এবং আমের বিন আকওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় আলী (রাঃ) মারহাবকে হত্যা করেছেন।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী খায়বারবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় মুসলিমগণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় যখন তারা খাওয়ার জন্য গৃহপালিত গাধা যবেহ করল তখন রসূল (ﷺ) তাদেরকে গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করলেন। পরিশেষে তাদের সাথে এই শর্তে মীমাংসার চুক্তি করলেন যে, তারা খায়বার ছেড়ে চলে যাবে এবং যুদ্ধের হাতিয়ার ব্যতীত যত ইচ্ছা সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। তবে স্বর্ণ ও রেŠপ্য রসূল (ﷺ) এর জন্য রেখে যেতে হবে। আর শর্ত করা হল যে, কেউ যদি কোন কিছু গোপন করে কিংবা লুকিয়ে ফেলে, তবে তার জন্য নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকর হবেনা। অতঃপর তারা একটি মশক (কলসী) লুকিয়ে ফেলল। তাতে হুআই বিন আখতাবের সম্পদ লুকায়িত ছিল। বনী নযীর কবীলাকে উচ্ছেদ করার সময় সে তা খায়বারে নিয়ে এসেছিল। নাবী (ﷺ) হুআই বিন আখতাবের চাচাকে মশকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল- যুদ্ধ এবং অন্যান্য খরচে তা শেষ হয়ে গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন- দিন তো বেশী হয়নি। সম্পদ ছিল বিপুল পরিমাণ। এত দ্রুত

সম্পদগুলো শেষ হয়ে গেল কিভাবে? অতঃপর নাবী (ﷺ) হুআইয়ের চাচার খোঁজ-খবর রাখার জন্য যুবাইর (রাঃ) কে নিযুক্ত করে দিলেন। যুবাইর (রাঃ) যখন তার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন, তখন সে বলল- আমি হুআইকে এই অঞ্চলের বিরানভূমির আশেপাশে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে তালাশ করে তা পেয়ে গেলেন।
অতঃপর রসূল (ﷺ) যখন উপরোক্ত শর্তে তাদেরকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করলেন, তখন তারা বলল- এই শর্তে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন যে, আমরা এখানের যমীন চাষাবাদ করব এবং উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে আমরা অর্ধেক নিব আর আপনি বাকী অর্ধেক নিবেন।
ঐ দিকে রসূল (ﷺ) এর কাছে কাজ করার মত কোন লোক ছিলনা। তাই তিনি তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন।
ইহুদীরা খায়বারে কত দিন থাকতে পারবে? চুক্তিতে এটি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ ছিলনা; বরং বিষয়টি রসূল (ﷺ) এর ইচ্ছার উপর দেয়া হয়েছিল। যত দিন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দিবেন।
চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি তাদের কাউকেই হত্যা করেন নি। তবে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাদের একজন ছিল হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়ার স্বামী।
রসূল (ﷺ) সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে বন্ধী করলেন। তিনি আবুল হুকাইকের এক পুত্রের বিবাহধীন ছিলেন। নাবী (ﷺ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করলেন। মুক্ত করে দেয়াটাই বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করলেন।
খায়বারের ভূমিকে নাবী (ﷺ) ৩৬ ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগকে আবার ১০০ ভাগে ভাগ করে মোট ৩৬০০ অংশে ভাগ করলেন। এখান থেকে রসূল (ﷺ) এবং মুসলমানগণ অর্ধেক অর্থাৎ ১৮০০ অংশ নিলেন। আর বাকী অংশগুলো তথা ১৮০০ অংশ সেখানকার যমীন দেখা-শুনাকারী এবং বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য রেখে দিলেন।
ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন- খায়বারের যমীন মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার কারণ হল সেখানকার এক অংশ জয় করা হয়েছিল যুদ্ধ করে আরেক অংশ জয় করা হয়েছিল সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে। যেই অংশ লড়াইয়ের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল, তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। আর যেই অংশ চুক্তির মাধ্যমে বিজিত

হয়েছিল, তা খায়বারের যমীন দেখা-শুনাকারীদের জন্য এবং মুসলমানদের স্বার্থে রেখে দেয়া হয়েছিল।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে খায়বারের সকল অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল। এটিই সঠিক ও সন্দেহাতীত কথা।

যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত ভূমির ব্যাপারে মুসলমানদের ইমাম সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ যমীন মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ হিসাবে রেখেও দিতে পারেন। অথবা তিনি ইচ্ছা করলে সৈনিকদের মাঝে ভাগ করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তা থেকে কিছু অংশ মুসলমানদের প্রয়োজনে রেখে দিতে পারেন। নাবী (ﷺ) এই তিনটিই করেছেন। বনী কুরয়যা ও বনী নযীরের যমীন তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। মক্কার যমীনকে তিনি ভাগ করেন নি। খায়বারের অর্ধেক ভাগ করেছেন। আর বাকী অর্ধেক রেখে দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যারাই অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলেই খায়বারে শরীক ছিলেন। শুধু জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর রসূল (ﷺ) তাঁকে অংশ দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধের সময় নাবী (ﷺ) এর চাচাতো ভাই জা'ফর বিন আবী তালেব এবং তাঁর সাথীগণ ও আবু মুসা আশআরী (রাঃ) স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

এ যুদ্ধেই একজন ইহুদী মহিলা নাবী (ﷺ) এর জন্য বিষ মিশ্রিত ছাগলের মাংস হাদীয়া (উপহার) দিল। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী সেটি খেলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি সেই মহিলাকে কোন শাস্তি দেন নি। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি মহিলাটিকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা আছে, যারা সেই খাদ্য খেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হতে যখন বিশর বিন বারা মৃত্যু বরণ করলেন, তখন নাবী (ﷺ) সেই মহিলাকে হত্যা করেছেন।

মক্কায় যখন খায়বারের যুদ্ধের খবর পৌঁছল, তখন কুরাইশরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তারা পরস্পর বাজি ধরল। একদল বলল- মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ জয়লাভ করবে। আরেক দল বলল- দু'টি বন্ধুগোত্র এবং খায়বারের ইহুদীরা জয়লাভ করবে।

অতঃপর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) হাজ্জাজ বিন ইলাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি খায়বার বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হাজ্জাজের প্রচুর সম্পদ ছিল।

খায়বার বিজয়ের পর তিনি রসূল (ﷺ) কে বললেন- মক্কায় আমার স্ত্রীর নিকট স্বর্ণ ও অন্যান্য সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। সে এবং তার পরিবারের লোকেরা যদি আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে আমার সমস্ত সম্পদ হাত ছাড়া হবে। আমাকে অনুমতি দিন। খায়বার বিজয়ের খবর তাদের কাছে যাওয়ার পূর্বেই আমি দ্রুত মক্কায় পৌঁছে যাই এবং আমার সম্পদগুলো হস্তগত করে নেই। তবে আমি মক্কায় গিয়ে এমন কিছু বলতে চাই, যার মাধ্যমে আমি আমার জান ও মালকে হেফাজত করতে পারব। রসূল (ﷺ) তাঁকে কিছু (মিথ্যা) বলার অনুমতি দিলেন।

মক্কায় গিয়ে হাজ্জাজ বিন ইলাত (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বললেন- আমার ব্যাপারটি গোপন রাখ এবং তোমার নিকট আমার যে সমস্ত মাল রয়েছে, তা একত্রিত কর। কেননা আমি মুহাম্মাদ এবং তার সাথীদের গণীমত ক্রয় করব। কারণ তারা মদ্বীনায় পরাজিত হয়েছে। মুহাম্মাদ বন্দী হয়েছে এবং তার সাথীরা তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ইহুদীরা শপথ করে বলছে যে, তারা মুহাম্মাদকে মক্কায় পাঠাবে, যাতে তারা তাকে হত্যা করতে পারে।

খবরটি মক্কায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মক্কার মুসলিমগণ খবরটি শুনে ব্যথিত হলেন। অপর পক্ষে মক্কার মুশরিকরা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করল। রসূল (ﷺ) এর চাচা আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের কাছে খবরটি পৌঁছলে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। খবর শুনে তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট রইলনা। তার গৃহের দরজায় মুসলিম ও মুশরিকদের অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটল। তাদের কেউ আনন্দ প্রকাশ করছিল আবার কেউ দুঃখ প্রকাশ করছিল। পরক্ষণেই আববাস দৃঢ়তার সাথে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। এতে তিনি এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে, তাতে মনে হয় মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পরাজয় বরণ করার খবর সঠিক হতে পারেনা। কারণ আববাসের জানা ছিল যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনও মিথ্যা হতে পারেনা। কবিতার ভাষায় আববাসের দৃঢ়তা দেখে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর অনুসারী এবং তার শুভাকাঙ্খীদের মনে সাহসের সঞ্চার হল। মুশরিকরা মনে করল, আববাসের কাছে হয়ত অন্য কোন খবর থাকতে পারে। অতঃপর আববাস খবরটির সত্যতা যাচাই করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইলাতের কাছে স্বীয় খাদেমকে পাঠালেন। পাঠানোর সময় খাদেমকে বলে দিলেনঃ তুমি গোপনে হাজ্জাজের সাথে মিলিত হও এবং বলঃ মরণ হোক তোমার! এ কি সংবাদ শুনালে? মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা যে ওয়াদা করেছেন, তা তোমার এই খবরের চেয়ে অনেক

ভাল। খাদেম যখন হাজ্জাজের সাথে কথা শেষ করল তখন হাজ্জাজ বলল- তুমি গিয়ে আবুল ফজল তথা আববাসকে আমার সালাম দাও এবং এ কথা জানিয়ে দাও সে যেন, তাঁর কোন একটি ঘরে একাকী অবস্থান করে। আমি অচিরেই তার সাথে দেখা করে এমন খবর দিব, যা তাকে খুশী করবে। খাদেম ঘরের দরজায় এসে বলল- হে আবুল ফজল (আববাস)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এই কথা শুনে আববাস (রাঃ) খুশীতে লাফিয়ে উঠলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি বিপদজনক কোন খবরই শুনেন নি। তিনি এগিয়ে এসে খাদেমের দু'চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন। অতঃপর খাদেম হাজ্জাজের কথা জনিয়ে দিল। এতে খুশী হয়ে তিনি সেই দাসকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি সেই খাদেমকে বললেন- হাজ্জাজ তোমাকে যা বলেছে, এবার আমাকে তা শুনাও। খাদেম বলল- তার সাথে একামেত্ম সাক্ষাত করার জন্য একটি ঘরে একাকী প্রবেশ করুন। তিনি আজ দুপুরে আপনার কাছে আসবেন এবং কথা বলবেন।

সুতরাং হাজ্জাজ আসলেন এবং আববাসের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করলেন। হাজ্জাজ তাঁর কাছে এসে প্রথমে অঙ্গিকার নিলেন যে, অবশ্যই এই খবর মক্কাবাসী থেকে গোপন রাখতে হবে। আববাস নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে গেলেন।

এবার হাজ্জাজ আসল ঘটনা খুলে বলতে লাগলেন। তিনি বলেন- আমি দেখে আসলামঃ আপনার ভাতিজা খায়বারবাসীর উপর জয়লাভ করেছে, তাদের সমস্ত সম্পদ গণীমত হিসাবে তাঁর হস্তগত হয়েছে এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে মুসলিমগণ তা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। আর সেখানকার রাজার কন্যা সাফিয়া বিনতে হুআইকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে ফেলেছেন এবং তার সাথে বাসরও করে ফেলেছেন। আর আমি এখানে এসেছি, যাতে আমার সম্পদগুলো একত্রিত করে নিয়ে যেতে পারি। আমি রসূল (ﷺ) থেকে অনুমতি নিয়েই সেচ্ছায় এ ব্যাপারে মূল সত্যটি গোপন করছি। সুতরাং আপনি তিন দিন পর্যন্ত আমার এই খবর গোপন রাখুন। তিন দিন পর আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন।

যাই হোক হাজ্জাজের স্ত্রী তার সমস্ত সম্পদ একত্রিত করল। সম্পদগুলো নিয়ে হাজ্জাজ দ্রুত গতিতে মদ্বীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তিন দিন পার হওয়ার পর আববাস (রাঃ) হাজ্জাজের স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন- তোমার স্বামীর খবর কি? সে বলল- তিনি তো মদ্বীনায় গমণ করেছেন। হে আবুল ফজল! আল্লাহ্ আপনাকে চিন্তামুক্ত রাখুন। আপনার ভাতিজার খবর শুনে আমরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি বললেন- হ্যাঁ, ঠিক আছে। আল্লাহ্ আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না। আমি যা পছন্দ করি, আল্লাহর মেহেরবানীতে

তাই হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে খায়বারের বিজয় দান করেছেন। তাতে আল্লাহর ফয়সালা কার্যকর হয়েছে। সেই সাথে আমার ভাতিজা খায়বারের রাজার মেয়েকে বিয়েও করে ফেলেছেন। এখন যদি তোমার স্বামীর প্রতি তোমার দরদ থাকে, তাহলে মদ্বীনায় গিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর সাথে মিলিত হও। হাজ্জাজের স্ত্রী বলল- আমার ধারণা আপনি ঠিকই বলেছেন। আববাস বললেন- আল্লাহর শপথ! আমি সত্য বলছি। আমি যা বলছি, বাস্তবেও তাই।

এবার হাজ্জাজের স্ত্রী বলল- আপনাকে এ বিষয়ে কে খবর দিয়েছে? আববাস (রাঃ) বললেন- তোমাকে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে খবর দিয়েছেন, আমাকেও তিনি খবর দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমার স্বামীই আমাকে তা জানিয়েছেন। এরপর আববাস কুরাইশদের মজলিসের দিকে গেলেন। কুরাইশরা আববাসকে দেখেই বলতে লাগল- আল্লাহর শপথ! হে আবুল ফজল! আপনাকে খুশী খুশী মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে আপনার কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমার কোন অকল্যাণ হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ। হাজ্জাজ আমাকে এই এই খবর দিয়েছেন। অর্থাৎ খায়বারবাসীর উপর আমার ভাতিজা মুহাম্মাদের জয়লাভের খবর দিয়েছেন। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি আমাকে এই খবরটি তিন দিন গোপন রাখতে বলেছেন। তাই তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আজ আমি তোমাদেরকে সেই সুখবরটি দিচ্ছি। মক্কাতে খবরটি ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমগণ দ্রুত বের হয়ে আববাস (রাঃ) এর কাছে গেলেন। তিনি তাদেরকে সংবাদটি শুনালেন। এই খবরের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিলেন এবং তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিষাক্ত বকরির ঘটনা

খায়বার বিজয়ের পর যখন রাসূলে কারীম (ﷺ) নিরাপদ হলেন এবং তৃপ্তিবোধ করলেন তখন সালাম বিন মুশরিকের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস উপঢৌকন হিসেবে বকরির ভূনা মাংস তাঁর নিকট প্রেরণ করে। সে বিভিন্ন সূত্র থেকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জেনে নিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বকরির মাংসের কোন কোন অংশ অধিক পছন্দ করেন। তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি রানের মাংস অধিক পছন্দ করেন। এ জন্য সে রানের মাংসগুলো ভাল ভাবে বিষ মিশ্রিত করেছিল এবং অবশিষ্ট অন্যগুলোতেও বিষ প্রয়োগ করেছিল। অতঃপর সে মাংসগুলো নাবী কারীম (ﷺ)-এর সামনে এনে রাখা হলে নাবী

কারীম (ﷺ) রানের মাংসের টুকরোটি উঠিয়ে তার কিছু অংশ চিবুনোর পর মুখ থেকে বের করে তা ফেলে দিলেন এবং বললেন,(إِنَّ هٰذَا الْعَظْمُ لَيُخْبِرُنِيْ أَنَّهُ مَسْمُوْم)'এ হাড্ডি আমাকে বলছে যে এর সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে।'

এরপর নাবী কারীম (ﷺ) যায়নাবকে ডাকিয়ে নিয়ে তাকে যখন বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন তখন সে বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করল। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এমন কাজ করলে কেন? সে উত্তরে বলল, 'আমি চিন্তা করলাম যে, এ ব্যক্তি যদি বাদশাহ হন তাহলে আমরা তাঁর থেকে নিস্কৃতি লাভ করব, আর যদি তিনি নাবী হন তাহলে তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি বেঁচে যাবেন। তার এ কথা শুনে নাবী কারীম (ﷺ) তাকে ক্ষমা করলেন। এ সময় নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন বিশর বিন বারা' বিন মারুর (রাঃ)। তিনি এক গ্রাস গিলে ফেললেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এ মহিলাকে নাবী (ﷺ) ক্ষমা করেছিলেন কিংবা হত্যা করেছিলেন সে ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) প্রথমে মহিলাকে ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু যখন বিশর (রাঃ)-এর মৃত্যু সংঘটিত হয়ে গেল তখন তাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হল।

ক্বাযা উমরাহ

ইমাম হাকিম বলেছেন, এ সংবাদ ধারাবাহিকতার সঙ্গে প্রমাণিত যে, যখন যুল ক্বা'দাহর চাঁদ দেখা গিয়েছিল, তখন নাবী কারীম (ﷺ) সাহাবাবৃন্দের (রাঃ) প্রত্যেককেই ক্বাযা হিসেবে নিজ নিজ উমরাহ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। যাঁরা হুদায়বিয়াহয় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই উমরাহ আদায়ে শরীক হবেন, কেউ পিছনে থাকবেন না। এ প্রেক্ষিতে (সে সময়) যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই যাত্রা করেন। হুদায়বিয়াহয় উপস্থিত ছিলেন না এমন কিছু সংখ্যক লোকও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে বের হন। এভাবে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বহির্গত লোকের সংখ্যা ছিল দু' হাজার। মহিলা এবং শিশুরা ছিল এ সংখ্যার অধিক।

রাসূলে কারীম (ﷺ) এ সময়ে আবূ রুহম গিফারী (রাঃ)-কে মদীনায় তাঁর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন ৬০টি উট এবং সে সব দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন নাজিয়া বিন জুন্দুব আসলামী (রাঃ)-কে। যুল হুলাইফাতে উমরাহর

জন্য ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বায়িক ধ্বনি উঁচু করলেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে মুসলিমরাও লাব্বায়িক পড়লেন। মুশরিকদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কায় কাফেলার লোকজনদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। ইয়া’জুজ নামক উপত্যকায় পৌঁছার পর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ বর্ম, ঢাল, তরবারী, তীর, বর্শা সব কিছু রেখে দেয়া হল এবং ওগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য আওস বিন কাওলী আনসারী (রাঃ)-কে ২০০ লোকসহ নিযুক্ত করা হল। আরোহীগণ অস্ত্র ও খাপে রক্ষিত তরবারী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।[2]

মক্কায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন। মুসলিমগণ তরবারীগুলো কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং রাসূলে কারীম (ﷺ)-কে সকলের মধ্যস্থলে রেখে লাব্বায়িক ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন।

মুশরিকরা মুসলিমগণের এ অগ্রাভিযানকে একটি তামাশা সুলভ ব্যাপার মনে করে তা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরে হয়ে এসে কা‘বা গৃহের উত্তর দিকে অবস্থিত কু’আইক্বি’আন নামক পাহাড়ের উপর গিয়ে বসেছিল এবং কথোপকথন সূত্রে তারা পরস্পর বলাবলি করছিল যে, ‘তোমাদের নিকট এমন একটি দল আসছে ইয়াসরিবের অর্থাৎ মদীনার জ্বর যাদের একদম নষ্ট করে দিয়েছে।’ এ কারণে নাবী কারীম (ﷺ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, প্রথম তিনটি চক্কর যেন তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শেষ করেন। রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্বাভাবিক অবস্থায় অতিক্রম করবে। সাত চক্কর দৌঁড়ে পালন করার নির্দেশ শুধুমাত্র রহমত ও মমত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই দেন নি, বরং উল্লেখিত নির্দেশ প্রদানের অভিপ্রায় এই ছিল যে, মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করুক।[3] এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে ইযতিবার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। ইযতিবার অর্থ হচ্ছে, ডান কাঁধ খোলা রাখা এবং গায়ের চাদর খানা ডান বগলের নীচ দিয়ে অতিক্রম করিয়ে অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিক হতে তার দ্বিতীয় কোণটি বাম কাঁধের উপর নিয়ে নেয়া।

রাসূলে কারীম (ﷺ) সেই গিরিপথ ধরে মক্কায় প্রবেশ করলেন যা হাজূনের দিকে বের হয়েছে। নাবী কারীম (ﷺ)-কে দেখার জন্য মুশরিকগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। একটানা ‘লাববায়িক’ ধ্বনি উচ্চারণ করে চলছিলেন। অতঃপর হারামে পৌঁছে তিনি নিজ লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা‘বা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। মুসলিমগণও কা‘বা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। ঐ সময় আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা

(রাঃ) তরবারী কাঁধে ঝুঁলিয়ে রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর আগে আগে গমন করছিলেন এবং যুদ্ধাবৃত ছন্দের নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন-
বর্ণনা সমূহের মধ্যে উল্লেখিত কবিতাগুলো এবং তার বিন্যাস সম্পর্কে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলোকে আমি একত্রিত করে দিয়েছি।

خلو بني الكفار عنسبيله خلوا فكل الخيرفي رسوله
قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى عَلٰى رسوله
يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله
بأن خير القتال في سليله اليوم نضربكم عَلٰى تنزيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليه

অর্থ : 'কাফিরগণের পুত্র! এদের পথ ছেড়ে দাও। পথ ছেড়ে দাও এই জন্য যে, যাবতীয় কল্যাণ তাঁর পয়গম্বরত্বে রয়েছে। রহমান স্বীয় কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ সহীফা সমূহের মধ্যে যা তাঁর পয়গম্বরের উপর পাঠ করা হয়। হে আমার প্রতিপালক! আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তা গ্রহণ করা সত্য বলে আস্থা পোষণ করছি যে, ঐ নিহত হওয়াই সর্বোত্তম যা আল্লাহর পথে হয়। আজ আমরা তাঁর কোরআন অনুযায়ী তোমাদেরকে এভাবে মারব যে মাথার খুলি মাথা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বন্ধুকে বন্ধু হতে বেখবর করে দেবে।
আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, এ প্রেক্ষিতে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেন, 'ওহে রাওয়াহার পুত্র! তুমি রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর সামনে এবং আল্লাহর পবিত্র ও মর্যাদামন্ডিত স্থানে কবিতা আবৃত্তি করছ?'
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেন, (ِخَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهُوْ أَسْرَعُ فِيْهِمْ مِّنْ نَضْحِ النَّبْلِ) 'হে উমার! ওকে আবৃত্তি করতে দাও। কারণ, এটা তাদের জন্য বর্শার আঘাত হতেও অধিক তীক্ষ্ণ।''[4]
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ দৌঁড় দিয়ে তিন চক্কর শেষ করলেন। তা প্রত্যক্ষ করে মুশরিকগণ বলতে থাকল, এ সকল লোকজন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাতো সঠিক নয়[5] বরং এরা সাধারণ লোকজন হতেও অধিক শক্তিশালী।
আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে নাবী কারীম (ﷺ) সাফা' ও মারওয়ার সা'ঈ করলেন। ঐ সময়ে নাবী কারীম (ﷺ)-এর কুরবানীর পশু মারওয়া পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সা'ঈ শেষে বললেন, 'এটা হচ্ছে কুরবানীর জায়গা এবং মক্কার সমস্ত জায়গা কুরবানীর

স্থান। এরপর মারওয়ার নিকটে পশুগুলোকে কুরবানী করে দিলেন। অতঃপর মাথা মুন্ডন করলেন। সাহাবাগণও (রাযি.) অনুরূপ করলেন। এরপর কিছু সংখ্যক লোককে ইয়াজেজ পাঠিয়ে দেয়া হল। উদ্দেশ্য ছিল এরা সেখানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গুলোকে তত্ত্বাবধান করবেন এবং যাঁরা এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা উমরাহ পালন করবেন। উল্লেখিত উমরাহকে ‘উমরায়ে ক্বাযা’ এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, তা উমরায়ে হুদায়বিয়াহর ক্বাযা হিসেবেই আদায় করা হয়েছিল। অথবা হুদায়বিয়াহর সন্ধিচুক্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তা পালন করার কারণে (এ ধরণের সন্ধি বা আপোষকে আরবীতে ক্বাযা বা মুক্বাযাত বলা হয়ে থাকে)। দ্বিতীয় কারণটিকে মুহাক্বিক্বীনে কেরাম অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।[7] প্রকাশ থাকে যে, এ উমরাহ চারটি নামে পরিচিত আছে যথা- উমরায়ে ক্বাযা, উমরায়ে ক্বাযিয়্যা, উমরায়ে ক্বিসাস এবং উমরায়ে সুলহ।

মহান বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের) ঘটনা

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের ঘটনা এমন একটি আযীমুশ শান ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রসূলকে শক্তিশালী করেছেন। রসূল (ﷺ) এর সৈনিক এবং হারামে মাক্কীর সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর ঘর ও শহরকে এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর হিদায়াতের কেন্দ্রস্থলকে কাফের-মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। এই বিজয়ে আসমানের অধিবাসীগণ খুশী হয়েছিল এবং এই বিজয়ের ফলেই দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করল।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নাবী (ﷺ) ১০ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় আবু রুহম কুলছুম বিন হুসাইনকে মদ্বীনার খলীফা নির্বাচন করলেন। মক্কা আক্রমণ ও জয় করার কারণ হচ্ছে, কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং খোযাআ গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে তাদেরকে অকাতরে হত্যা করেছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মোতাবেক খোযাআ গোত্র রসূল (ﷺ) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির সুস্পষ্ট লংঘন।

ইসলামী বাহিনী যখন ‘মার্রুয যাহরান’ নামক স্থানে পৌঁছল তখন রাতের বেলা নাবী (ﷺ) সাহাবীদেরকে আগুন জ্বালানোর আদেশ দিলেন। সাহাবী প্রজ্জবলিত আগুনের আলোতে আশে-পাশের সমস্ত অঞ্চল আলোকিত হয়ে গেল। তখনো মক্কাবাসীদের কাছে

মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের কোন খবর ছিলনা। তবে তাদের অন্তরে আশঙ্কা ছিল যে, যে কোন সময় মুসলিম বাহিনী মক্কায় আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তারা চলে আসবে- এটি তাদের ধারণায় ছিলনা। অতঃপর নাবী (ﷺ) মুজাহিদ বাহিনীকে সাথে নিয়ে বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি কাবা ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর চার পাশে আনসার ও মুহাজিরগণ ঘিরে ছিল। কাবায় গিয়ে তিনি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করলেন। রসূল (ﷺ)-এর হাতে একটি ধনুক ছিল। সে সময় কাবার অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। ধনুকের মাধ্যমে এক এক করে তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেন। এ সময় তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

‘‘বলঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল’’। [1] অতঃপর নাবী (ﷺ) কাবার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সলাত পড়লেন। সলাত পড়ে বাইরে আসলেন। কুরাইশরা তখন সারিবদ্ধভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে অবস্থান করছিল। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন- হে কুরাইশ সম্প্রদায়? তোমাদের সাথে আজ আমি কেমন আচরণ করব বলে মনে কর? সকলেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল- আমরা আপনার কাছ থেকে খুব ভাল আচরণ কামনা করছি। ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে যা বলেছিলেন আজ আমিও তোমাদের সাথে তাই বলছি। আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত-স্বাধীন।

হুনাইনের যুদ্ধ

ইবনে ইসহাক বলেন- হাওয়াযেন গোত্র যখন মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেল তখন মালেক বিন আওফ হাওয়াযেন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত করল। তার সাথে ছাকীফ, জুশাম এবং অন্যান্য গোত্রও এসে যোগ দিল। তাদের মধ্যে দুরাইদ বিন সিমতা নামক একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। এই বৃদ্ধের মতই কার্যকর হত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এখানে হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এই যুদ্ধের কতিপয় হিকমতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসূলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, যখন মক্কা বিজয় হবে তখন

লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে এবং সমস্ত আরব গোত্র রসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করবে।
যখন মক্কা বিজয় পূর্ণ হল তখন হিকমতে ইলাহীর দাবী এই ছিল যে হাওয়াযেন এবং তাদের সহযোগী গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকবে। তাই তারা বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করে রসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন যে, তাঁর হুকুমই বিজয়ী হবে ও তাঁর রসূল (ﷺ) এর সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের থেকে অর্জিত মালে গণীমত মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বারগাহে ইলাহীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম পরিণত হবে। এই বার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবী এবং তাঁর বান্দাদেরকে এমন এক বিরাট শক্তির মাধ্যমে বিজয় দান করলেন, যা মুসলিমদের নিকট ইতিপূর্বে ছিলনা। উদ্দেশ্য হল, যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য আরব শক্তি মুসলিমদের মুকাবেলা করতে ভয় পায়।
আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের দাবী এই ছিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের প্রথম দিকে তাদেরকে পরাজয়ের স্বাদ ভোগ করালেন।
এর মাধ্যমে তিনি ঐ সমস্ত মুসলিমদের মাথাকে নত করতে চেয়েছেন, যারা মক্কা বিজয়ের দিন অহংকারের সাথে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর ন্যায় মস্তক অবনত করে হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে প্রবেশ করেনি এবং যারা বলেছিল- সংখ্যা কম হওয়ার কারণে আজ আমরা পরাজিত হবনা। এটি বুঝানোও উদ্দেশ্য ছিল যে, সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ হতেই আগমণ করে থাকে। রসূল (ﷺ) সেদিন স্বীয় মাথাকে এত নীচু করেছিলেন যে, তাঁর থুতনী বাহনের সাথে প্রায় মিশে যাচ্ছিল।
সুতরাং যখন মুসলমানদের মন ভেঙ্গে গেল, তখন তাদের মনে শান্তনা দেয়ার জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূল (ﷺ) এবং মুমিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন। আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের আরও দাবী এই যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পোশাক কেবল বিনয়ীদের উপরই অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

“পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল বিবেচনা করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত”।[1]

বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং হুনাইনের যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এই উভয় যুদ্ধেই ফিরিস্তাগণ মুসলমানদের পক্ষে স্বশরীরে যুদ্ধ করেছেন। উভয়টিতেই নাবী (ﷺ) শত্রুদেরকে লক্ষ্য করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। এই উভয় যুদ্ধেই আরবদের হিংসার আগুন নির্বাপিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে পড়েছিল এবং তাদের তেজ কমে গিয়েছিল। আর হুনাইন যুদ্ধ তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছে।

তায়েফের যুদ্ধ

হুনাইনের যুদ্ধে তায়েফের ছাকীফ গোত্র পরাজিত হয়ে তাদের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিল। সেখানে থেকে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। রসূল (ﷺ) ও তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে তিনি একটি স্থানে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সময় ছাকীফ গোত্রের তীরন্দাজ বাহিনী মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে প্রচন্ডভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করল। পঙ্গপালের পাখার মত তীরগুলো উড়ে এসে মুসলমানদেরকে আঘাত করতে লাগল। এতে বহু মুসলিম আহত হন। তাদের মধ্যে হতে ১২ জন মৃত্যু বরণ করেন।

অতঃপর নাবী (ﷺ) সেখান থেকে সরে এসে তায়েফের ঐ স্থানে চলে আসলেন, যেখানে বর্তমানে ‘মসজিদুত্ তায়েফ’ তথা তায়েফের মসজিদ অবস্থিত। নাবী (ﷺ) তাদেরকে ১৮ দিন মতান্তরে ২৩ দিন অবরোধ করে রাখলেন। এ সময় মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ) দিয়ে আক্রমণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরণের অস্ত্রের এটিই ছিল প্রথম ব্যবহার। ঐ দিকে নাবী (ﷺ) মুসলমানদেরকে সেখানকার আঙ্গুরের বাগানগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানগণ রসূল (ﷺ) এর আদেশ তামিল করতে গিয়ে দ্রুত কাফেরদের বাগানগুলো কাটতে লাগলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন- তায়েফবাসীরা রসূল (ﷺ) এর কাছে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে সেগুলোকে রেখে দিতে বললেন।
নাবী (ﷺ) তখন বললেন- তাহলে আমি তা আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার দোহাই দেয়ার কারণে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর রসূল (ﷺ) এর পক্ষ হতে একজন ঘোষণাকারী এই বলে ঘোষণা করল যে, ছাকীফ গোত্রের কোন দাস যদি দুর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে সে স্বাধীন। এই ঘোষণা শুনে দশাধিক ক্রীতদাস তাদের থেকে চলে আসল। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বাকরা (রাঃ) । রসূল (ﷺ) তাদের প্রত্যেককে এক একজন মুসলিমের হাওলা করে দিলেন। তারা যেন তাদের প্রতি খেয়াল রাখেন। তায়েফবাসীর জন্য এটি খুব পীড়াদায়ক ছিল। এরপরও রসূল (ﷺ) কে তায়েফ বিজয়ের অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই তিনি মুসলিম বাহিনীকে ফেরত চলার আদেশ দিলেন। কিন্তু মুসলিমদের জন্য এটি মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে গেল। আমরা ফেরত যাব? অথচ এখনও তায়েফ বিজয় হয়নি। নাবী (ﷺ) তখন বললেন- তাহলে যাও। আগামিকাল লড়াই শুরু কর। সকাল বেলা লড়াই শুরু হল। এতে কতিপয় মুসলিম আহত হলেন। এবার তিনি বললেন- ইনশা-আল্লাহ্! আমরা আগামীকাল যাত্রা করব। এতে সাহাবীগণ খুব আনন্দিত হলেন এবং যাত্রা শুরু করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। রসূল (ﷺ) তখন হাসতে লাগলেন। সফর শুরু হলে তিনি বললেন- তোমরা এই দু'আ পাঠ কর-

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

'আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী এবং তাঁর প্রশংসাকারী'।[1] সাহাবীগণ তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি ছাকীফ গোত্রের উপর বদ দু'আ করুন। নাবী (ﷺ) বললেন- হে আল্লাহ্! তুমি ছাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং তাদেরকে অনুগত করে আমার কাছে নিয়ে এসো।
অতঃপর তিনি জিইর্রা নামক স্থানের দিকে বের হলেন। এখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন। উমরাহ থেকে ফারেগ হয়ে তিনি মদ্বীনায় ফেরত গেলেন।
রমযান মাসে যখন তিনি তাবুক থেকে ফেরত আসলেন, তখন রমযান মাসেই ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি নাবী (ﷺ) এর কাছে আসল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, তিনি যখন তায়েফ থেকে ফেরত আসলেন, তখন উরওয়া বিন মাসউদ তাঁর পিছনে রওয়ানা

দিলেন। নাবী (ﷺ) মদ্বীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই উরওয়া এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম কুবল করল। ইসলাম কবুল করার পর সে স্বীয় গোত্রের নিকট ফেরত যাওয়ার অনুমতি চাইল। নাবী (ﷺ) বললেন- তোমার জাতির লোকেরা সম্ভবতঃ তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। কারণ তিনি তাদের অবস্থা দেখে অনুভব করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে অহংকার এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তাই তারা ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হয়না। উরওয়া বিন মাসউদ (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের নিকট তাদের নেতাদের চেয়েও অধিক প্রিয়। আসলেও উরওয়া তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সুতরাং তিনি এই আশায় তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন যে, তাদের মাঝে তার মর্যাদার কারণে তারা তার বিরোধীতা করবেনা। এত প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন তাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন চতুর্দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। একটি তীর এমনভাবে লাগল যে, এতে তিনি নিহত হলেন।

মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করা হল- তোমার রক্তপাত সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আমার মাঝে এবং যারা রসূল (ﷺ) এর সাথে শহীদ হয়েছে- তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং তোমরা আমাকে তাদের সাথে দাফন কর।

লোকদের ধারণা রসূল (ﷺ) তার ব্যাপারে বলেছিলেন- স্বীয় গোত্রের সাথে তাঁর অবস্থা সেই রকমই হয়েছিল, যেমন হয়েছিল সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত মুমিন ব্যক্তির অবস্থা তার গোত্রের সাথে। উরওয়া ইবনে মাসউদ শাহাদাত বরণ করার পর ছাকীফ গোত্র কয়েক মাস ইসলাম থেকে বিমুখ রইল। অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বুঝতে পারল যে, চার পাশের ইসলাম গ্রহণকারী আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি তাদের হাতে নেই। তাই তারা সিদ্বান্ত নিল যে, উরওয়া বিন মাসউদের ন্যায়ই তারা আরেকজন দূতকে রসূল (ﷺ) এর নিকট পাঠাবে। এ জন্য তারা আব্দে ইয়ালীলের সাথে কথা বলল। আব্দে ইয়ালীল এই প্রস্তাব অস্বীকার করল এবং আশঙ্কা করল যে, তাকে পাঠানো হলে তার সাথেও উরওয়া বিন মাসউদের ন্যায়ই আচরণ করা হতে পারে। কাজেই সে এই শর্তে যেতে রাজী হল যে, তার সাথে অতিরিক্ত লোক পাঠানো হোক। সুতরাং তারা বনী আহলাফ থেকে দুইজন এবং বনী মালেক থেকে তিনজন লোক আব্দে ইয়ালীলের সাথে প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে উছমান আবীল আসও ছিল। মদ্বীনার নিকটবর্তী হয়ে তারা যখন একটি নদীর কিনারায় অবতরণ করল তখন মুগিরা

ইবনে শুবার সাথে তাদের দেখা হল। মুগিরা ইবনে শুবা রসূল (ﷺ) এর কাছে বনী ছাকীফের আগমণের সংবাদ পৌঁছানোর জন্য দৌড়াতে লাগল। রাস্তায় আবু বকর (রাঃ) এর সাথে দেখা হলে তিনি মুগীরা (রাঃ) কে আল্লাহর শপথ দিয়ে বললেন, তুমি কখনই আমার আগে রসূল (ﷺ) এর কাছে প্রবেশ করবেনা। সুখবরটি আমিই রসূল (ﷺ) কে শুনাব। এতে মুগীরা থেমে গেলেন। আবু বকর (রাঃ) রসূল (ﷺ) এর দরবারে প্রবেশ করে ছাকীফ গোত্রের আগমণের কথা জানালেন। অতঃপর মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) তাদের কাছে ফেরত গিয়ে যোহরের সময় তাদের সাথে রওয়ানা দিলেন। তাদের আগমণের সংবাদ শুনে নাবী (ﷺ) মসজিদের একপাশে একটি তাঁবু স্থাপন করলেন। এ সময় খালেদ বিন সাঈদ নাবী (ﷺ) এবং বনী ছাকীফ গোত্রের মাঝে পয়গাম বিনিময়ের কাজ করতেন। পরিশেষে তারা মুসলমান হয়ে গেল।

তাবুকের যুদ্ধ

নাবী (ﷺ) যখন তায়েফের যুদ্ধ হতে মদ্বীনায় ফেরত আসলেন এবং নবম হিজরী সাল শুরু হল তখন তিনি যাকাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন আরব গোত্রের নিকট প্রেরণ করলেন। উয়াইনা বিন হিসন (রাঃ) কে পাঠালেন বনী তামীম গোত্রের নিকট, আদী বিন হাতিমকে পাঠালেন তাঈ ও বনী আসাদ গোত্রের নিকট এবং মালিক বিন নুওয়াইরাকে পাঠালেন বনী হানযালার নিকট। বনী সা'দ গোত্রের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দুইজন লোকের উপর ভাগ করে দিলেন। বনী সা'দ গোত্রের এক অংশের যাকাত উসুল করার জন্য পাঠালেন যাবারকান বিন বদরকে আর অন্য দিকে পাঠালেন কায়েস বিন আসেম (রাঃ) কে। বাহরাইনের যাকাত উসুল করার জন্য পাঠালেন আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) কে। আর নাজরানের যাকাত আদায়ের জন্য পাঠালেন আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) কে।

এই বছর তথা হিজরী নবম সালের রজব মাসে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদ্বীনায় এ সময় মানুষের মধ্যে খুব অভাব বিরাজ করছিল। দেশে তখন অনাবৃষ্টিও দেখা দিয়েছিল। ঐ দিকে আবার মৌসুমের ফল পাকারও সময় হয়ে গিয়েছিল। নাবী (ﷺ) যখন কোন অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন কোন দিকে যাচ্ছেন, তা সুস্পষ্ট করে বলতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার পূর্বে সুস্পষ্ট করেই বলে দিলেন। কারণ তাবুক মদ্বীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং তখন সময়টিও ছিল অভাবের।

একদিন তিনি জুদ্ বিন কায়েসকে লক্ষ্য করে বললেন- এ বছর বনুল আসফার (রোমানদের) মুকাবেলা করার জন্য বের হবে কি? সে বলল- হে আল্লাহর রসূল! আমাকে মদ্বীনায় থাকার অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় নিপতিত করবেন না। সকলেই জানে যে, আমি নারীদের প্রতি সর্বাধিক আশক্ত। আমার আশঙ্কা আমি যদি রোমানদের মেয়েদেরকে দেখি, তাহলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবনা। তার এই কথা শুনে রসূল (ﷺ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রসূল (ﷺ) তাকে না যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়-

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

''আর তাদের কেউ বলে, আমাকে (যুদ্ধে যাওয়া হতে) অব্যাহতি দিন এবং ফিতনায় নিপতিত করবেন না। শুনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই ফিতনায় নিপতিত এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে''।[1] মুনাফেকদের একদল পরস্পর বলাবলি করতে লাগল- তোমরা এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে যুদ্ধের জন্য বের হয়োনা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

''পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়োনা। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচ-তম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত''।[2]

নাবী (ﷺ) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আদেশ দিলেন। ধনী সাহাবীদেরকে এই পথে খরচ করার উৎসাহ দিলেন। উছমান (রাঃ) সাজ ও সামানসহ তিনশত উট এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন। এই সময় কিছু লোক কাঁদতে কাঁদতে রসূল (ﷺ)-এর খেদমতে হাজির হলেন। তারা ছিলেন সংখ্যায় সাতজন। তারা রসূল (ﷺ)-এর কাছে বাহনের আবেদন করছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

“আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব। তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রম্ন বইছিল, এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে”।

এই সময় আবু মুসা আশআরীর সাথীগণ আবু মুসা (রাঃ) কে রসূল (ﷺ)-এর নিকট পাঠালেন, যাতে তিনি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় তিনি রসূান্বিত ছিলেন। তাই তিনি রসূান্বিত অবস্থায় শপথ করে বললেন যে, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সওয়ারীর ব্যবস্থা করবনা। তা ছাড়া আমার কাছে সওয়ারীর কোন ব্যবস্থাও নেই। এরপরই কিছু উট নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে গেল। এবার তার রসূ থেমে গেল। তাই তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের বাহনের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন- আমি তোমাদেরকে বাহন দেইনি; বরং আল্লাহই তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করেছেন। আর আমি যখন কোন বিষয়ে কসম করি, তখন যদি এর বিপরীত করার মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পাই, তাহলে আমি শপথের কাফ্ফারা আদায় করি এবং ভাল কাজটিই করি।

রসূল (ﷺ) তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার পূর্বে উলবাহ বিন যায়েদ রাতে দাঁড়িয়ে সলাত পড়লেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন- হে আল্লাহ্! তুমি জিহাদের আদেশ দিয়েছ। আর তোমার রসূলকে এমন সামর্থ দাওনি যে, তিনি আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন। এরপর তিনি বললেন- হে আল্লাহ্! আমি যেহেতু জিহাদে বের হওয়ার অযোগ্য, তাই আমি তোমার রাস্তায় প্রত্যেক ঐ মুসলিমের জুলুমের বদলা নেওয়া সাদকা করে দিচ্ছি, (প্রতিশোধ নেওয়া ছেড়ে দিচ্ছি) যা তার হাত দ্বারা আমার উপর করা হয়েছে। চাই সেই জুলুম আমার মালের মধ্যে হোক কিংবা জানের মধ্যে কিংবা ইজ্জত-আবরুর মধ্যে হোক। সকাল হলে রসূল (ﷺ) বললেন- আজ রাতে সাদকাকারী কোথায়? কেউ উঠে দাঁড়ালো না। তিনি পুনরায় একই কথা বললেন। এবার উলবাহ বিন যায়েদ দাঁড়ালেন এবং রসূল (ﷺ) কে স্বীয় ঘটনা খুলে বললেন। তিনি তখন উলবাহ (রাঃ) কে বললেন- সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে, আজ রাতে তোমার দু’আকে সাদকায়ে মাকবুলা হিসাবে লিখা হয়েছে।

তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে গ্রাম্য মুনাফেকরা রসূল (ﷺ) এর কাছে আগমণ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইল। কিন্তু তিনি তাদেরকে অনুমতি দেন নি। সে সময় মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই একদল মুনাফিক ও ইহুদীসহ ছানিয়াতুল ওয়াদায়

অবস্থান করছিল। বলা হয় যে, তার বাহিনী দুই বাহিনীর চেয়ে কম ছিলনা। বের হওয়ার পূর্বে রসূল (ﷺ) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে মদ্বীনার খলীফা নিযুক্ত করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন রওয়ানা হল, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই পিঠ টান দিল। আলী ইবনে আবু তালেবকে রেখে গেলেন আহলে বাইতের নারী ও শিশুদের দেখা-শুনার দায়িত্বে। আলী (রাঃ) তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন? তিনি তখন আলী (রাঃ) কে বললেন- তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তোমার মর্যাদা ঠিক সে রকমই, যেমন ছিল হারুন (আঃ) এর মর্যাদা মুসার নিকট। তবে আমার পর আর কোন নাবী নেই।[4]

এই যুদ্ধে কতিপয় মুসলমানও পিছনে রয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের পিছিয়ে থাকা ঈমানের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের কারণে ছিলনা। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন কা’ব বিন মালেক, হিলাল বিন উমাইয়াহ, মুরারা বিন রবীআ, আবু খাইছামাহ এবং আবু যার্ (রাঃ) । তবে আবু খাইছামা এবং আবু যার্ গিফারী (রাঃ) পরে রসূল (ﷺ)-এর সাথে মিলিত হয়েছিল।
এই যুদ্ধে নাবী (ﷺ)-এর সাথে ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনী ছিল। তার মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল দশ হাজার। তাবুকে পৌঁছে তিনি বিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সলাত কসর করতেন। রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াস তখন হিমস নগরীতে অবস্থানরত ছিল।
তাবুক যুদ্ধে আবু খায়ছামার অংশগ্রহণের ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) মদ্বীনা হতে বের হওয়ার কয়েক দিন পর আবু খায়ছামা স্বীয় ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ছিল প্রচন্ড গরম। তিনি দেখলেন, তার স্ত্রীদ্বয় তার বাগানে তাঁবু স্থাপন করে তাতে অবস্থান করছে। তাদের প্রত্যেকেই তাঁবুতে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে তাঁবুকে ঠান্ডা করে রেখেছে এবং তাঁর জন্য ঠান্ডা পানি প্রস্তুত করে রেখেছে। তারা তাঁর জন্য সুন্দর খানাও তৈরী করে রেখেছে। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করে সুন্দরী স্ত্রীদের প্রতি এবং তার জন্য প্রস্তুত কৃত খাদ্যসামগ্রীর দিকে তাকালেন, তখন মনে মনে বলতে লাগলেনঃ রসূল (ﷺ) দ্বিপ্রহরে পথ চলছেন ও গরম সহ্য করছেন। আর আবু খায়ছামা ঠান্ডা ছায়া, সুস্বাদু খাদ্য এবং সুন্দরী নারী উপভোগ করছে। এটি ইনসাফের বিষয় হতে পারেনা। অতঃপর তিনি বললেন- আল্লাহর শপথ! রসূল (ﷺ) এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের কারও তাঁবুতে প্রবেশ করবনা।

সুতরাং তোমরা আমার জন্য সফর সামগ্রী তৈরী কর। তারা তাই করল। তিনি বাহনে আরোহন করে বেরিয়ে পড়লেন। তাবুকে পৌঁছে তিনি রসূল (ﷺ) এর সাথে মিলিত হলেন।

রাস্তায় তার সাথে উমায়ের বিন ওয়াহাবের সাক্ষাৎ হল। তিনিও রসূল (ﷺ) এর সন্ধানে ছিলেন। তারা পরস্পর সফরসঙ্গী হয়ে গেল। তারা যখন তাবুকের নিকটে পৌঁছলেন তখন আবু খায়ছামা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে বললেন- আমি রসূল (ﷺ) থেকে পিছিয়ে থেকে বিরাট একটি ভুল (পাপ) করেছি। সুতরাং এখন থেকে রসূল (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত আমার থেকে তুমি আলাদা হওয়াতে দোষের কিছু নেই। তাই উমায়ের সরে পড়ল। তাবুকের নিকটবর্তী হলে লোকেরা বলতে লাগল- এই তো রাস্তায় একজন আরোহীকে আগমণ করতে দেখা যাচ্ছে। রসূল (ﷺ) তখন বললেন- সম্ভবতঃ এই লোক আবু খায়ছামাই হবে। লোকেরা তখন বলল- আল্লাহর শপথ! এ তো দেখছি আবু খায়ছামা। বাহন থেকে নেমে তিনি রসূল (ﷺ)-এর দিকে এগিয়ে সালাম দিলেন এবং তাঁর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনালেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) তাঁর ব্যাপারে ভাল কথা বললেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।

তাবুকের পথে তিনি যখন ছামুদ জাতির ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন- তোমরা এখানকার পানি পান করোনা এবং এর দ্বারা সলাতের ওযূ করোনা। এখানকার পানি দিয়ে তোমরা যেই আটা গুলেছ, তা তোমরা উটকে খাইয়ে দাও। এ থেকে তোমরা নিজেরা কিছুই খেয়োনা। আর তোমাদের কেউ যেন সাথে কাউকে না নিয়ে বাইরে না যায়। বনী সায়েদা গোত্রের দুই লোক ব্যতীত বাকী সকলেই তাঁর কথা তামিল করল। ঐ দুই জনের একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাইরে গেল, অন্যজন তার উটের সন্ধানে বের হল। যে ব্যক্তি পায়খানা করার জন্য একা বের হয়েছিল, সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পায়খানার স্থানে পড়ে রইল আর যে ব্যক্তি উটের সন্ধানে বের হয়েছিল, বাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে তাইয়ের পাহাড়ে নিক্ষেপ করল। রসূল (ﷺ) যখন এই খবর শুনলেন তখন বললেন- আমি কি তোমাদেরকে একাকী বের হতে নিষেধ করিনি? অতঃপর যে ব্যক্তি পায়খানা করতে গিয়ে শ্বাসরূদ্ধ হয়ে আটকা পড়ে ছিল, তিনি তার জন্য দু'আ করলে সে ভাল হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বনী তাইয়ের লোকেরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে মদ্বীনায় ফেরত পাঠাল।

ইমাম জুহরী (রহঃ) বলেন- নাবী (ﷺ) যখন ছামুদ গোত্রের হিজর অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি স্বীয় কাপড় দিয়ে চেহারা মুবারক ঢেকে নিলেন এবং বাহনকে দ্রুত চালালেন। অতঃপর তিনি বললেন- জালেমদের অঞ্চলের উপর দিয়ে চলার সময় তোমরা ক্রন্দন অবস্থায় চল। কেননা তারা যেই আযাবে আক্রান্ত হয়েছিল, তোমাদেরও সেই আযাবে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই স্থানের পানি দিয়ে যারা আটা গুলেছিল, তাদেরকে তিনি সেই আটা উটকে খাওয়াতে বলেছিলেন এবং পানি ঢেলে দিতে বলেছিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে সেই কুঁপ থেকে পানি সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন, যাতে সালেহ (আঃ) এর উটনী অবতরণ করত।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন- সে দিন সকাল বেলা মানুষের কাছে কোন পানি ছিলনা। রসূল (ﷺ) এর কাছে পানি না থাকার অভিযোগ করা হলে তিনি বারগাহে ইলাহীতে পানির জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এক খন্ড মেঘ পাঠিয়ে দিলেন। মেঘ খন্ডটি হতে এত বৃষ্টি বর্ষিত হল যে, লোকেরা পরিতৃপ্ত হল। প্রয়োজন অনুসারে তারা পানি সঞ্চয়ও করে রাখল।

অতঃপর নাবী (ﷺ) চলতে লাগলেন। কোন কোন সাহাবী তাঁর পিছনে রয়ে গেল। লোকেরা তখন বলতঃ উমুক পিছনে রয়ে গেছে। বলা হল- আবু যারও পিছনে রয়ে গেছে। তিনি যুদ্ধে বের হন নি। তিনি তখন বলতেন- তাকে ছাড়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর অন্য কিছু থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিবেন।

আসল কথা হল আবু যার্ গিফারী (রাঃ) এর উট খুব ধীর গতিতে চলছিল। যার কারণে তিনি সাথীদের সাথে চলতে পারেন নি। তাই তিনি উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিজের পিঠে বহন করতে লাগলেন এবং একাই তাবুকের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এটিই ছিল তার পিছনে পড়ার একমাত্র কারণ। রাস্তার কোন এক স্থানে যখন রসূল (ﷺ) অবতরণ করলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রসূল! ঐ দেখুন! একজন লোক রাস্তায় একা চলছে এবং আমাদের দিকেই আগমণ করছে। রসূল (ﷺ) বললেন- ঐ লোকটি আবু যার্ ছাড়া আর কে হবে? তারা গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাকে চিনে ফেলল এবং বলল- হে আল্লাহর রসূল! এ তো দেখছি আসলেই আবু যার্। রসূল (ﷺ) তখন বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা আবু যারের উপর রহম করুন! সে একাকীই চলবে,

একাকীই মৃত্যু বরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন একাই কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে।[5]

সহীহ ইবনে হিববানে বর্ণিত হয়েছে, আবু যার্ (রাঃ) এর যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন তাঁর স্ত্রী খুব কাঁদছিলেন। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন- তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী বললেন- আমি কাঁদব না? আপনি একটি নির্জন ভূমিতে মৃত্যু বরণ করছেন! আর আমার কাছে এমন কোন কাপড় নেই, যা আপনার কাফনের জন্য যথেষ্ট হবে। আপনাকে দাফন করার মত শক্তিও আমার নেই এবং সহযোগীতা করার মত কোন লোকও এখানে নেই। আবু যার্ তখন বললেন- তুমি কেঁদ না। কেননা আমি রসূল (ﷺ) কে এমন একদল লোককে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি বলেছেন- তোমাদের মধ্যে হতে একজন লোক নির্জন ভূমিতে মৃত্যু বরণ করবে। তথাপি তার জানাযার সলাতে মুসলিমদের একটি জামআত শরীক হবে। আবু যার্ বলেন- ঐ দলের সকলেই মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের কেউ এখন জীবিত নেই। একমাত্র আমিই জীবিত আছি। সুতরাং নির্জন ভূমিতে একাকী মৃত্যু বরণকারী আমি ছাড়া আর কেউ বাকী নেই। আল্লাহর শপথ! আমি ভুল বলছিনা, আমার কথা মিথ্যাও নয়। তুমি রাস্তার দিকে খেয়াল রাখ। দেখ! কোন মানুষ দেখা যায় কি না। তাঁর স্ত্রী উম্মে যার্ বললেন- হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। হাজীগণ চলে গেছেন, রাস্তা খালী হয়ে গেছে। সুতরাং লোকের সন্ধান পাব কোথায়? আবু যার্ (রাঃ) পুনরায় বললেন- যাও এবং খুঁজে দেখ। তাঁর স্ত্রী বলেন- আমি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ধু-ধু মরুভূমির উপর গভীর দৃষ্টি দিতাম, কোন লোকের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। কোন মানুষের আভাস না পেয়ে আমি আবু যারের কাছে ফেরত আসতাম এবং তার সেবায় মশগুল হতাম। আমার এবং আবু যারের সময় এভাবেই পার হতে থাকল। হঠাৎ দেখলামঃ কিছু লোক তাদের বাহনসমূহে আরোহন করে পথ চলছে। তাদের বাহনগুলো তাদেরকে নিয়ে কদমতালে চলছে।

মিলে তাঁর জানাযার সলাত আদায় করলেন এবং তাকে দাফন করলেন। এই যুবকের সাথের লোকদের সকলেই ছিল ইয়ামানের অধিবাসী।[6]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) তাবুকে পৌঁছার পূর্বে বলেছিলেন- ইনশা-আল্লাহ্ আগামীকাল তোমরা তাবুকের জলাশয়ে গিয়ে পৌঁছবে। তবে তোমরা সেখানে চাশতের সময় না হওয়ার আগে কোনক্রমেই পৌঁছতে পারবেনা। আমি সেখানে উপস্থিত

না হওয়ার আগেই কেউ যদি সেখানে পৌঁছে যায়, তাহলে সে যেন সেখানকার পানিতে হাত না ডুবায়। অর্থাৎ তার কাছেও যেন না যায়। বর্ণনাকারী বলেন- আমরা তাবুকে পৌঁছে দেখি, আমাদের আগেই সেখানে গিয়ে দু'জন উপস্থিত হয়েছে। আর দেখলামঃ সেখানকার ঝর্না থেকে অল্প অল্প পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

রসূল (ﷺ) ঐ দু'জন লোককে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি এই পানি স্পর্শ করেছ? তারা বলল- হ্যাঁ, স্পর্শ করেছি। তিনি তখন তাদেরকে গালি দিলেন (দোষারোপ করলেন) এবং আরও অনেক কথা বললেন। অতঃপর লোকেরা সেই ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি ভর্তি করে অল্প অল্প পানি উঠিয়ে একত্রিত করল। এতে সামান্য পানি এক সাথে জমা হয়ে গেল। নাবী (ﷺ) সেই পানি দিয়ে স্বীয় মুখ ও উভয় হাত ধৌত করলেন। তারপর সেই পানি ঝর্ণায় ঢেলে দিলেন। এবার ঝর্ণা থেকে প্রচুর পানি প্রবাহিত হতে লাগল। লোকেরা পানি পান করল।

অতঃপর নাবী (ﷺ) মুআয (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন- হে মুআয! তোমার হায়াত যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে তুমি দেখবে যে, এখানকার পানির আশ-পাশ গাছপালা ও বাগবাগিচায় ভর্তি হয়ে যাবে।

নাবী (ﷺ) যখন তাবুকে গিয়ে পৌঁছলেন তখন আয়লার সম্রাট আগমণ করে তাঁর সাথে সন্ধি করতে এবং জিযিয়া-কর প্রদান করতে রাজী হল। এ সময় জারবা এবং আযরুহ-এর অধিবাসীরা এসেও জিযিয়া দিতে সম্মত হল। আয়লার শাসকের সাথে নাবী (ﷺ) লিখিত চুক্তি করলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল এইঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا أَمَنَةٌ مِن الله ومحمد النبى رسول الله لِيُحَنَّةَ بن رُؤْبَةَ وأهلِ أَيْلَةَ، سُفُنهم وسيارتهم فى البرِّ والبحرِ لهم ذِمةُ اللهِ ومحمد النبى ومَنْ كان معهم مِن أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمَن أحدث منهم حَدَثاً فإنه لا يَحولُ مالُه دونَ نفسه وإنَّه لمن أخذه مِن الناس وإنه لا يحِلُّ أن يُمنعوا ماءً يردونه ولا طريقاً يردونه من بَحْرٍ أو بَرٍّ)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পক্ষ হতে ইউহান্না বিন রুবা এবং আয়লার অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য এই চুক্তিপত্র লিখা হচ্ছে। জলে ও স্থলে চলাচলকারী তাদের যানবাহন ও নৌকাগুলো আল্লাহ এবং নাবী মুহাম্মাদের হেফাজতে ও যিম্মায় থাকবে। সিরিয়া, ইয়ামান ও বাহরাইনের যে সমস্ত লোক তাদের সাথে থাকবে, তাদের কাফেলাতেও এই নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকর হবে। তাদের কেউ যদি চুক্তিবিরোধী কোন কাজ করে বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ

করে, তাহলে তার মাল তার জান বাঁচাতে পারবো না বরং যে কোন মুসলিমের জন্যই তাদের জান-মাল হালাল হয়ে যাবে। মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় যে, কোন পানির ঘাটে অবতরণ করতে তাদেরকে বাধা দিবে, জল বা স্থল পথে চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চারশ' বিশ জন সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-কে দুমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দেরের নিকট প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁকে বলেন, (إِنَّكَ سَتَجِدُهُ يَصِيْدُ الْبَقَرَ) 'তোমরা তাকে নীল গাভী শিকার করার সময় দেখতে পাবে।'

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ মোতাবেক খালিদ (রাঃ) তথায় গমন করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন এতটুকু দূরত্বে অবস্থান করছিলেন যে দূর্গটি পরিস্কার চোখে পড়ছিল তখন হঠাৎ একটি নীল গাভী বেরিয়ে এসে দূর্গের দরজার উপর শিং দ্বারা গুঁতো দিতে থাকল। উকায়দের তাকে শিকার করার জন্য বাহির হলে খালিদ (রাঃ) এবং তাঁর ঘোড়সওয়ার দল তাকে বন্দী করে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ক্ষমা করলেন এবং দুই হাজার উট, আটশ' দাস, যুদ্ধের চারশ' লৌহ বর্ম এবং চারশ' বর্শা দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। এ সন্ধি চুক্তিতে কর প্রদানের শর্তও সংযোজিত হল। সুতরাং তিনি তার সাথে ইয়াহনাহ্সহ দুমাহ, তাবুক, আয়লাহ এবং তাইমার শর্তানুযায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

যে সকল গোত্র তখনো রোমকগণের পক্ষে কাজ করছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যখন তারা অনুধাবন করল যে, পুরাতন ব্যবস্থাধীনে থাকার দিন শেষ হয়েছে তখন তারা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে মুসলিমগণের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃতি লাভ করে রোমক সাম্রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফলে যে সকল গোত্র রোমকদের শক্তি জোগাত তারা একদম নিঃশেষ হয়ে গেল।

দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনের শেষ দিনগুলো আলোচনার পর্যায়ে পৌঁছেছি। কিন্তু এ আলোচনার জন্য কলমকে গতিশীল করার পূর্বে তাঁর সফল, বিচিত্র ও বিশিষ্ট জীবনধারা যা অন্যান্য নাবী ও রাসূলগণের তুলনায় তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছিল

এবং প্রাধান্য প্রদান করেছিল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম (ﷺ)-এর মাথার উপর পূর্ব ও পরের সকল নেতৃত্বের মুকুট স্থাপন করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ)-কে বলা হয়,

(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ -قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا) الآيات [المزمل:1، 2]

'ওহে চাদরে আবৃত (ব্যক্তি)! ২. রাতে সলাতে দাঁড়াও তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে।' (আল-মুয্যাম্মিল (৭৩) : ১-২]

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ -قُمْ فَأَنذِرْ) [المدثر:1، 2]

'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। [আল-মুদ্দাসসির (৭৪) : ১-২]

অতঃপর কী ছিল? প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং এ পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অনবরত দন্ডায়মান রইলেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মান বিকাশের সুমহান দায়িত্ব, একত্ববাদ বিশ্বাসের গুরুদায়িত্ব এবং আল্লাহর আমানত বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট গন্তব্যের পানে এগিয়ে চলা যা জাহেলিয়াত যুগের গাঢ় অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, যা বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী ভাবধারায় ছিল দারুনভাবে ভারাক্রান্ত যা ছিল পশু প্রবৃত্তি ও লালসার বেড়াজালে আবদ্ধ। অতঃপর একদল অত্যন্ত বিবেকসম্পন্ন, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত সাহাবার সহায়তায় সব কিছুকে পরাভূত ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে আল্লাহর ধ্যান ধারণা ও আলোয় সমুজ্জ্বল এক প্রান্তরে গিয়ে যখন দন্ডায়মান হলেন তখন আরম্ভ হল ভিন্নতর এক জীবন সংগ্রাম।

আরম্ভ হল যুদ্ধের পর যুদ্ধ সে সকল শত্রুর বিরুদ্ধে দাওয়াত ইলাহী এবং তার বিশ্ববাসীদের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শিশু ইসলাম চারাটি তরতাজা হয়ে ভূগর্ভে তার শিকড় প্রোথিত এবং উন্মুক্ত আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করানোর পূর্বেই চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করে ফেলতে। দ্বীনে ইলাহির দাওয়াতে ঐ সকল শত্রুর সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ)-কে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশাল রোমক বাহিনী এ নতুন উম্মতকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সীমান্ত এলাকায় সৈন্য মহড়া শুরু করে দেয়।

যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রসজ্জিত মুশরিক, মুনাফিক্ব ও কাফিরদের সঙ্গেই যে তাঁকে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল শুধু তাই নয় বরং আরও এক ভয়ংকর এবং সার্বক্ষণিক শত্রুর সঙ্গে তাঁকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। সে শত্রুটি ছিল মানব জাতির চির শত্রু শয়তান। সে মানুষের শিরায় শিরায় বিচরণ করে মানুষকে এক গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার অতল গহবরে নিমজ্জিত করার জন্য সর্বক্ষণ চক্রান্ত চালাতে থাকে। শয়তানের চক্রান্তের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে মুসলিমগণকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সে সবের মোকাবিলা করে করে সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁরা সাহাবীগণ যে নিষ্ঠা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর দ্বীনের দাওয়াতের যে মহাসম্মানজনক এবং মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁরা অন্য কিছুকে বড় করে দেখতেন না। দ্বীনের কাজে অকাতরে তাঁরা দিতেন প্রাণ এবং সর্বস্ব দিয়ে একদম নিঃস্ব হয়ে যেতে তাঁরা কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদতলে যখন সঞ্চিত হতো সম্পদের পাহাড় সে সব আল্লাহর পথে খরচ না করে তিনি অবসর নিতেন না। তাঁর নিকট প্রাচুর্য ছিল পরিত্যাজ্য, দারিদ্র ছিল কাম্য। দিবাভাগে দ্বীনের দাওয়াত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সর্বক্ষণ থাকতেন তিনি ব্যস্ত, রাত্রিবেলা দীর্ঘ সময় প্রভূর উদ্দেশ্যে থাকতেন নিবেদিত।[1]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমনিভাবে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনায় বিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় তাঁকে অন্যান্য বিষয় হতে উদাসীন কিংবা গাফেল করতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থঃবহু প্রতিকূলতা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াত এমনি এক বিশালায়তনে কৃতকার্যতা লাভ করেছিল যে, তা প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব বিবেক একেবারে স্তম্ভিত এবং হতচকিত হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূভাগ থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে ঈমান আমান, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও শৌর্য-বীর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং শিরক্, কুফরী, মুনাফিক্বী ও মূর্তিপূজার মূল উৎপাটিত হয় এবং আপামর আরববাসী দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুগত হয়ে পড়ে। আল্লাহর একত্ববাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র মুয়াযিযনের সুরেলা কণ্ঠে দিগ্বিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। মদীনা অভিমুখী বিভিন্ন গোত্রের আনাগোনা, নব্য মুসলিমগণের তাকবীরধ্বনি এবং কুরআন তিলাওয়াতকারীগণের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সুরে মরুপ্রান্তর মউ মউ করে ওঠে।

ভিন্ন ও পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন বহুধাবিভক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য, সহৃদয়তা ও সমঝোতার প্লাবন প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ প্রবেশ করতে থাকে আল্লাহর দাসত্বে। কেউই অত্যাচারী রইল না কিংবা অত্যাচরিতও রইল না। রইল না মালিক কিংবা মামলুক, না হাকিম, না মাহকুম, না যালিম কিংবা মাযলুম। সব ভেদাভেদের অবসান হয়ে গেল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারী। অন্যথায় সকল মানুষ আদমসন্তান এবং আদম (আঃ) মাটির সৃষ্টি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল আরবী একাত্মতা, বিশ্ব মানবতার একাত্মতা এবং সামাজিক সুবিচার। পাওয়া গেল মানব জাতির সমস্যা-সংকুল পার্থিব জীবনে চলার পথের ঠিক দিক নির্দেশনা এবং পরকালীন কল্যাণের মূলমন্ত্র। মানুষের জীবনযাত্রায় সূচিত হল আমূল পরিবর্তন। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই সূচিত হল যুগান্তকারী পরিবর্তন। মানব সভ্যতা হল মানবোচিত ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্য মন্ডিত।

ইসলামী দাওয়াতের পূর্বে পৃথিবীতে ছিল অন্ধকারের প্রাধান্য, পৃথিবীর পরিবেশ ছিল দুর্গন্ধযুক্ত এবং আত্মা ছড়িয়ে চলেছিল দুর্গন্ধ। মাপ ও পরিমাপ ছিল অস্পষ্ট। সর্বত্র বিরাজিত ছিল অন্যায়, দাসত্ব, শোষণ ও সন্ত্রাসের শাসন। অশান্তি, অশ্লীলতা এবং ধ্বংস প্রবণতা পৃথিবীকে চরম অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত করছিল। কুফর ও ভ্রষ্টতার ঘন পর্দায় ঢাকা পড়েছিল মানুষের সনাতন জীবনধারার শাশ্বত রূপ। অথচ আসমানী জীবন বিধান ছিল তখনো বিদ্যমান। কিন্তু সে বিধান হয়ে পড়েছিল বিকৃত এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। সে বিধানের গ্রহণী শক্তি গিয়েছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে। যার ফলে তা প্রাণহীন একটি লোকাচার বা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াত যখন তার অসামান্য প্রাণশক্তি, সর্ববাদীসম্মত আল্লাহর বিধি বিধান, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তখন প্রচলিত রেওয়াজ সর্বস্ব জীবনের বিধানের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নামে যে অর্থহীন লোকাচার, শ্রেণীবিভেদ, অহমিকা, অস্থিরতা, শিরক ও বহুত্ববাদী,

বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটল। আর মানব সমাজ মুক্তি লাভ করল যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, জোবরদস্তি থেকে। মুক্ত হলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া, পতন থেকে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে দলাদলি, শাসক ও পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটল। সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল এক দয়া ও পরিচ্ছন্নতা, নতুনত্ব, ঈমান ইয়াক্বীন, ন্যায়নিষ্ঠতা, সহমর্মিতা এবং মানব জীবন স্বচ্ছ-নির্মল এক মহা উন্নত সোপানে উন্নীত হয়, প্রত্যেক প্রাপক তার প্রাপ্য অধিকার নিশ্চয়তা লাভ করে এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উপর।

এর ফলে আরব উপদ্বীপে এমন এক বরকতপূর্ণ পরিবেশ এবং উন্নত ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা সূচিত হল ইতোপূর্বে কোন কালেও যা দেখা যায় নি এবং সে সময়কার মতো উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় ইতিহাস আর কোন কালেও দেখা যাওয়া সম্ভব নয়।

বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মু’আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায় কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন,

(يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسٰي أَلَّا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ هٰذَا وَقَبْرِيْ)

‘হে মোয়ায! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে মোয়ায (রাঃ) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নাবী কারীম (ﷺ)-কে ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা এবং সুফল বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবেন। এ দাওয়াতের কাজেই নাবী কারীম (ﷺ) অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর এ অসাধারণ সাফল্যমন্ডিত কর্মকান্ডের অন্তিম পর্যায়ে এটাই সুসঙ্গত হবে যে, হজ্জের মৌসুমে যখন মক্কার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্র সমূহের সদস্য ও প্রতিনিধিগণ একত্রিত হবেন তখন তাঁরা রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নিকট থেকে দ্বীনের আহবান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ নেবেন এবং নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর পবিত্র আমানত যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।[1]

অতঃপর যূল ক্বা’দাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।[2]

তিনি চুলে চিরুনী ব্যবহার করলেন, তেল মালিশ করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কুরবানীর পশুগুলোকে মালা বা হার পরালেন এবং যুহর সালাতের পর রওয়ানা হয়ে গেলেন। আসরের পূর্বে যুল হোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে আসরের দু’ রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং শিবির স্থাপন ক’রে সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন। সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের (রাযি.) বললেন,

(أَتَانِيْ اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ: صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِيِّ الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ)

আজ রাতে আমার প্রভূর পক্ষ হতে একজন আগন্তুক এসে বলেছেন, ‘এ পবিত্র উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং হজ্জের সঙ্গে ওমরা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।[3]

অতঃপর যুহরের সালাতের পূর্বে নাবী কারীম (ﷺ) ইহরামের জন্য গোসল করলেন। এরপর আয়িশা (রাঃ) রাসূল (ﷺ)-এর শরীর এবং পবিত্র মাথায় নিজ হাতে যারীরা

এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকর সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নাবী (ﷺ)-এর মাথার সিঁথি এবং দাড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সেই সুগন্ধি না ধুয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু' রাকাত সালাত আদায় করেন।

এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং উমরাহর ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহরাম বাঁধার পর বাহিরে এসে 'ক্বাসওয়া' নামক উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার 'লাববায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ ক'রে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচচ কণ্ঠে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কালব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কার নিকটবর্তী যী'তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যুল হিজ্জাহ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান, মধ্যমভাবে এ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ সময়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে কা'বা গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং ওমরার জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ীও (কুরবানীর পশু) ছিল। তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার উপরিভাগে হাজূন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের তাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন তাওয়াফ করেন নি। সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে নিজ নিজ ইহরাম ওমরায় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ (রাঃ) তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে হালাল হচ্ছিলেন না সেহেতু সাহাবীগণ এ ব্যাপারে ইতস্তত করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيْ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ)

'আমি যা পরে জানলাম আমার ব্যাপারে আমি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদয়ী আনতাম না। তাছাড়া, আমার সঙ্গে যদি হাদয়ী না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়েও যেতাম।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর যাঁদের সঙ্গে হাদয়ী ছিল না তাঁরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশ মেনে নিয়ে হালাল হয়ে গেলেন।

যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নাবী কারীম (ﷺ) মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জাহর সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামেরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

(أَيُّهَا النَّاسُ، اِسْمَعُوْا قَوْلِيْ، فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّىْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا بِهٰذَا الْمَوْقِفِ أَبَداً)

'ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা।

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٌ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ مُسْتَرْضِعاً فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ).

তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হুরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রসম আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল।

জাহেলিয়াত যুগের শোনিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবী'আহ বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল।

فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئْنَ فِرَشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ).

হ্যাঁ, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আনতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে।

(وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلّوْا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ).

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

(أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، أَلَا فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، وَتَحُجُّوْنَ بَيْتِ رَبِّكُمْ، وَأَطِيْعُوْا أُوْلَاتِ أَمْرَكُمْ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبَّكُمْ)

হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নাবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উম্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমাযান মাসে রোযা রেখো, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভূর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সৎ নেতৃত্বের অনুসরণ

করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[6]

(وَأَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ عَنِّيْ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟)

আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কী উত্তর দিবে?
সাহাবীগণ বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ক আদায় করেছেন।
সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন,

(اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ)

'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষ্য থাক।[7]
নাবী কারীম (ﷺ)-এর বাণীসমূহকে রাবী'আহ বিন উমাইয়া বিন খালফ উচ্চৈঃস্বরে লোকজনদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছিলেন।[8] রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারেগ হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا) [المائدة: 3]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।' [আল-মায়িদাহ (৫) :
এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই উমার (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমরা এতো দিন দ্বীনের

বৃদ্ধিই দেখছিলাম। এখন যেহেতু তা পূর্ণতা লাভ করলো সেহেতু পূর্ণতার পর তো তাতে আবার কেবল ঘাটতিই দেখা দিতে থাকে।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর ভাষণের পর বিলাল (রাঃ) প্রথমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। এরপর বিলাল (রাঃ) অবারও ইকামত করলেন। এ দু' সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট ক্বাসওয়ার পেট পাথর সমূহের দিকে করলেন এবং হাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের মাঝে অবস্থিত স্তুপ) সামনে করলেন এবং ক্বিবলাহমুখী হয়ে নাবী কারীম (ﷺ) (একই অবস্থায়) অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্যের অল্প অল্প হলুদ বর্ণ শেষ হল, আবার সূর্য মন্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দু' ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেননি। এরপর নাবী কারীম (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আযান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ক্বাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে মাশয়ারে হারামে আগমন করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তাওহীদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন ফাযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে। বাতনে মোহাসসারে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন সাওয়ারীকে একটু দ্রুত খেদালেন।

আর মধ্যের পথ দিয়ে যা জামরায়ে কুবরার দিকে বের হয় সে পথ ধরে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এ বৃক্ষটির জন্যও জামরায়ে কুবরা প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া জামরায়ে কুবরাকে জামরায়ে 'আক্বাবাহ এবং জামরায়ে উলাও বলা হয়। নাবী কারীম (ﷺ) জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নাবী কারীম (ﷺ) বাতনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা

৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশক্রমে আলী (রাঃ) ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে এক শতটি উট কুরবানী করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলী (রাঃ)-কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রান্না করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আলী (রাঃ) এ মাংস খান এবং ঝোল পান করেন।

অতঃপর আপন সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছার পর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযা বলা হয়। তাওয়াফ শেষে যুহর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে জমজম কূপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

(اِنْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يُغَلِّبُكُمْ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)

‘বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল। অন্যথায় এ ব্যবস্থা তাঁদের আয়ত্বে আর থাকত না। কাজেই, বনু আব্দুল মুত্তালিব নাবী কারীম (ﷺ)-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলে তিনি তা হতে ইচ্ছানুযায়ী পান করলেন।

দিনটি ছিল যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং আলী (রাঃ) তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছিলেন দন্ডায়মান অবস্থায়।[11] অদ্যকার ভাষণে নাবী কারীম (ﷺ) গত কালকের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহুল মুসলিমে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

(إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰي وَشَعْبَانَ)

'আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌঁছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। ক্রমাগতভাবে তিন অর্থাৎ যিকা'দাহ, যুল হিজ্জাহ এবং মুহাররম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আখিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।'

অতঃপর নাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) ভাল জানেন।' এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ) নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মাসটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?' আমরা বললাম, 'তা কেন হবে না'? এর পর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'এ শহরটি কোন্ শহর?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।' নাবী কারীম (ﷺ) নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ শহর কি মক্কা নয়'? আমরা বললাম তা কেন হবে না'? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নাবী কারীম (ﷺ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন্ দিবস'? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন'। এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়'? অর্থাৎ ১০ই যুল হিজ্জাহ নয়'? আমরা বললাম অবশ্যই'। তিনি বললেন

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا)

'তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমন পবিত্র তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস তোমাদের আজকের দিন যেমন পবিত্র।

(وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ ضَلَالاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)

তোমরা অতি শীঘ্রই আপন প্রতিপালক প্রভূর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার পরে পুনরায় পশ্চাদমুখীনতা অবলম্বনের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা হয়ে না যাও। অধিকন্তু তোমরা এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বল! আম কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?
সাহাবীগণ বললেন, ‘হ্যাঁ, অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(اللهم اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰي مِنْ سَامِعٍ)

‘হে আল্লাহ সাক্ষী থাক’ যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া কারণ ঐ অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।
এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১১, ১২, ও ১৩ যুল হিজ্জাহ (আইয়ামে তাশরীক) মীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে থাকেন এবং লোকজনকে শরীয়তের আহবানগুলো শিক্ষা দিতে থাকেন ও আল্লাহর যিকির করতে থাকেন। অধিকন্তু ইবরাহীমী রীতিনীতির সুনানে হাদীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। নাবী কারীম (ﷺ) আইয়ামে তাশরীকেও ভাষণ প্রদান করেন। সুনানে আবী দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত আছে সারায়া বিনতে নাবহান (রাঃ) বলেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে রউসের দিন ভাষণ দেন।[14] তিনি বলেন,(أَلَيْسَ هٰذَا أَوْسَطُ أَيَّامِ الْتَشْرِيْق)‘এটা আইয়ামে তাশরীকের মধ্য দিবস নয় কি?[15] নাবী কারীম (ﷺ)-এর আজকের ভাষণও গতকালের ভাষণের অনুরূপ ছিল। এ ভাষণ দেয়া হয়েছিল সূরাহ নাসর নাজিল হওয়ার পর। আইয়ামে তাশরীকের শেষে, দ্বিতীয় ইয়াওমুন নাফারে অর্থাৎ ১৩ই যুল হিজ্জাহ তারিখে নাবী কারীম (ﷺ) মীনা হতে রওয়ানা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খাইফে বনু কিনানাহয় অবস্থায় করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি তিনি তথায় অতিবাহিত করেন এবং যুহর সালাত,

আসর, মাগরিব ও এশার সালাত সেখানেই আদায় করেন। এশার সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং তাওয়াফে বিদা' আদায় করেন।

সকল মানুষ যখন হজ্জ (হজ্বের নিয়মাবলী) হতে ফারেগ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপন সওয়ারীকে মদীনা মনোয়ারাভিমুখী করলেন। তাঁর মদীনামুখী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে আরাম আয়েশে গা ঢেলে দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে আর এক নবতর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

শেষ সামরিক অভিযান

আত্মাভিমানী ও অহংকারী রোমক সম্রাটদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ ও মুসলিমগণের প্রাধান্য লাভকে তারা বরদাশত করে নেবে। এ কারণে তাদের শাসনাধীন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জান-মাল সব কিছু সাংঘাতিকভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ত। মায়ানের রুমী শাসক ফারওয়াহ বিন 'আমির জুযামীর সঙ্গে যেমনটি আচরণ করেছিল।

রোমক সম্রাটের এরূপ সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব এবং অর্থহীন অহংকারের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১১ হিজরী সফর মাসে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং উসামা বিন যায়দ বিন হারিসাহকে (রাঃ) নেতৃত্ব প্রদান করে বালক্বা অঞ্চল এবং দারুমের ফিলিস্তিনী আবাসভূমিকে ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা পদদলিত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ কার্যক্রমের কারণ হল এর ফলে রোমকগণের মধ্যে যেন ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়, তাদের অঞ্চলে বসবাসরত আরব গোত্রসমূহের স্থিতাবস্থা বহাল থাকে এবং কেউই যেন এ ধারণা করতে না পারে যে গীর্জাকর্তৃক অনুসৃত কঠোরতার ব্যাপারে খোঁজখরব নেয়ার কেউ নেই, ইসলাম কবুল করার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুকে দাওয়াত দেয়া। ওই সময় কিছু সংখ্যক লোক বাহিনী প্রধানের বয়সের স্বল্পতার কারণে তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে এবং এ মহোদ্যমে অংশ গ্রহণ করতে বিলম্ব করে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

(إِنْ تُطْعِنُوْا فِيْ إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تُطْعِنُوْنَ فِيْ إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْل، وَاَيْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيْقاً لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ, إِنْ هٰذَا مَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ)

এর নেতৃত্বের ব্যাপারে আজ যেমন তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করছ, ইতোপূর্বে এর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলে। অথচ আল্লাহর কসম! সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে সে ছিল খুবই উপযুক্ত এবং আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম, এ ব্যক্তিও উপযুক্ত এবং আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম।

যাহোক, সাহাবীগণ (রাঃ) উসামার (রাঃ) আশেপাশে একত্রিত হয়ে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে মদীনা হতে তিন মাইল দূরত্বে জুর্ফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অসুস্থতাজনিত দুশ্চিন্তার কারণে অগ্রযাত্রা স্থগিত হয়ে গেল এবং আল্লাহর মীমাংসার জন্য বাহিনী অপেক্ষমান রইলেন। আল্লাহর মীমাংসায় এ বাহিনী আবূ বাকর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলের প্রথম সৈনিক মহোদ্যমের ভূমিকায় ভূষিত ও সম্মানিত হল।

বিদায়ের লক্ষণসমূহ

যখন দ্বীনের দাওয়াত পুরোপুরি পূর্ণতা লাভ করল, আরবের পুরো নিয়ন্ত্রণ মুসলিমগণের আয়ত্বে এসে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আবেগ ও অনুভূতি, প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণ হতে এমন কতগুলো আলামত প্রকাশ পেতে থাকল যাতে এটা ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অস্থায়ী জীবন থেকে বিদায় নিতে এবং এ অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে তাঁর ই'তেকাফের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে রমাযান মাসে তিনি শেষ দশ দিন ই'তিক্বাফ করতেন। কিন্তু ১০ম হিজরীতে তিনি ই'তিক্বাফ করেন বিশ দিন।

অধিকন্তু জিবরাঈল (আঃ) এ বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দু' বার কুরআন পুনঃপাঠ করিয়েছিলেন যেক্ষেত্রে অন্যান্য বছরগুলোতে মাত্র একবার কুরআন পুনঃপাঠ করিয়েছিলেন। তাছাড়া নাবী কারীম (ﷺ) বিদায় হজ্জে বলেছিলেন,

(إِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا بِهٰذَا الْمَوْقِفِ أَبَداً)

'আমি জানিনা এ বছর পর এ স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হতে পারব কিনা'। জামরায়ে 'আক্বাবাহর নিকট বলেছিলেন,

(خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسَكَكُمْ، فَلَعَلِّيْ لَا أَحُجُّ بَعْدِ عَامِيْ هٰذَا)

'আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম কানুনগুলো শিখে নাও। কারণ, এ বছর পর সম্ভবতঃ আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না। আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগে নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট সূরাহ 'নাসর' অবতীর্ণ হয় এবং এর মাধ্যমে নাবী কারীম (ﷺ) উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর যাওয়ার সময় সমাগত প্রায়।
একাদশ হিজরী সফর মাসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উহুদ প্রান্তে গমন করে আল্লাহ তা'আলার সমীপে শহীদদের জন্য এমনভাবে দু'আ করেন যেন তিনি জীবিত এবং মৃত সকলের নিকট থেকেই বিদায় গ্রহণ করছেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন,

(إِنِّيْ فُرُطٌ لَّكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّيْ وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلٰى حَوْضِيْ الْآنَ، وَإِنِّيْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحُ الْأَرْضِ، وَإِنِّيْ وَاللهَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ، وَلٰكِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا).

'আমি তোমাদের যাত্রীদলের প্রধান এবং তোমাদের উপর সাক্ষী, আল্লাহর কসম! আমি এখন আপন 'হাউযে কাওসার' দেখছি। আমাকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর খাজানাসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার এ ভয় হয় না যে, আমার পর তোমরা শিরক করবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে পৃথিবী সম্পর্কে তোমরা এক অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে।[1]
এ সময় একদা মধ্য রাত্রে তিনি 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থান গমন করলেন এবং কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন,

(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ، لِيَهْنَ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيْهِ بِمَا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيْهِ، أَقْبَلَتْ الْفِتَنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَتْبَعُ آخِرُهَا أُوْلَهَا، وَالْآخِرَةُ شَرٌّ مِنْ الْأَوْلٰي)،

‘ওহে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক! দুনিয়ার মানুষ যে অবস্থায় আছে তার তুলনায় তোমাদের সে অবস্থানই ধন্য হোক যার মধ্যে তোমরা রয়েছ। অন্ধকার রাত্রির অংশের ন্যায় অনিষ্টতা একটির পর একটি চলে আসছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম অতীত প্রজন্মের তুলনায় অধিক খারাপ।’ এরপর এ বলে কবরবাসীদের শুভ সংবাদ প্রদান করলেন যে,

(إِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ)

‘তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমরাও আগমন করছি।’

অসুস্থতার সূচনা

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর সোমবার দিবস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি জানাযার উদ্দেশ্যে বাকী'তে গমন করেন। সেখান থেকে ফেরার পথেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তাপ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপরেও তাপ অনুভূত হতে থাকে। এ অসুস্থতাই ছিল তাঁর ওফাতকালীন রোগ ভোগের সূচনা। এ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি এগার দিন পর্যন্ত সালাতে ইমামত করেন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৩ কিংবা ১৪ দিন অতিবাহিত করেন।

শেষ সপ্তাহ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, (أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا)؟ ‘আমি আগামী কাল কোথায় থাকব, আমি আগামী কাল কোথায় থাকব?’

এ জিজ্ঞাসার কারণ অনুধাবন করতে পেরে বিবিগণ বললেন, ‘আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারবেন।’’ বিবিগণের কথার প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ) স্থান পরিবর্তন করে আয়িশার গৃহে গমন করেন। স্থান পরিবর্তনের সময় তিনি ফযল বিন আব্বাস (রাঃ) এবং আলী বিন আবূ ত্বালীবের কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল এবং পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে তিন চলছিলেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নাবী কারীম (ﷺ) আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে গমন করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

আয়িশা (রাঃ) সূরাহ নাস ও ফালাক্ক এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক মুখস্থকৃত দু'আ পড়ে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ঝাঁড় ফুঁক করতে থাকেন এবং বরকতের আশায় নাবী কারীম (ﷺ)-এর হাত তাঁর পবিত্র শরীরে বুলিয়ে দিতে থাকেন।

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস দেহের উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন,(هَرِّيْقُوْا عَلَيَّ سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ آبَارٍ شَتَّي، حَتّٰى أَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ، فَأَعْهَدُ إِلَيْهِم) 'আমার শরীরে বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি ঢাল, যাতে আমি লোকজনদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিকে পারি। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ)-কে একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে তাঁর উপর এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালা হল যে, তিনি নিজেই (حَسْبُكُمْ، حَسْبُكُم) 'ক্ষান্ত হও', ক্ষান্ত হও' বলতে থাকলেন।

সে সময় নাবী কারীম (ﷺ)-এর রোগ যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি মসজিদে গমন করেন। তখনো তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বসেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সাহাবীগণ (রাঃ) আশপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد) 'ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক এ কারণে যে, তারা তাদের নাবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। অন্য এক রেওয়াতে রয়েছে

(قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)

ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি যে তারা তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদে বানিয়ে নিয়েছেন।[1] তিনি আরও বললেন,(لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَد) 'তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিওনা এ কারণে যে তার পূজা করা হবে।[2]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন,

(مَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهٰذَا ظَهْرِيْ فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهٰذَا عِرْضِيْ فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ)

‘আমি যদি কারো পিঠে কোড়া মেরে থাকি তাহলে সে যেন এ পিঠে কোড়া মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আর যদি কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি উপস্থিত আছি, সে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়।’

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বর হতে নীচে অবতরণ করলেন এবং যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। তারপর আবারও মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং হিংসা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর পুরাতন কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করলেন। একজন বললেন, ‘আপনার দায়িত্বে আমার তিন দিরহাম অবশিষ্ট আছে। নাবী কারীম (ﷺ) ফযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, ‘তাঁকে পরিশোধ করে দাও’। এরপর আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

(أُوْصِيْكُمْ بِالْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كِرْشِيْ وَعَيْبَتِيْ، وَقَدْ قَضَوْا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ، فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ)،

‘আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তারা ছিল আমার অন্তর এবং কলিজা। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্যসমূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অতএব তাদের সৎ লোকদের হতে গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করবে।’

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ، وَتَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتّٰى يَكُوْنُوْا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وُلِيَ مِنْكُمْ أَمْراً يَضُرُّ فِيْهِ أَحَداً أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيُقْبِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيْئِهِمْ).

‘মানুষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কিন্তু আনসারগণ কমে যেতে থাকবে। এমনকি তারা হয়ে পড়বে খাবারের মধ্যে লবণের ন্যায়। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোন লাভ কিংবা ক্ষতি পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবে তখন সে যেন তাদের মধ্যকার সৎ ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং অসৎ ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দেয়।

এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অধিকার প্রদান করেছেন যে, সে পৃথিবীর চাকচিক্য এক জাঁকজমকের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন, অথবা সে আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে সে পছন্দ করবে, তখন সে বান্দা আল্লাহর

নিকট যা কিছু আছে তাই পছন্দ করে নিয়েছে।' আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, এ কথা শ্রবণ করে আবূ বাকর (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত! তাঁর এ আচরণে আমরা আশ্চর্য হলাম। লোকেরা বলল, 'এ বুড়োকে দেখ! রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- তো একজন বান্দা সম্পর্কে এ কথা বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে অধিকার প্রদান করেছেন যে, পৃথিবীর চমক দমক এবং জাঁকজমক হতে সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন অথবা আল্লাহর নিকট যা আছে তা সে পছন্দ করে নেবে। অথচ এ বুড়ো বলছেন যে, যে আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কয়েক দিন পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, বান্দাকে সে অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আবূ বাকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمُوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِيْ بَكْرٍ).

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'স্বীয় সাহচর্য এবং ধন-সম্পদে আমার উপর সর্বাধিক দয়া দাক্ষিণ্যের মালিক ছিলেন আবূ বাকর (রাঃ) এবং আমি যদি আপন প্রভূ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বাকর (রাঃ)-কে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। মসজিদে কোন দরজাই অবশিষ্ট রাখা হবে না, বরং তা অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া হবে একমাত্র আবূ বাকর (রাঃ)-এর দরজা ছাড়া।

ওফাত প্রাপ্তির চার দিনে পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঠিন রোগযন্ত্রণার সম্মুখীন হলেন তখন বললেন,

(هَلُمُّوْا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ)

'তোমরা আমার নিকট কাগজ কলম নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য একটি নোট লিখে দেই যাতে তোমরা আমার পরে কোন দিনই পথভ্রষ্ট হবে না'।

ঐ সময় ঘরে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমার (রাঃ), তিনি বললেন, 'আপনার উপর রোগ যন্ত্রণার প্রাধান্য রয়েছে এবং আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব কুরআন রয়েছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট'- এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, 'কাগজ কলম আনা হোক এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলবেন তা লিখে নেয়া হোক।' অন্যেরা উমার (রাঃ)-এর মত সমর্থন করলেন। লোকজনদের মধ্যে যখন এভাবে কথা কাটাকাটি চলতে থাকল তখন নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, (قُوْمُوْا عَنِّي) 'আমার নিকট থেকে তোমরা উঠে যাও'।[1] অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) সে দিনটিতে উপদেশ প্রদান করলেন। এর প্রথমটি হচ্ছে,'ইহুদী, নাসারা এবং মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বহিস্কার করবে। দ্বিতীয়টি হল, 'প্রতিনিধিদলের সে ভাবেই আপ্যায়ণ করবে যেমনটি (আমার আমলে) করা হতো।' তৃতীয় উপদেশটি বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত সেটি ছিল আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকার উপদেশ, অথবা তা ছিল উসামা (রাঃ)-এর বাহিনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপদেশ, অথবা তা ছিল (الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) 'সালাত' এবং তোমাদের অধীনস্থ অর্থাৎ দাসদাসীদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপদেশ। কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ দিন (অর্থাৎ ওফাত প্রাপ্তির চার দিন পূর্বের বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সকল সালাতেই ইমামত করেন। এ দিবস মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন এবং সূরাহ 'ওয়াল মুরসালাতে উরফা' পাঠ করেন।

কিন্তু এশা সালাতের সময় অসুস্থতা এতই বৃদ্ধি পেল যে, মসজিদে যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য আর তাঁর রইল না। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, (أَصَلَّى النَّاس)؟ 'লোকজনেরা সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমি উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ) 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি দাও।' তাঁর চাহিদা মোতাবেক পানি দেয়া হলে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, (أَصَلَّى النَّاس؟) 'লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষামান রয়েছেন।'

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও তিনি একইরূপ করলেন, যেমনটি প্রথমবার করেছিলেন, অর্থাৎ গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না।, অজ্ঞান

হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি আবূ বাকর (রাঃ)-কে বলে পাঠালেন সালাতে ইমামত করার জন্য। এ প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রাঃ) ঐ দিনগুলোতে সালাতে ইমামত করেন।[3] নাবী কারীম (ﷺ)-এর পবিত্র জীবদ্দশায় আবূ বাকর (ﷺ)-এর ইমামতে সালাতে সংখ্যা ছিল সতের ওয়াক্ত।

আয়িশাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবূ বাকর (রাঃ)-এর পরিবর্তে অন্য কারো উপর ইমামতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট তিন কিংবা চারবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর এ অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা যেন তাঁর পিতা সম্পর্কে কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণের কোন অবকাশ বা সুযোগ না পায়। কিন্তু নাবী কারীম (ﷺ) প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করে বললেন, (إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبَ يُوْسُفَ، مُرُّوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاس) 'তোমরা সকলেই ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গীসাথীদের মতোই হয়ে গিয়েছ।[4] সালাতে ইমামতি করার জন্য আবূ বাকর (রাঃ)-কে নির্দেশ দাও।

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে তাঁর ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।

শনিবার কিংবা রবিবারে নাবী কারীম (ﷺ) কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। কাজেই, দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যুহর সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করেন। সেই সময় সাহাবীগণ (রাযি আল্লাহু 'আনহুম)-এর সালাতের জামাতে ইমামত করছিলেন আবূ বাকর (রাঃ)। তিনি নাবী কারীম (ﷺ)-এর আগমনের আভাস পেয়ে পিছনের সারিতে আসার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে ইশারায় পিছনে আসতে নিষেধ করে সামনেই থাকতে বললেন এবং নিজেকে তাঁর ডান পাশে বসিয়ে দেয়ার জন্য সাহায্যকারীদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন। এ প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রাঃ)-এর ডান পাশে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হল। এরপর আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাতের অনুকরণ করছিলেন এবং সাহাবীগণ (রাযি.)-কে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন।

ওফাত প্রাপ্তির পূর্বের দিবস রবিবার তিনি তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। তাঁর নিকটে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তা সাদকা করে দেন। নিজ অস্ত্রগুলো মুসলিমগণকে হিবা করে দেন। রাত্রিবেলা গৃহে বাতি জ্বালানোর জন্য আয়িশাহ (রাঃ) প্রতিবেশীর নিকট থেকে তেল ধার করে আনেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি লৌহবর্ম ত্রিশ 'সা' (৭৫ কেজি) যবের পরিবর্তে এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল।

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিবস ফজর ওয়াক্তে আবূ বাকর (রাঃ)-এর ইমামতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন সালাতরত ছিলেন এমন সময় নাবী কারীম

(ﷺ) আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সালাতরত সাহাবীগণ (রাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মৃদু হাসলেন। এদিকে আবূ বাকর (রাঃ) নিজ পায়ের পিছনে ভর দিয়ে পিছনে দিকে সরে গেলেন এবং কাতারে সামিল হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছা করছেন। আনাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, (হঠাৎ নাবী কারীম (ﷺ) সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায়) সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল (অর্থাৎ নাবী কারীম (ﷺ)-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে ফেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন ওয়াক্ত সালাতের জামাতে শরীক হতে পারেন নি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর কন্যা ফাত্বিমাহ (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা শুনে কন্যা কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও কন্যার কানে কানে কিছু কথা বললেন, পিতার কথায় কন্যা এবার হাসতে লাগলেন। আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনা আছে যে, পরে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফাত্বিমাহ (রাঃ) বললেন যে, নাবী কারীম (ﷺ) আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এ অসুখেই তাঁর ওফাত প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যেই আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, নাবী কারীম (ﷺ)-এর পরিবারবর্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি তাঁর অনুসরণ করব। এ কারণে আমি হাসলাম।

অধিকন্তু নাবী কারীম (ﷺ) ফাত্বিমাহ (রাঃ)-কে এ শুভ সংবাদও প্রদান করেন যে, তুমি হবে মহিলা জগতের নেত্রী।[3]

ওই সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দেখে ফাত্বিমাহ (রাঃ) কোন চিন্তা ভাবন না করেই চিৎকার করে উঠলেন ‘হায় আব্বাজানের কষ্ট! নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, আজকের পরে তোমার আববার আর কোন কষ্ট নেই।[4]

নাবী কারীম (ﷺ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। পবিত্র বিবিগণকে আহবান জানালেন এবং ওযায ও নসীহত করলেন।

এদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল এবং সে বিষের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল যা তাঁকে খায়বারে খাওয়ানো হয়েছিল। সে সময় তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন,

(يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِيْ أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهٰذَا أَوَانٌ وَجَدْتُ اِنْقِطَاعَ أَبْهَرِيْ مِنْ ذٰلِكَ السَّمِّ)

‘হে আয়িশা! খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি। এ মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে, এ বিষের প্রভাবে আমার শিরা উপশিরা সমূহের জীবন কর্তিত হচ্ছে।[5]

তখন তাঁর চেহারার উপর চাদর ফেলে দেয়া হল। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো তখন তার চেহারা মুবারক থেকে তা সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এরূপই হয়। এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ কথা ও মানুষের জন্য অসীয়ত : (তিনি বললেন),

(لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالَّنصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - يَحْذِرُ مَا صَنَعُوْا - لَا يَبْقِيَنَّ دِيْنَانِ بِأَرْضِ الْعَرَب)

আল্লাহর অভিসম্পাত ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যা তৈরি করেছে। তাথেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরব ভূখন্ডে আর কখনো এ দু’টি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উপদেশ প্রদান করে বললেন,

(الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

অর্থ : সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাসদাসী)! এ শব্দগুলো নাবী কারীম (ﷺ) বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।

অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্রণা

অতঃপর শুরু হল মৃত্যু যন্ত্রণা। আয়িশা (রাঃ) নাবী কারীম (ﷺ)-কে নিজ দেহের উপর ভর করিয়ে থেমে রইলেন। তাঁর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন, ‘আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে নাবী কারীম (ﷺ) আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমার গ্রীবা ও বক্ষের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা‘আলাভ আমার লালা এবং তাঁর লালাকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম যে, আব্দুর রহমান বিন আবূ বাকর (রাঃ) নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার শরীরে হেলান অবস্থায় ভর করেছিলেন। আমি দেখলাম যে, নাবী কারীম (ﷺ) মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছেন। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি বললাম, ‘আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিব?’ তিনি মাথা নেড়ে তা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর একটি মিসওয়াক নিয়ে নাবী কারীম (ﷺ)-কে দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, ‘হ্যাঁ’। আমি মিসওয়াক খানা নরম করে দিলে খুব সুন্দরভাবে তিনি মিসওয়াক করলেন। সম্মুখেই ছিল পানির পাত্র। পানিতে দু’ হাত ডুবিয়ে তিনি মুখমণ্ডল মুছতে মুছতে বলছিলেন, (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ....) ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ’ ‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।[1]

মিসওয়াক থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠল। আয়িশা (রাঃ) কান পেতে শ্রবণ করলেন, তিনি বলছিলেন,

(مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، اللهم اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰي. اللهم، الرَّفِيْقُ الْأَعْلٰي).

‘হে আল্লাহ! নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভূক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ’লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! রফীক্বে আ’লা।[2]

এ ঘটনা সংঘটিত হয় একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সূর্য্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় নাবী কারীম (ﷺ)-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

ওফাত বিলম্বিত হওয়ার কারণ

মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন সোমবার চাশতের শেষ সময়। মঙ্গলবার তাঁকে গোসল দেওয়া হয়। গোসল দিয়েছেন হজরত আব্বাস (রা.), হজরত আলী (রা.), হজরত আব্বাস (রা.)-এর দুই ছেলে ফজল ও সাকাম, রাসুল (সা.)-এর আজাদকৃত ক্রীতদাস সাকরাম, ওসামা বিন যায়েদ ও আউস ইবনে খাওলা (রা.)। গোসলের পর বিশ্বনবী (সা.)-কে তিনটি ইয়েমেনি সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়, অতঃপর ১০ জন ১০ জন করে সাহাবায়ে কেরাম হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে জানাজার নামাজ আদায় করেন। নামাজে কেউ ইমাম ছিলেন না। সর্বপ্রথম বনু হাশিম গোত্রের সাহাবিরা, তারপর মুহাজির, অতঃপর আনসার, তারপর অন্যান্য পুরুষ সাহাবি, অতঃপর মহিলা ও সর্বশেষে শিশুরা জানাজার নামাজ পড়ে। জানাজার নামাজ পড়তে পড়তে মঙ্গলবার সারা দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় দাফন করা হয়।

মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের মৃতদের দাফন দ্রুত সম্পন্ন করো, বিলম্ব কোরো না।' (বুখারি, হাদিস ১৩১৫) তার পরও মহানবী (সা.)-এর জানাজা ও দাফন বিলম্বিত হয়েছে। এর কারণ প্রধানত তিনটি।

১. তাঁর ওফাতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছতে বিলম্বিত হওয়া : মহানবী (সা.)-এর ওফাতের খবর শুনে হজরত ওমর (রা.) জ্ঞানহারা হয়ে যান, তিনি দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, কিছু কিছু মুনাফিক মনে করে যে রাসুল (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, আসলে তিনি ইন্তেকাল করেননি। তিনি হজরত মুসা (আ.)-এর মতো সেই প্রভুর কাছে গেছেন, আবার ফিরে আসবেন। আল্লাহর শপথ—'যারা বলে, মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, আমি তাদের হাত-পা কেটে ফেলব।' হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাসুল (সা.)-এর ওফাতের সময় নিজ বাড়িতে ছিলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসেন। তিনি ওমর (রা.)-কে শান্ত করার জন্য বসতে বললে ওমর (রা.) না বসেই আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তখন আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উপস্থিত সব সাহাবির সামনে সুরা আলে ইমরানের ১৪৪ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। তখন সবাই শান্ত হয় এবং সবাই বুঝতে পারে যে আসলেই রাসুল (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। হজরত ওমর (রা.) বলেন, 'হজরত আবু বকর (রা.)-এর মুখে মুহাম্মদ (সা.) শুধু রাসুল মাত্র, তাঁর আগেও

বহু রাসুল গত হয়ে গেছেন... শ্রবণ করার পর মাটিতে ঢলে পড়েছিলাম এবং স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে রাসুল সত্যি ইন্তেকাল করেছেন।' অতঃপর সবাই ওফাতের ব্যাপারে একমত হওয়ার পর দাফনকাজ সম্পন্ন করা হয়।

২। দাফনের স্থান নির্দিষ্ট না থাকা : মহানবী (সা.)-কে কোথায় দাফন করা হবে, তা সাহাবায়ে কেরামের জানা ছিল না। ফলে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ কেউ বলেন, জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হোক, কেউ কেউ বলেন, মসজিদ-ই-নববীতে দাফন করা হোক, আবার কেউ কেউ প্রস্তাব করেন হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর পাশে সমাহিত করা হোক। এমতাবস্থায় হজরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নবী যেখানেই মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই সমাহিত হন।' অতঃপর হজরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় যেখানে রাসুল (সা.) ইন্তেকাল করেন, সেখানে সমাহিত করার ব্যাপারে একমত হন।

৩। খলিফা নির্বাচনে ঐকমত্যে পৌঁছতে বিলম্ব : মহানবী (সা.)-এর স্থানে কে রাষ্ট্রের খলিফা হবেন, এ নিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ব্যাপারে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছলে মহানবী (সা.)-এর দাফনের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

শেষ কথা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতুলনীয় জীবন-পদ্ধতি ও শিক্ষা দেখতে দেখতেই মানবজাতির রূপ বদলে গিয়েছে। তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে আরব ভূখন্ডের মূর্খ, অশিক্ষিত, উসৃঙ্খল, দ্বন্দ্ববাজ এবং নারীদের জ্যান্ত কবর দানকারী মানুষেরা, একটি সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষিত, চরিত্রবান, আদর্শবান, শান্তিপ্রিয় এবং মানুষের অধিকার রক্ষাকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

আজও প্রয়োজন সেই সীরাতে নববীর বাণীকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। যদি বর্তমান বিশ্ব বাস্তবিক পক্ষেই বস্তুগত উন্নয়নের সাথে সাথে চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতি চায় এবং মানুষকে একটি নিরাপদ ও সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার স্বপ্ন দেখে তাহলে অবশ্যই রাসূলের আদর্শকে চোখের মণি বানিয়ে চলতে হবে। কারণ, বর্তমান সমস্যার সমাধান একমাত্র সীরাতে নববীর মধ্যেই রয়েছে।

সীরাত সর্বকালের মানুষের জন্য কল্যাণময় এক আদর্শ

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন, যাতে আমরা মুহাম্মদ ﷺ এর সীরাত নিজেরা জানতে পারি, আমাদের সন্তানদের জানানোর ব্যবস্থা করতে পারি, দুনিয়ায় মুহাম্মদ ﷺ কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে হাশরের ময়দানে তার সুপারিশ পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি।

আল্লা-হুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রেফারেন্স

- আর-রাহীকুল মাখতূম আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)
- সীরাতে ইবনে হিশাম : হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনীগ্রন্থ
- সীরাতে মুস্তফা (সা.)মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী , মুহম্মদ জুবায়ের , মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের (অনুবাদক
- মুখতাসার যাদুল মা'আদ অনুচ্ছেদ সমুহের সূচী ও বিবরন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম
- https://www.hadithbd.com